জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : জীবন ও শিল্পবোধের স্বরূপ

আয়শা সিদ্দিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদনপত্র

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল. গবেষক **আয়শা সিদ্দিকা** আমার তত্ত্বাবধানে **জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : বিষয় ও শিল্পবোধের স্বরূপ** শিরোনামে যে এম.ফিল.অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করেছে, তা তাঁর একক ও মৌলিক গবেষণার ফসল। অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষককে তাঁর এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থানের জন্য অনুমতি প্রদান করা হল।

.....

স্বাক্ষর
তত্ত্বাবধায়কের নাম :
ড. রফিকউল্লাহ খান
পদবী : অধ্যাপক
তারিখ :

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে **জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : বিষয় ও শিল্পবোধের স্বরূপ** শিরোনামে এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. **রফিকউল্লাহ খান,** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির দ্বৈতীয়িক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, সংকলিত স্থলে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত ব্যতীত অবশিষ্ট উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও বিরচনা আমার নিজস্ব।

.....

আয়শা সিদ্দিকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা	**৫**
ভূমিকা	**৬**
প্রথম অধ্যায় : জীবনকথা ও মানসগঠন	**৭-৩৮**
দ্বিতীয় অধ্যায় : উপন্যাস : জীবনবোধ ও শিল্পরীতি	**৩৯-১৩৭**
তৃতীয় অধ্যায় : ছোটগল্প : জীবনপ্রকৃতি ও প্রকরণরীতি	**১৩৮-১৫৮**
উপসংহার	**১৫৯-১৬০**
পরিশিষ্ট-১ : জহির রায়হান : জীবনপঞ্জি	**১৬১-১৬২**
পরিশিষ্ট-২ : জহির রায়হান : রচনাপঞ্জি	**১৬৩-১৬৪**
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	**১৬৫-১৬৯**

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

'জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : জীবন ও শিল্পবোধের স্বরূপ' আমার এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনামা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রফিকউল্লাহ খান এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল. কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি। পরবর্তীকালে একই বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রফিকউল্লাহ খান ও অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হক এর নিকট এম.ফিল. প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর রফিকউল্লাহ খান বর্তমান অভিসন্দর্ভের কাঠামো পরিকল্পনা ও অভ্যন্তর বিন্যাসপদ্ধতি সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ দিয়ে গবেষণাকর্মটি দ্রুত ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর কথাসাহিত্য বিষয়ক বিচিত্র তত্ত্বভিত্তিক আলোচনা, প্রাজ্ঞ নির্দেশনা, সুচিন্তিত পরামর্শ ও আন্তরিকতা আমার গবেষণাকর্মকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে যাঁরা নানাভাবে আমায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের বর্তমান সভাপতি আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. আরজুমন্দ আরা বানু, একই বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান, অধ্যাপক ড. চঞ্চল কুমার বোস, অধ্যাপক ড. হোসনে আরা জলি; ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক দেওয়ান ইউনুস আলী; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক সফিকুন্নবী সামাদী ও গবেষক মাসুম খান। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ দুই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একইসঙ্গে এ গ্রন্থের মুদ্রক জনাব ওমর ফারুকের আন্তরিক তৎপরতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা ও সম্পাদনীর দীর্ঘ সময় যিনি সার্বক্ষণিক পাশে থেকে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি আমার গর্ভধারিনী মা সৈয়দা আকলিমা বেগম, তাঁর কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি বাবা মো: গোলাম কিবরিয়া, জীবনসঙ্গী মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, আত্মজা আফিয়া রহমান, বড় মামা সৈয়দ অরেশ আলী, খালা সৈয়দা তাসলিমা ইসলাম, খালু মো. সাইরুল ইসলাম বড় ভাই মো : আলী হাসান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দের কথা যাঁদের ধৈর্য আর সমর্থন আমার অনুপ্রেরণার অন্তহীন উৎস। সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাই মহান সৃষ্টিকর্তাকে যিনি আমাকে পরিপূর্ণভাবে অভিসন্দর্ভটি রচনায় সামর্থ্য দান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সাহিত্য কিংবা শিল্প বিচারে সাহিত্যিক বা শিল্পীর জীবনবোধের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ একান্ত আবশ্যক। বিশ্ব জীবনপ্রবাহকে শিল্পী কোন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেন, কোন ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে দেখেন, কীভাবে দেখেন সে পরিচয় তাঁর সৃজনকর্মে স্পষ্টত আকীর্ণ। জীবনকে দেখবার এই বিশেষ ভঙ্গিমাটি তাঁর জীবনবোধ। বাহ্যিক প্রতিবেশে অর্জিত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত অনুভূতিই ব্যক্ত করেন তাঁর সৃজনকর্মে। আর সাহিত্যকর্ম রচনায় শিল্পী যে বিশেষ উপকরণ পদ্ধতি, প্রকরণরীতির আশ্রয় নেন তাই-ই তাঁর শিল্পবোধ। প্রসঙ্গত, সাহিত্যিকের জীবন ও শিল্পরীতির বিশিষ্টতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানস গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্য ধারায় বিষয় ও শিল্পবোধ নিরীক্ষায় দুর্দান্ত প্রতাপশালী স্বয়ম্ভু লেখক জহির রায়হান। তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছিল বাংলা ভূখণ্ডের পথনির্দেশক পাথেয়। তিনি একদিকে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির গভীর উপলব্ধি ক্যামেরার লেন্সে চিত্রিত করেছেন দক্ষ চারুশিল্পীর মতো, অন্যদিকে কথাসাহিত্যে শব্দ শিল্পের মধ্যে দৃশ্য শিল্পরীতি প্রয়োগ করে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছেন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিচিত্র শিল্পচর্চার মিছিলে জহির রায়হানের কথাসাহিত্য সত্তার সমগ্রতা অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভে।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে জহির রায়হানের শিল্পী হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত, তাঁর শৈশব, কৈশোর, শিক্ষালাভ ও পেশা জীবনকথার পাশাপাশি শৈল্পিক জীবনদৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর উপন্যাসে বিধৃত জীবনরূপ ও শিল্পরীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর ছোটগল্পে বর্ণিত জীবনপ্রকৃতির স্বরূপ ও প্রকরণরীতি পর্যালোচিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প আলোচনার সময় সমকালীন প্রতিবেশ, সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং লেখকের মৌলিক জীবনার্থ সন্ধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। উপসংহার অংশে বর্তমান গবেষণাকর্ম থেকে প্রাপ্ত জহির রায়হানের জীবন চেতনার স্বরূপ ও শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্যের সমগ্র আলোচনার সারৎসার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে বিধৃত হয়েছে জহির রায়হানের জীবনপঞ্জি, রচনাপঞ্জি, জহির রায়হান বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি, উপন্যাস ও ছোটগল্প বিষয়ক সহায়ক বাংলা গ্রন্থ, বাংলা পত্র-পত্রিকা ও বাংলা প্রবন্ধের নাম। উদ্ধৃতি ব্যবহারে লেখকের ব্যবহৃত মূল বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জীবনকথা ও মানসগঠন

Dhaka University Institutional Repository

জীবনকথা ও মানসগঠন

পরিপ্রেক্ষিত

সমকালীন ঘটনা প্রবাহের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যবাহী গভীর অনুভবে প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী জীবনচেতনা রপ্ত করে যাঁরা বাংলাদেশের সাহিত্যের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেন তাঁদের মধ্যে জহির রায়হান অগ্রগণ্য। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র, রাজনীতি, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ছিল সফল পদচারণা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অমানবিক রক্তক্ষতের চিহ্ন মুছতে না মুছতে পুঁজিবাদী যান্ত্রিক বিষময় সভ্যতা আরেকটি যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ কলোনিশাসিত ভারত উপমহাদেশেও একদিকে শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীদের কঠোর দমন-পীড়ন নীতি, অন্যদিকে দেশীয় বিপ্লবীদের নব নব কর্মোদ্যোগের নিরন্তর সাধনা, আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের উত্তাল ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হচ্ছিল। জহির রায়হান সেই সময়ের সন্তান।

শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবন কালের স্মারকচিহ্ন। তাই কোন সাহিত্যিকের সৃজনকর্ম বিশ্লেষণে তাঁর সমকাল ও পটভূমি জানা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে জহির রায়হান ব্যতিক্রম নয়। তাঁর জীবনবোধ আলোচনায় দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা পশ্চাৎপদ হয়েছি। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রারম্ভ অর্থাৎ ১৮০১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত বাংলাদেশ ও বাঙালির সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীকে অতি স্বল্পকায় বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছি।

১৮০১ সালের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুভ সূচনা। এরপর অভ্যুদয় ঘটে কলকাতা হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের। সদ্য জন্মনো এই শ্রেণির উত্থান ঘটেছিল হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৮) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও যুগপুরুষরূপে আবির্ভূত রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের দ্যুতি স্পর্শে। শুরু হয় বাংলার নবজাগরণের অধ্যায়। তবে তা ছিলো শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে আর্থিক অসঙ্গতি, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ, রক্ষণশীল মনোভাব প্রভৃতি কারণে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা ছিল সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে। ১৮৭০ সালের দিকে বিভিন্ন কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধদয়ের বীজ অঙ্কুরিত হয় ও তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকে যা তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত সাধন করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ বিকশিত হতে সময় লেগেছিল প্রায় একশ বছর। বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে শুরু হওয়া নানান রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা ক্রমশ বাংলার মুসলমানদেরকে সচেতন ও আলোড়িত করতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬), মার্লেমিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯), বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৭), লক্ষ্মৌ চুক্তি (১৯১৯), খিলাফত আন্দোলন (১৯২০) অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা১ (১৯২১), নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' প্রকাশ (১৯২২), মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা (১৯২৬), প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ প্রতিষ্ঠা (১৯৩৯), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০), ১৯৪১-৪৬ সময় পরিসরে সংঘটিত অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা২ ও ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তা অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সাহিত্য সমাজ গঠন, প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠা এবং লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করে বাংলাদেশের মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ জেগে উঠেছিল। তবে 'উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের জোতদার তালুকদার ও হিন্দু জমিদারদের মদদ পুষ্ট বড় তালুকদারদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির।' (কামরুদ্দীন আহমদ ১৩৮৩ : ১১)। এই শ্রেণির মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)। 'বাংলাদেশের বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং নিপীড়িত কৃষক জনগণের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ফজলুল হক বাঙালি মুসলমান এবং কৃষক সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন ঋণ-সালিশী বোর্ড গঠন (১৯৩৮) প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৩৯) এবং মহাজনী আইন (১৯৪০) প্রণয়নের মাধ্যমে। তাছাড়া (১৯৩০-১৯৪১) কাল-পরিসরে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ ছিল বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।' (রফিকউল্লাহ খান ১৯৯৭ : ১৩)

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। শুধু তাই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতির গতিধারায় এ সময় বাঙালির জীবন চৈতন্যে সক্রিয় প্রতিক্রিয়াশীলতা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সদ্য জন্মানো ও গঠনশীল মধ্যবিত্তের স্বতন্ত্র শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পটভূমি নির্মিত হয়। ১৯২৬ সালে গঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজ এদেশীয় সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ আরেক ধাপে উন্নত করেছিল। প্রতিষ্ঠার আদি থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ও যুদ্ধোত্তর উদার মানবিকতা চর্চার চারণ ভূমি। তাইতো দেশ বিভাগের সময় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের কেউই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র নয়। তাঁদের অধিকাংশ শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালকাটা মাদ্রাসা, অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশের মুসলমান তারুণ্য আলিগড়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে যেমন মুক্তি লাভের সুযোগ পায়,' (কামরুদ্দীন আহমদ ১৩৮৩ : ১৩) 'তেমনি, প্রথাগত সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে সজাগ সোচ্চার হবার শক্তি অর্জন করে।' (রফিকউল্লাহ খান ২০১৬ : ১৭)। শুরু থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা করেছে ভূমিনির্ভর কৃষিজীবী মুসলমান সম্প্রদায়। তাঁদের ক্রমাগত শিক্ষার ফলে ঢাকা কেন্দ্রিক

এক শ্রেণি নতুন মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ঘটে। 'সামন্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইউরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ মানবতাবাদকে অঙ্গীকার কল্পে ১৯২৬-এ প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এবং প্রকাশ করেন মুখপত্র শিখা।' (সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৫ : ১২)। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম সূচিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে।' (খোন্দকার সিরাজুল হক ১৯৮৪ : ১১২-১১৩) তাঁদের আদর্শ ছিল চিন্তাচর্চা ও বুদ্ধির মুক্তি। সেক্ষেত্রে মুখপত্র হিসেবে তাঁরা প্রকাশ করেন শিখা (১৯২৬) পত্রিকা যার প্রতিপাদ্য ছিল-'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। অতীতের পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের সামনে অগ্রসরের প্রেরণাদানই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে মুস্তফা কামালের (১৮৮১-১৯৩৮) উদ্যমতাই ছিল তাঁদের প্রেরণার উৎসভূমি। এই কর্মযজ্ঞে সাড়া দিয়েছিল এদেশের তরুণ সমাজ । শুরু হয় বাঙালি মুসলমানদের রেনেসাঁস। সেই ধারাবাহিকতা দৃশ্যত হয়েছিল পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তের জাগরণ প্রবাহে যে পরিমণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের গতিপথ। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন, 'কল্লোলের বীজ বপন হইয়াছিল ঢাকায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'য় (১৯২২)। স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাসের আওতায় এ বীজ সতেজে রূঢ় হতে পারে নাই। কল্লোলের প্রবাহ কিছুদূর গড়াইলে পরে ইহার একটি কচি শাখা বাহির হইয়াছিল ঢাকায় প্রগতি (১৯২৭)।' (সুকুমার সেন ১৯৭৬ : ২৫৯)

এ সময়ে বাংলাদেশের জনমানসে আরেকটি রাজনৈতিক ধারা সক্রিয় হয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সময় কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' (১৯২৭-২৮)। এই পথ ধরে এদেশের কৃষিজীবী শোষণমূলক সমাজের তরুণমানস অগ্রসর হতে থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের যৌথ সম্পাদনায় 'নবযুগ' (১৯২১) পত্রিকা। তিরিশের দশকে জাতীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের নব্য শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ সৃষ্ট ধর্মকেন্দ্রিক সামন্তবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সময় মার্কসবাদে বিশ্বাসী ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী কিছু সংখ্যক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টায় ঢাকায় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৩৯) গঠিত হয়। উল্লেখ '১৯৩৬ সালে জার্মানিতে হিটলার এবং ইতালিতে মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী উত্থানের প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীব্যাপী প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকরা ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন অনুভব করেন।'(রফিকউল্লাহ খান ২০১৬ : ১৯)। এ সময় রম্যা রলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি এবং আঁরি বারব্যুসের নেতৃত্বে ১৯৩৫ সালের ২১ জুন প্যারিসে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় International Association of writers for the defense of culture against Faceism.' (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯১ : ২৩৭)। সম্মেলনে গঠিত এই সংগঠনের আদলেই উপমহাদেশে ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'। '১৯৩৯ সালে ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে সদস্য ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২), কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অমৃতকুমার দত্ত, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত এবং সতীশ পাকড়াশী। উৎসাহ-উদ্দীপনা-আগ্রহ ও সংগঠন পরিচালনা দক্ষতায় সোমেন চন্দ হয়ে ওঠেন সংগঠনের মধ্যমণি। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ঢাকা শহরের প্রগতিশীল

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা এই সংগঠনে এসে সমবেত হতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হলেও ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময়ে গেন্ডারিয়া হাই স্কুল প্রাঙ্গনে এক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' উদ্বোধন করা হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর সংগঠক কাজী আবদুল ওদুদ।' (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯১ : ২৪২-৪৩)। চল্লিশের দশকে এই সংগঠনের কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে বিস্তার লাভ করে এবং সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও স্বাধিকারবোধ সৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠার ফলে নব্য শিক্ষিত ও বুর্জোয়া মানবতায় বিশ্বাসী যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে তাদের পরিণতি ও পরিপক্কের পূর্বে ঘটে যায় আরেক ঘটনা। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তি। তখন সদ্য জন্ম নেয়া অসমভাবে বিকাশমান, অপরিপক্ক ও অসংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি অস্তিত্ব রক্ষার দ্বন্দ্বময় ও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় পাকিস্তান আন্দোলনে হয়েছিল দিকভ্রান্ত, অসঙ্গত এমনি অবাস্তবিক সিদ্ধান্ত থেকে প্রাপ্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তি তাদের আপ্লুত করেছিল। তিন দশক ধরে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দোলায়মান পরিস্থিতি থেকে সচেতনভাবে জাগরণ ঘটে ১৯৪৮ সালের ভাষার প্রশ্নে। 'বিংশ শতকের ক্রমবর্ধমান বাঙালি বেনিয়া পুঁজিবাদী এবং স্ফীতকায় বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও মার্কসবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিবাদ করলো ১৯৪৮-এ।' (সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৫ : ১৬)। এই প্রতিবাদের শেষ পরিণতি ১৯৭১ সালের নয় মাস মুক্তিসংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনকথা

একজন ব্যক্তিচরিত্র এককভাবে গড়ে ওঠে না। সমাজ-পরিবেশের বহু অনুষঙ্গ চক্রাকারে আবর্তিত হয় তার জীবনে। কোন সৃষ্টিশীল মানুষও এ প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে নয়। তাই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জহির রায়হান যে সমাজ ও সময়ে জন্মেছিলেন, যে সময় পরিসরে শৈশব-কৈশোর-যৌবন কেটেছে সেই সময়, সমাজ, জন্মসূত্র, পারিবারিক আবহ, ও রাষ্ট্রীক ঘটনাবর্তের আলোচনার মাধ্যমেই কেবল তাঁর জীবন ও শিল্পবোধের স্বরূপ উন্মোচন সম্ভব। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের প্রথমেই তাঁর মানস গঠনের সময়, সমাজ ও জীবনপ্রবাহ আলোচিত হলো। জীবনকথা ও সৃষ্টিকর্মের বিজ্ঞানসম্মত ও যথার্থ মূল্যায়নের প্রয়োজনে তাঁর জীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

১। প্রথম পর্যায় : ১৯৩৫-১৯৪৭
২। দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৪৮-১৯৫৬
৩। তৃতীয় পর্যায় : ১৯৫৭-১৯৬৫
৪। চতুর্থ পর্যায় : ১৯৬৬-১৯৭২

প্রথম পর্যায় : ১৯৩৫-১৯৪৭

শৈশবকাল

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ শে আগস্ট নোয়াখালি জেলার ফেনী মহকুমার সোনাগাজী থানার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ডাকনাম ছিলো জাফর। তবে কমরেড মণিসিংহ (১৯০১-১৯৯০) তাঁর নাম দিয়েছিলেন রায়হান। জহির রায়হানের বাবা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ দেশবিভাগের পূর্বে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এবং পরে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। মাতা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন একজন সুগৃহিনী নোয়াখালির একটি রক্ষণশীল তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জহির রায়হানের পিতৃবংশের সঙ্গে তাদের স্নায়ু বিরোধ ছিল। সে কারণে দুই পরিবারে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে বিরোধ নিস্পত্তির পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তখন সুফিয়া খাতুন নবম শ্রেণির ছাত্রী। রক্ষণশীল পরিবারে জন্মিয়েও তৎকালীন জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর বয়স ছিল তের বা চৌদ্দ। শোনা যায়, অসহযোগ আন্দোলনে একাত্ম হতেই তিনি নিজ হাতে সুতো কেটে কাপড় বুনে পরতেন। পরবর্তীকালেও তিনি এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে স্নেহময়ী মাতা সুফিয়া খাতুন ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নশীল। । জহির রায়হানের ছিল চার ভাই তিন বোন। বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) ছিলেন

প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। দ্বিতীয় বোন নাফিসা কবির প্রতিভাময়ী ছাত্রী ও রাজনৈতিক কর্মী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ পাশ করে লন্ডন গিয়েছিলেন বর্তমানে তিনি বেঁচে নেই। স্বামী আহমদ কবির ডাক্তার। জহির রায়হান ছিলেন বাবা-মায়ের তৃতীয় সন্তান। তাঁর দ্বিতীয় ভাই জাকারিয়া হাবিব। জহির রায়হানের সঙ্গেই চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজ করতেন। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। পরের বোন সুরাইয়া পেশায় ডাক্তার। তিনি আমেরিকাতে বাস করতেন, এখন তিনি আর বেঁচে নেয়। তাঁর ছোট বোন সাহানা তিনিও আমেরিকায় থাকেন, সোজিওলজিতে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর আরেক ভাই ওবায়দুল্লাহ মিরাজী চৌধুরীও আমেরিকা থাকেন। আর ছোট ভাই সাইফুল্লাহ ঢাকায় একটি ব্যাংকে চাকুরি করতেন এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। মূলত জহির রায়হানের পিতা আরবিতে উচ্চ শিক্ষিত হলেও মুক্তদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। এছাড়া তাঁর ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও অনুরাগ ছিল। এ থেকে ধারণা করা যায় হাবিবুল্লাহ সাহেবের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবেই তাঁর পরিবার পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি মুক্ত ও প্রগতিশীল চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

জহির রায়হান অতি সাধারণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর শারীরিক গড়ন ছিল হালকা-পাতলা, উচ্চতায় বেশি ছিলেন না। গায়ের রং শ্যামলা তবে তাঁর চোখ দুটি ভারি মিষ্টি ও প্রাণবন্ত। বিশিষ্ট লেখিকা রাবেয়া খাতুন তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁদের প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচারণ করেন এভাবে : 'বেটে খাটো, শ্যামলা অসাধারণ চেহারার একজন মানুষ, কিন্তু যে জিনিসটি প্রথম দেখাতেই আকর্ষণ করেছিল তা ছিল তাঁর আকর্ষক দুটি চোখ'। (রাবেয়া খাতুন : ২০০০)। অন্যদিকে লেখকের বড় ভাবি বলেছেন, 'দেখতে ছোটখাট।... এক মুহূর্ত স্থির থাকে না কি যেন খুঁজে বেড়ায় দু'চোখের গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে।' (পান্না কায়সার ১৯৯১ : ৯৫)

জহির রায়হান ছিলেন সৎ, সাহসী, সরল ও গভীর দূরদর্শী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তবে স্বভাবে উদাসীন, জেদী, কৌতুহলী ও লাজুক প্রকৃতির। শাহরিয়ার কবির বলেছেন, 'মেজদা ছিলেন একেবারে অন্তর্মুখী, লাজুক, মুখচোরা স্বভাবের, কারও সাতে পাঁচে নেই।'(শাহরিয়ার কবির : ২০০০)। জনাব কবির আর বলেন, 'নিজের পোষাক পরিধনের প্রতি কখনও তাঁর নজর ছিলো না। মলিন প্যান্ট শার্ট আর রাবারের স্যান্ডেল পরে ঘুরছেন।'(অনল রায়হান ২০১৫ : ১৫)। এছাড়া আরো জানিয়েছেন হওয়াই শার্ট তিনি বেশি পরতেন। জহির রায়হানকে সম্ভবত কেউ কখনো স্যুট পরতে দেখেনি। ১৯৭১ সালে যখন তাঁর মস্কো যাবার কথা ছিল তখন একটি স্যুট বানাতে দেয়া হয়। কিন্তু মস্কো যেতে না পারায় সেই স্যুটও তিনি পরেন নি। এভাবেই অত্যন্ত সাদামাটা জীবন-যাপন করেছেন। নিজের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন। তাঁর উদাসীনতা এতটাই ছিল যে, 'বিকেলে ভুলে যেতো সকালে ও খেয়েছিল কিনা।' (পান্না কায়সার ১৯৯১ : ৯২)। পান্না কায়সার আরো বলেছেন, ' চোখেমুখে প্রতিভার উজ্জ্বলতা, দৃষ্টির গভীরে কি যেন লুকিয়ে আছে। পকেটে একবার হাত রাখছে, আবার বের করছে। নড়ে নড়ে কথা বলার ভঙ্গি মানুষকে আকর্ষণ করে। মনে হয় একটা চঞ্চল

হরিণ। জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ।' (পান্না কায়সার ১৯৯১ : ৩৫)। তবে তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অসাধারণ। মানুষের কাছাকাছি গিয়ে তাকে আপন করার সহজাত প্রবণতা ছিল প্রবল । এ প্রসঙ্গে রাবেয়া খাতুন বলেছেন, 'তাঁদের 'সিনেমাসিক' পত্রিকা অফিসের সামনের একটি বাড়ীর এক হিন্দু মহিলাকে দেখতেন প্রতিদিন শিল-নোড়ায় সাদা মত কি যেন জিনিস পিষত। এ নিয়ে তাঁর (রাবেয়া খাতুন) ও জহির রায়হানের প্রচণ্ড কৌতুহল ছিল। কৌতূহল মেটাতে জহির রায়হান একদিন মহিলার কাছে গেলেন এবং দেখতে পেলেন মহিলা মুড়ি বাটছে। কারণ স্বরূপ জানালেন, এই বাটা মুড়ি দুধের সরের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া হবে।' (রাবেয়া খাতুন : ২০০০)। এ থেকেই বোঝা যায় জহির রায়হান কতটা মানুষের কাছাকাছি যেতে পারতেন যার পরিণতি তাঁর জীবনঘেষা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া পারিবারিক আবহ তাঁর মানসগঠনে গভীর প্রভাব ফেলে ছিল। যারা তাঁর সবচেয়ে কাছের ও আদর্শের ব্যক্তিত্ব তাঁদের মধ্যে একজন শহীদুল্লাহ কায়সার। রাজনীতিতে হাতেখতি তাঁর মাধ্যমেই। শাহরিয়ার কবির বলেছেন, 'মেজদার কাছে বড়দা বিশ্বের সেরা মানুষ।' (অনল রায়হান ২০১৫: ৯)। তাছাড়া বোন নাফিসা কবিরও তাঁর মানস গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। পারিবারিকভাবে আরো দু'জন মানুষের সাহচার্যে তাঁর মানস বিকশিত হয়েছিল। তাঁরা হলেন চাচা সিদ্দিকুল্লাহ ও চাচী সাঈদা খাতুন। তাঁরা তাঁকে নিজের ছেলে মনে করতেন। চাচীর সঙ্গে তাঁর এত মধুর সম্পর্ক ছিল যে, চাচীর প্রথম সন্তানের নাম শাহরিয়ার তিনি ঠিক করেন। এছাড়া শোনা যায় ফটোগ্রাফি শেখার জন্য চাচী নিজের গয়না বিক্রি করে তাঁকে 'প্রমথেশ বড়ুয়ার স্টুডিও'তে পাঠিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বাবা হাবিবুল্লাহ ও চাচা সিদ্দিকুল্লাহ্‌র যৌথ পরিবার ছিল। শহীদুল্লাহ কায়সার, নাফিসা কবির এবং জহির রায়হানের পড়াশোনার ব্যয়ভার অনেকটাই তিনি (চাচা) বহন করতেন। তিনজনেরই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল চাচা সিদিকুল্লাহ্‌র সঙ্গে। মুক্তবুদ্ধির অধিকারী সিদ্দিকুল্লাহ্‌ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিন ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনা করতেন। সিনেমা, বেড়ানো সর্বক্ষেত্রেই তিন ভাই বোনের সঙ্গী ছিল চাচা সিদ্দিকুল্লাহ।' (শাহরিয়ার কবির : ২০০০)। এছাড়া পুরানো ঢাকার পাটুয়াটুলির ২৯ বি.কে গাঙ্গুলী লেনের লাল রঙের দোতালা বাড়ির অবাধ পরিবেশ তাঁর মানসগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে, যা পরে তাঁর সাহিত্যে বিকশিত হয়।

শিক্ষাজীবন : প্রথম স্তর

জহির রায়হান স্কুল জীবনের বড় অংশ কাটিয়েছেন কলকাতায়। তিনি কলকাতার মডেল স্কুলে ভর্তি হয়েছেন ১৯৪০ সালে। সেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তারপর মিত্র ইনস্টিটিউশনে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। ৭ম শ্রেণিতে উঠে তিনি বাবার কর্মস্থল কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে ভর্তি হন। বিদ্যালয় পাঠকালীন জীবনের এই স্থানান্তর জহির রায়হানের মন-মানসিকতার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা জীবনের প্রথম স্তর অতিবাহিত হওয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি যেমন বিস্তৃত হয়েছিল, তেমনি মানব চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান পরিসর সমৃদ্ধ হয়েছিল। চল্লিশের দশকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন,

প্রতিবাদকারীদের উপর গুলিবর্ষণ প্রভৃতি ঘটনা তাঁকে এই শিশু বয়সেই নাড়া দিয়েছিল। পারিবারিক পরিবেশ, বিচিত্র আবেষ্টনী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তর ও বিবিধ অভিজ্ঞতা জহির রায়হানের মধ্যে এই বয়সেই জীবনসংক্রান্ত একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক জীবন

শিশুকাল থেকেই রাজনৈতিক ঘটনা-আন্দোলন জহির রায়হানকে নাড়া দিত। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি জহির রায়হান যখন স্কুলের নিচের ক্লাসের ছাত্র তখনই অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাবে তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে এসেছেন। শহীদুল্লাহ কায়সার তখন কলকাতার একজন ছাত্রনেতা। প্রকাশ্যে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে এবং গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'জহির রায়হান তখন পার্টি কুরিয়ার ছিলেন। পার্টির আত্মগোপনকারী সদস্যদের মধ্যে চিঠিপত্র ও খবর আদান-প্রদানের কাজ করতেন। প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' বিক্রি করতেন।' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ৯)। অন্যদিকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে সারোয়ার জাহান বলেছেন, '১৯৪৫ সালে 'ভিয়েতনাম দিবস' এর মিছিলে জহির অংশগ্রহণ করেন। সেই মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও আহত হন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মিছিলেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১৩)। তাঁর এই সময়ের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে তৎকালীন একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে : 'তখন ও ভালোভাবে হাফ প্যান্টও পরতে জানতো না। প্রায় বোতাম থাকতো না বলে এক হাতে ঢোলা হ্যাফ প্যান্ট কোমরের সাথে ধরে রাখতো' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬: ৮)। এভাবে পারিবারিক আবহ ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের অস্থির সময়ের কারণে তিনি অতি ক্ষুদ্রকাল থেকেই রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন।

সাহিত্যজীবন : সূচনাপর্ব

জহির রায়হানের লেখার হাতেখড়ি স্কুল জীবন থেকেই। স্কুল জীবনেই তিনি আবেগের মাধুরী মিশিয়ে কবিতা লিখতেন। লিখতেনও অবলীলাক্রমে, ক্ষুদ্র বয়সেই তাঁর লেখার অভ্যাস। 'লিখতেন, ছিঁড়তেন আর পড়ে শোনাতে ভালোবাসতেন। ভাল না লাগলে ছিড়ে ফেলতেন। পরিবারের অনেকেই ছিল তাঁর রচনার একনিষ্ঠ শ্রোতা। জীবনের বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। '৪৭ সনে হিজড়াকে কেন্দ্র করে 'ইন্দ্রানী' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। এ সময়ে একটি কুকুরের রূপ নিয়ে 'মালবিকা' নামের আর একটি গল্প লিখেছিলেন। (আফজালুল বাসার ১৯৮৬ : ৪০)। উল্লেখ এ গল্প দুটি কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৪৮-৫৬

শিক্ষাজীবন

দেশবিভাগের পর পরিবারসহ জহির রায়হান চলে আসেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং তাঁর পৈত্রিক নিবাস নোয়াখালির মজুপুরে বসবাস শুরু করেন। এখানে গ্রামের স্কুল আমিরাবাদ হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে ঐ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৫৩ সালে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এস. সি পাস করেন। এরপর বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। কোন অবস্থাতেই সেখান তাঁর মন স্থির হয় নি। সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। এ কারণে এক বছর পর ১৯৫৪ সালে তিনি অর্থনীতি ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। জহির রায়হানের সহপাঠী আনিসুজ্জামান লিখেছেন, '১৯৫৪ সালে বাংলা বিভাগে যারা প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নেয়ামাল বশীর, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, মাহমুদ শাহ কোরেশী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, জহির রায়হান, বদরুল হাসান, মাকসুদা বেগমের নাম মনে পড়ে। আবদুল গাফফার চৌধুরী তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক, জহির উদীয়মান।' (অনুপম হায়াৎ ২০০৭ : ১৮) শিক্ষা জীবনের এই সময়টুকু ছিল তাঁর মানস গঠনের পরিণত কাল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের এই পর্যায়ে তিনি বহুমুখী সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন যার মধ্যে অন্যতম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, যা তাঁর সাহিত্যচর্চা ও চলচ্চিত্র নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

রাজনীতিচেতনা

তাঁর জীবনের এই পর্যায়ে রাজনৈতিক চেতনাও পাকাপোক্ত হয়। দেশ বিভাগের পর এদেশে এসে তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি। 'বাংলাদেশে এসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সক্রিয় সদস্য বসন্ত ভৌমিক এবং ক্ষিতিশ চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নিশ্চিতভাবেই এরা জহির রায়হানের রাজনৈতিক চৈতন্যকে প্রভাবিত করেছিলেন।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১৩)। ঢাকা এসে অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত হলেন। 'বড়বোন নাফিসা কবির এবং তার স্বামী আহমদ কবিরও জহির রায়হানের রাজনৈতিক চেতনাকে লালন করেছিলেন।' (সুরভী দাস ২০০২ : ৩০)। তবে 'অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের কাজে সহযোগিতার সূত্রধরেই জহির রায়হান রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৩/৫৪ সনের দিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন । এ সময় মণিসিংহের দেয়া রাজনৈতিক নাম রায়হান গ্রহণ করেন।' (আফজালুল বাসার ১৯৮৬ : ৬)। পরে জহির রায়হান পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়াভাবে জড়িত ছিলেন না বটে, তবে সম্পর্ক ছেদ করেননি। নিয়মিত চাঁদা দিতেন, খোঁজ-

Dhaka University Institutional Repository

খবর রাখতেন, যে কোন প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে বড়দা শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন মস্কোপন্থী, অন্যদিকে বড়বোন নাফিসা কবির ছিলেন পিকিংপন্থী। জহির রায়হান সবসময় মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন। মস্কোপন্থীদেরও যেমন চাঁদা দিতেন, তেমনি পিকিংপন্থীদেরও।' (সুরভী দাস ২০০২ : ৩০)। চিন্তা চেতনায় রাজনৈতিক মতাদর্শ লালনের পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও ছিলেন সক্রিয়। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সাল থেকেই ভাষার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গবাসী প্রতিবাদী হতে থাকে যে আন্দোলনের পরিণতি ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি। এই সময় জহির রায়হানও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্ররা তাৎক্ষণিক তা ভঙ্গ করবে বলে মনস্থির করে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দশজনের খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করেছিল। আর প্রথম দশজনের মধ্যেই ছিলেন জহির রায়হান। এ সম্পর্কে জহির রায়হান নিজেই স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে, 'ছাত্রদের গ্রুপে ভাগ করা হলো। আমি ছিলাম প্রথম দশজনের ভেতর। ...১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। কিন্তু প্রথম ব্যাচে কারা যাবে? হাত তুলতে বলা হলো। অনেক ছাত্র থাকা সত্ত্বেও হাত আর ওঠে না। কারণ, ক্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে পজিশন নিয়ে বসে আছে। ভাবখানা এই যে, বেরুলেই গুলি করবে। ধীরে ধীরে একটা দুটো করে হাত উঠতে লাগলো। গুণে দেখা গেল আটখানা। আমার পাশে ছিল ঢাকা কলেজের একটি ছেলে। আমার খুব বাধ্য ছিল। যা বলতাম, তাই করতো। আমি তুলে ওকে বললাম হাত তোল। আমি নিজেই ওর হাত তুলে দিলাম। এইভাবে দশজন হলো।'(শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ৯)

এই মিছিল থেকেই জহির রায়হান প্রথম গ্রেফতার হন, পরে অবশ্য ছাড়া পেয়ে যান। তবে 'এই বছরেই জুন মাসে শহীদুল্লাহ কায়সারকে ধরতে এসে পুলিশ জহিরকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১৪)। 'কারাবরণের পর মুক্তি পেয়ে জহির রায়হান কলকাতায় প্রথমেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফিক স্কুলে চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হন।' (চরিতাভিধান ১৯৮৫ : ১০৫) কিন্তু দশমাসের কোর্স তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি; ছয়মাস পড়াশুনা করার পর অর্থাভাবে ঢাকায় ফিরে আসেন।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ৬১) এ সম্পর্কে ১৯৬৮ সালের সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আশা ছিল একজন ক্যামেরাম্যান হবো। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কলকাতায় প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অব সিনেমাটোগ্রাফিতে ভর্তি হই এবং কিছুদিন পড়ালেখা করার পর ছেড়ে দেই' (আনোয়ার আহমদ ১৯৬৮ : ৪৫)। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষকর্মী ও সিনেমাটোগ্রাফিতে ভর্তি প্রভৃতি ঘটনাপুঞ্জের অভিজ্ঞতা তাঁর কথাসাহিত্য ও চলচ্চিত্র সমৃদ্ধ করেছিল।

ভাষা আন্দোলনের পর তিনি সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্রের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করেন। এরই মধ্যে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাইর শেষ দিকে পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ফলে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন ও নিয়ন্ত্রণ নেমে আসে। সে সময় কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে জহির রায়হানকেও নিয়ন্ত্রিতভাবে চলাফেরা করতে হয়। '১৯৫৫ সালে গ্রেফতার হয়ে তিন সপ্তাহ কারাবন্দী থাকেন।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১৫)। এ বছরই অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে অসাম্প্রদায়িক দল 'আওয়ামী

লীগ'এ রূপান্তরিত হয়। সেই সঙ্গে দলের অঙ্গ সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ'ও মূল গঠনতন্ত্র অনুসরণ শুরু করে। এ সময় জহির রায়হান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে যোগ দেন। আবদুল গাফফার চৌধুরী জানিয়েছেন যে, '১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িক রূপ নিলে তিনি তাতে যোগ দেন। কিছুদিন পর তিনি এবং জহির রায়হান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হন।' (অনুপম হায়াৎ ২০০৭ : ১৯)। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় জহির রায়হানের কর্মপরিধি জীবন ও শিল্পের বিচিত্র পটভূমিতে বিস্তার লাভ করে। সামন্ত আদর্শপুষ্ট সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্তেজনা আক্রান্ত সময়ে চলতে চলতে তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিশেষ করে সাহিত্যাঙ্গন পূর্ণ হয়ে উঠে ছিল জীবন সত্যের প্রতিচ্ছবিতে।

সাহিত্যজীবন ও সাংবাদিকতা

জহির রায়হান চলচ্চিত্রে আবির্ভাবের পূর্বেই লেখালেখির জগতে আসেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। '১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন হাই স্কুলের ছাত্র তখন কলকাতার 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় 'ওদের জানিয়ে দাও' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১২)। অনেকে মনে করেন এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। তাঁর কবিতাটি এমন :

ওদের জানিয়ে দাও

ওদের জানিয়ে দাও।
ওরা আমার ভাইবোনকে
কুকুর বেড়ালের মত মেরেছে।
ওদের ষ্টীম রোলারের নিচে...

ওদের জানিয়ে দাও।
ওরা দেখেও যদি না দেখে
বুঝেও যদি না বুঝে
আগুনের গরম শলাকা দু'চোখে দিয়ে

ওদের জানিয়ে দাও,
মরা মানুষগুলোতে কেমন জীবন এসেছে। (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১২)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালে জেলখানায় বসে তিনি 'পোস্টার' নামে একটি গল্প লেখেন যা 'সচিত্র মহিলা' মাসিক খাওয়াতীন এর ঈদ সংখ্যা প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু ঐ সময় ঈদ সংখ্যার মুদ্রণ কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে গল্পটি আর খাওয়াতীনে ছাপা হয়নি। পরে গল্পটি মাসিক 'সিনেমা' পত্রিকায় ছাপা হয়।' (রাবেয়া খাতুন ১৯৯৪ : ৯৫) সম্ভবত এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্প।

'তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'হারানো বলয়' প্রকাশিত হয় ড. অলিম চৌধুরী এবং এম. এ. কবীর সম্পাদিত 'যাত্রিক' পত্রিকায় ১৯৫১ সালে। তখন তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১৩) পরে তিনি 'যাত্রিক' এর সম্পাদনা কর্মে যুক্ত হয়েছিলেন। 'আহমদ কবীর ছিলেন জহির রায়হানের বড় বোন নাফিসার স্বামী। জহির রায়হান সেই সূত্রেই 'যাত্রিক' এর সঙ্গে জড়িত হন। এই পত্রিকার অন্যতম লেখক ছিলেন তিনি, ছিলেন সহকারী সম্পাদকও।' (ইসরাইল খান ১৪০২-০৩ : ১১৬)। এ সম্পর্কে আহমদ রফিক ও লিখেছেন, 'যাত্রিক প্রকাশের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন আলীম, সঙ্গে ছিলেন আহমদ কবীর... যোগ দিয়েছে জহির রায়হান। ছটফটে অস্থির প্রকৃতির জহিরের তখন সাংবাদিক-সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন। এই জহির 'যাত্রিক' এর প্রকাশনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শুধু লেখা দিয়ে নয়, মূলত কাজ কর্মের মাধ্যমেই।' (ইসরাইল খান ১৪০২- ১৪০৩ : ১১৬)

মাসিক 'যাত্রিক' এর প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর একটি নাট্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 'এই প্রতিবেদন আলোচনাটি তিনি লিখেছেন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর ঢাকার মঞ্চস্থ নাটক 'নার্সিং হোম' এর উপর ভিত্তি করে।' (ইসরাইল খান ১৪০২-১৪০৩ : ১১৭-১১৮)। পরের সংখ্যায় তাঁর 'হারানো বলয়' গল্পটি প্রকাশ পায়। প্রায় একই সময়ে জহির রায়হান লিখতেন ঢাকার আরেকটি মাসিক পত্রিকা 'স্পন্দন' (১৯৫৩) এ। এই পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের ৬-৭ সংখ্যায় ছাপা হয় তাঁর 'ভাঙ্গাচোরা' নামে একটি গল্প।' (ইসরাইল খান ১৪০২-১৪০৩ : ১১৯)

জহির রায়হানের সাংবাদিক জীবন শুরু হয় 'খাপছাড়া' পত্রিকার মাধ্যমে। এরপরে সাপ্তাহিক 'যুগের দাবি' (১৯৫৩) পত্রিকায় প্রতিবেদন লিখতেন। এ পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রথম প্রতিবেদন ছিল 'মুসলিম লীগের মুরগীর লড়াই'। এটি ছিল তৎকালীন 'মুসলিম লীগ'র অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল নিয়ে একটি ব্যাঙ্গাত্মক রচনা। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে পত্রিকাসম্পাদক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি ইচ্ছে করেই 'মুরগীর লড়াই' দিয়েছি। কারণ, মুসলিম লীগের নেতারা দেখতে তো বেশ চিটাগাঙের মোরগের মতো তাগড়া তাগড়া। কিন্তু স্বভাবে তো তারা সব কুঁইচ্ছা মুরগী বাঁঝা মুরগী। শুধু খায় আর কড় কড়ায় কিন্তু ডিমি পাড়ে না।' (খোন্দকার মোহাম্ম ইলিয়াস ১৯৭৩ : ২)

পরবর্তী কালে কোরিয়ার যুদ্ধ নিয়ে জহির রায়হান আরেকটি সংবাদ বিবরণী লেখন যার শিরোনাম 'সাম্রাজ্যবাদী কামানের খোরাক'। এ সম্পর্কে চৌধুরী আতাউর রহমান লিখেছেন, 'সাংবাদিকতায় জহির রায়হান অনন্য ব্যক্তিত্ব। তা

প্রকাশ পায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে, যখন কোরিয়ায় তুমুল যুদ্ধ। একদিকে সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার মুক্তিসেনা দল, তাদের সমর্থনে নবীন চীনের সেচ্ছাসেবক বাহিনী। অপর দিকে আমেরিকার নেতৃত্বে সমগ্র ধনতান্ত্রিক বিশ্ব। ... 'সাম্রাজ্যবাদী কামানের খোরাক' ছিল চমৎকার একটি সংবাদ বিবরণ। যে সংবাদটিতে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে তখনকার কোরিয়ার সম্পূর্ণ চিত্র ফুটে ছিল। তা জহির রায়হানের অন্যতম সৃষ্টি।' (চৌধুরী আতাউর রহমান ১৯৮২ : ২৮-২৯) তিনি এই সময় আরেকটি পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হন। পত্রিকটির নাম 'সচিত্র সন্ধানী'। এ সম্পর্কে সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দীন আহমেদ লিখেছেন, 'আমি ১৯৫৬ সালে 'সচিত্র সন্ধানী' প্রকাশ শুরু করি। সন্ধানীর সাথে জহির রায়হানের প্রায় রক্তের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।' (গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ : ১৯৯৬) ১৯৫৫ সাল ছিল জহির রায়হানের জীবনের মোড় ঘুরার কাল। এ বছরই তিনি সম্পাদক ও গ্রন্থাকার হিসেবে আবির্ভূত হন। পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হলেও এ বছরই তাঁর প্রথমগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' প্রকাশিত হয়। এটি একটি গল্পগ্রন্থ। আহসান হাবীবকে প্রধান সম্পাদক করে এ বছরই ২৪ নভেম্বর তিনি 'প্রবাহ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। এটি একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিভিত্তিক পত্রিকা। এ পত্রিকায় সেকালের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা ছাপানো হতো। তাঁর আলোচিত ছোটগল্প 'নায়িকা' ছাপা হয় এ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় ৮ ডিসেম্বর ১৯৫৫। তবে অল্প কয়েক সপ্তাহ প্রকাশের পর 'প্রবাহ' বন্ধ হয়ে যায়।

'জহির রায়হান যেসব পত্রিকার সম্পাদনের সঙ্গে জড়িত তার মধ্যে 'সিনেমা' অন্যতম। 'সিনেমা' ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত প্রথম সিনে-মাসিক পত্রিকা। প্রকাশকাল ছিল ১৯৪৮-৪৯ এবং সম্পাদনায় ছিলেন ফজলুল হক। প্রথম ২/৩ টি সংখ্যা বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ঢাকা থেকে নিয়মিতভাবে দশ /বারো বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। শেষদিকে অবশ্য কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। প্রথম প্রকাশের কয়েক বছর পর ফজলুল হক, রাবেয়া খাতুন, কাইয়ুম চৌধুরী এবং জহির রায়হান এই চারজন 'সিনেমা' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সাহিত্য বিভাগটি সম্পাদনা করতেন রাবেয়া খাতুন এবং জহির রায়হান । সিনেমাবিষয়ক সমালোচনার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয় এই পত্রিকায় ছাপা হত। উৎকৃষ্টমানের সমালোচনা এবং সাহিত্য পাতায় রাবেয়া খাতুন, কাইয়ুম চৌধুরী, জহির রায়হান ছাড়া অন্য যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দিন আল-আজাদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, ওবায়েদুল হক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।' (সুরভী দাস ২০০২ : ২৮)। সেকালে 'সিনেমা' পত্রিকাকে ঘিরে বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পীদের একটি সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে উঠেছিল। প্রতিদিন সান্ধ্য আড্ডা বসত সাহিত্য সম্পাদিকা রাবেয়া খাতুনের বাড়িতে। আর ছুটির দিনের প্রতি দুপুরে রাবেয়া খাতুনের বাড়ির নিয়মিত অতিথি ছিলেন জহির রায়হান এবং কাইয়ুম চৌধুরী। মাঝে মাঝে আসতেন আলাউদ্দীন আল-আজাদ। জহির রায়হান, রাবেয়া খাতুন এবং কাইয়ুম চৌধুরীর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। জহির রায়হানের লেখার প্রথম পাঠক ছিলেন রাবেয়া খাতুন এবং কাইয়ুম চৌধুরী। জহির রায়হানের বিখ্যাত উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে' প্রথম নাম ছিল 'ধরপ্রহর'। লেখার পর কাইয়ুম চৌধুরী উপন্যাসটি সম্পর্কে এরকম একটি মন্তব্য করেছিলেন 'তুমি একটি গ্রামের চিত্র আঁকতে চাচ্ছ, অথচ তাতে একটি কুকুর নেই, বিড়াল নেই, এ হতে পারে না।' পরে যখন নতুন করে 'হাজার বছর

Dhaka University Institutional Repository

ধরে' নাম করে প্রকাশিত হয় তখন তা অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আজও 'হাজার বছর ধরে' বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশিষ্টমণ্ডিত উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। 'উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে জহির রায়হানের চাচী এবং 'ইনল্যাণ্ড প্রেস' ('স্বত্ত্বাধিকারী ফজলুল হক, রাবেয়া খাতুন) আর্থিকভাবে সহায়তা করেছিলেন।' (সুরভী দাস ২০০৭ : ২৯)। এ পর্যায়ে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা তাঁর সাহিত্যচর্চার মানসিকতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তৃতীয় পর্যায় : ১৯৫৭-৬৫

শিক্ষা জীবন

অর্থনীতি ছেড়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিতে অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে এম. এ ক্লাসে ভর্তি হলেও নিয়মিত ক্লাস করতেন না। এ সম্পর্কে এম. এ ক্লাসের সতীর্থ

মুহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জানিয়েছেন : 'চাপা স্বভাবের, ছোট-খাটো, মুখাবয়ব কিংবা গলার স্বরও তেমন আকর্ষণীয় নয় এমন একজন সতীর্থ পেলাম, যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্বের এম. এ ক্লাসে পড়ি। ১৯৫৮-৫৯ সেসনের কথা। আমি এসেছি এম.এ প্রথম পর্ব থেকে আর উপরোক্ত সতীর্থ এসেছেন বি.এ অনার্স পাশ করে। ছাত্র হিসেবে সিরিয়াস ছিলেন না। হপ্তায় একদিন কিংবা বড়জোর দুদিন ক্লাসে আসতেন। দু-একটা ক্লাস করেই হুট করে চলে যেতেন। ক্লাসে আসতেনও এমন সময় যখন ঘন্টা পড়ে গেছে, ক্লাসের রোল কলও প্রায় শেষ। চুপটি মেরে পেছনের বেঞ্চিতে বসতেন। হাতে খাতাপত্র থাকতো না, টিউটোরিয়ালও জমা দিতে দেখিনি কোন দিন। আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার কিংবা সেমিনারে বসে বই পড়ার অছিলায় আড্ডা মারার সময় ছিলনা তাঁর। ভীষণ ব্যস্ত মনে হতো তাঁকে। যেন ব্যবসায়ী কেউ, সখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে এসেছেন। বেশ ভুষায় কথাবার্তায় টিপটপ, ছিমছাম।

এমন সতীর্থের প্রতি কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক। কদিন পরেই জানতে পালাম ইনিই তরুণ গল্পকার জহির রায়হান ; চলচ্চিত্র শিল্পে তখন তাঁর শিক্ষানবিশি চলছে। ডিগ্রীর মোহ ছিলোনা তাঁর। সেসনের শেষের দিকে তাঁকে আর ক্লাসে আসতে দেখিনি। এম. এ. পরীক্ষার ফর্ম পর্যন্ত পূরণ করেননি।' (মজহারুল ইসলাম ১৯৭৩ : ২৬৮)। কিন্তু আফজালুল বাসার সংশোধনীতে উল্লেখ করেছেন জহির রায়হান 'এম-এ পরীক্ষার ফরম পর্যন্ত পূরণ করেন নি'- এ তথ্য ঠিক নয় তিনি প্রবেশপত্র পেয়েছিলেন।' (আফজালুল বাসার ১৯৮৬ : ৪০)। 'আফজালুল বাসারের তথ্য মতে

এম. এ. পরীক্ষার প্রবেশপত্র জহির রায়হান পেলেও পরীক্ষায় তিনি অংশগ্রহণ করেননি বিধায় জহির রায়হানের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার এখানেই সমাপ্তি ঘটে।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১২)

অন্যদিকে ড. মোহাম্মদ হান্নান এবং আরজুমন্দ আরা বানু কতৃক সম্পাদিত রচনাসমগ্রের জীবনপঞ্জী'তে উল্লেখ রয়েছে '১৯৫৬-৫৮ সময়কালে জহির রায়হান চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়তেন কিন্তু কোর্স শেষ করেন নি।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০১৩ : ২২)। কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁর পরিবারের নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তাই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া তার সমকালীন সহপাঠী মমতাজউদ্দীন বলেছেন, 'জহির রায়হান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র। আমাদের সমকালীন ছাত্র। অথচ তাকে সবসময় ক্লাসে পাইনি আমরা। অধ্যাপকেরা তাকে খুঁজেছেন, আমরাও তাকে চেয়েছি। কিন্তু বেশিরভাগ ক্লাসে জহির নেই। বিভাগের চেয়ারম্যান হাই স্যার জহির রায়হান প্রমুখ ছাত্রদের পেয়ে খুব গর্ব করতেন। কিন্তু তাদের অনেককে ক্লাসে না পেয়ে দুঃখও করতেন। বলতেন , এরা আসে না কেন, ফার্স্ট ক্লাস কি এরা নেবে না। এ সময় আহমেদুর রহমান, গাফফার চৌধুরী, নেয়ামাল বশীর ছিলেন বাংলা বিভাগে । ক্লাস করতেন না কেউ।' (অনুপম হায়াৎ ২০০৭ : ২৩)। এভাবেই জহির রায়হান বাস্তব জীবন পরিক্রমার মধ্যে আপন অঙ্গন খুঁজে নিয়ে ছিলেন।

রাজনীতি ও কর্মজীবন

এই পর্যায়ে এসে জহির রায়হানের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ অনেকটা কমে যায়। তারপরও তিনি একেবারে রাজনীতি বা সমাজ বিমুখ হননি। '১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত হয় বহুল আলোচিত 'আফ্রো এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। এই সম্মেলনে অন্যান্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের বামপন্থী কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। ফয়েজ আহমদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদ-সংস্কৃতি সেবীদের সম্পর্ক ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন জহির রায়হানের অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারও। ১৯৫৭ সালেই জহির রায়হান গ্রেফতার হয়ে তিন মাস জেলে কাটান।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১৫) ১৯৫৮-৫৯ খ্রিষ্টাব্দে জহির রায়হান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সংস্কৃতি সংসদ' এর সভাপতি হন। ওই সময় তিনি সংসদের সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন যে, এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল 'হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে শ্বাসনালীর মতো।' (অনুপম হায়াৎ ২০০৭ : ২৫)। এরপর থেকে দেশের রাজনৈতি অঙ্গন প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত হলেও মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত জহির রায়হান প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না; তবে তাঁর জীবন থেকে রাজনীতির সম্পর্ক ছেদ করেননি। এ সময় তাঁর সাহিত্যকর্ম ও চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক বক্তব্য জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে এ পর্যায় তাঁর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। বিশেষ করে ১৯৫৭ সাল। এ বছরেই আখতার জং কারদারের 'জাগো হুয়া সাবেরা' চলচ্চিত্রের সহকারী পরিচালক হিসেবে তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের হাতেখড়ি। ১৯৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার অদূরে ষাটনলে পদ্মা নদীতে শুরু হয় এই ছবির শুটিং। এ ছবির পর আরো দুটি ছবির সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হন। ছবি দুটি হলো, সালাউদ্দীন পরিচালিত 'যে নদী মরু পথে' এবং এহ্‌তেশাম পরিচালিত 'এদেশ তোমার আমার'। একই সময়ে তিনি নুরুল ইসলাম পরিচালিত সরকারি প্রযোজনায় নির্মিত প্রচারচিত্র 'নবারুন' এর সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া 'পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে অন্যানের সঙ্গে জহির রায়হান ও ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত 'গ্রীনউড মুভি টোন' নামে একটি প্রচার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বলে কাইয়ুম চৌধুরী জানিয়েছেন। ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম একক পরিচালিত ছবি 'কখনো আসেনি'র শুটিং শুরু হয়। ১৯৬১ সালের মে-জুন মাসে ঢাকায় একটি ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হয়। সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন এর আহবায়ক। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ফতেহ লোহানী, এস. এম. পারভেজ, কাইয়ুম চৌধুরী, জহির রায়হান প্রমুখ। ১৯৬২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সোনার কাজল' ছবির পরিচালক ছিলেন জহির রায়হান ও কলিম শরাফী। এ সালেই প্রথম বারের মতো চলচ্চিত্রকার পরিষদ গঠিত হয় যেখানে সালাহউদ্দিন হন সভাপতি আর জহির রায়হান ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৩ সালের ১৮ জানুয়ারি মুক্তি পায় তাঁর 'কাঁচের দেয়াল'। পরে ১৯৬৪ সালে উর্দু ভাষায় মুক্তি পায় 'সঙ্গম' ছবিটি। এই ছবির জন্য তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের 'নিগার' পত্রিকা পুরস্কার পান। এ বছরই ১৯ নভেম্বর তিনি 'বাহানা' ছবির সুটিং শুরু করেন। ১৯৬৫ সালের ১৮ মার্চ বলাকা হলে সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী দিনে তিনি বিশেষ চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৬৫ সাল ছিল জহির রায়হানের জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর ৬ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসব' যার অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি নিজেই। এ উৎসবটি ছিল তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো। কারণ উৎসবের পুরস্কার তালিকায় তিনি ছিলেন শীর্ষে। এরপর থেকে তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। যদিও তাঁর পারিবারিক জীবনে দুর্দিন চলছিল। এর মধ্যেই তিনি কাজ চালিয়ে গেছেন। 'ব্যক্তি জীবনের তোলপাড়ের মধ্যেও জহির রায়হান এ সময় 'নিক্কন এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এর মাধ্যমে আধুনিক পরিকল্পিত উপায়ে চলচ্চিত্র নির্বাচনের ঘোষণা দেন। জানানো হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার 'হাজার বছর ধরে' ও 'লেট দেয়ার বি লাইট' নির্মিত হবে।' (চিত্রালী : ৬ নভেম্বর ১৯৬৫)। মূলত এই সময় পর্বে জহির রায়হান তাঁর কর্মজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করেছিলেন।

বিবাহ

এহ্‌তেশামের পরিচালনায় 'এদেশ তোমার আমার' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার সময় নায়িকা সুমিতা দেবীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ১৯৬১ সালে তাঁরা পরিবারের কাছে গোপন রেখেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাত্র পাঁচ বছর টিকে ছিল তাঁদের সংসার জীবন। এরপর বিচ্ছেদের সুর বাঁজে এবং তাঁরা আলাদা থাকা শুরু করেন। এদিকে ১৯৬৮ সালে জহির রায়হান আবার বিয়ে করেন চিত্র নায়িকা সুচন্দাকে। সুমিতা দেবীর গর্ভে দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করে বিপুল রায়হান ও অনল রায়হান। সুচন্দার গর্ভেও দুই সন্তান অপু রায়হান এবং তপু রায়হান।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য জীবন

১৯৫৬-৬৫ সময় পর্ব ছিল জহির রায়হানের সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ সময়। পূর্বেই তাঁর প্রথম ও একমাত্র গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময়ে তাঁর বেশ কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি এই সময়খণ্ডে জহির রায়হান সাহিত্যচর্চায়ও মনোসংযোগ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। উপন্যাসটির নাম 'শেষ বিকেলের মেয়ে' একটি রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান। এরপর মাত্র দুই বছর পর আরেকটি উপন্যাস প্রকাশ করেন, নাম 'তৃষ্ণা'। এটিও প্রেমের উপন্যাস। এর দুই বছর পর তিনি উল্লেখযোগ্য একটি উপন্যাস রচনা করেন। আবহমান গ্রাম বাংলার জীবন-জীবিকার পটভূমিতে 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪)। একই বছরে উপন্যাসটির জন্য তিনি 'আদমজী পুরস্কার' লাভ করেন। এসব উপন্যাসে নারী পুরুষের মানস যন্ত্রণা, তাদের প্রেম-বিচ্ছেদের আঘাত বর্ণনার পাশাপাশি সমাজ নিয়ে তাঁর মিশ্র প্রতিক্রিয়া অতি সাবলীর ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। ষাটের দশকের জীর্ণ, বিচূর্ণ রক্তাক্ত সময় ও সমাজ চেতনার অঙ্গীকার, যন্ত্রণা, বেদনার হাহাকার মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কোন কোন লেখায়। মূলত সমাজ ও সময়ের অন্তঃসারকে আত্মস্থ করে জহির রায়হানের জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শ এ পর্যায়ে অর্জন করে গৌরবময় ও স্বতন্ত্র অবয়ব।

চতুর্থ পর্যায় : ১৯৬৬-১৯৭২

বাঙালি জাতির গণতন্ত্র, স্বাধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চরম পর্যায়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তেইশ বছরের নব্য-ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও নিপীড়নে ক্ষুব্ধ জাগ্রত জাতিসত্তা বিচিত্র ঘটনা ও রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উপনীত হয় মৌলিক মীমাংসার দ্বারপ্রান্তে। জাতীয় জীবনের এই পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৮২ : ৭০০-৭০২)। তিনি বাঙালির ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলার আহবান করেন। তারপরই শুরু হয় ১৯৭১ সালের নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ যেখানে এমন ঘোষণা বাঙালি জীবনকে বদলে দিয়েছিল। পাকিস্তানিরা নির্বিচারে এদেশের মানুষের উপর হত্যা নির্যাতন চালিয়েছিল। তারপরও বাঙালি যখন পিছু হটলো না তখন তালিকা করে করে ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। কিন্তু জাতির জনকের সেই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় জাতিসত্তার সশস্ত্র প্রতিরোধ, আত্মত্যাগ, সংগ্রামী অপরাজেয় চেতনা এবং কার্যকর উদ্যম পরিণামে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ে ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

রাজনৈতিক জীবন

এ পর্যায়ের প্রথমে তিনি রাজনীতিতে বেশি সক্রিয় ছিলেন না। তাঁর ব্যস্ততা ছিল চলচ্চিত্র ও সাহিত্য নিয়ে। কিন্তু পরোক্ষভাবে সেখানেও রাজনৈতিক মতাদর্শ উপস্থাপন করেছেন। এ সময় তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উপস্থিত থাকতেন না তবে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তাঁর অগোচর ছিল না । '১৯৬৬ সালে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট বিভাজনের সময় অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হয়। জহির রায়হানও এসময় দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি পার্টি ভাঙ্গার ব্যাপারে দলীয় নেতা কর্মীদের দায়ী করেন। এ সময় তিনি বড় বোন নাফিসা কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় জহির রায়হান 'পিকিং পন্থী' হয়ে পড়েন অনেকখানি। '৭০ এ এসে তিনি 'মাও সেতুঙ' দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন । এ সময় বাংলাদেশের 'মাও সেতুঙ পন্থী' দলগুলো বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত ছিল। সবার সঙ্গে জহির রায়হানের যোগাযোগ ছিল এবং মোটা অঙ্কের চাঁদাও দিতেন। এমনকি তাঁর মরিস অক্সফোর্ড গাড়িটি একটি সংগঠনকে দিয়েছিলেন সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য। 'পিকিং পন্থী'দের ঐক্য তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন। পাশাপাশি 'মস্কোপন্থী'দের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। 'মস্কোপন্থী' অনেক লেখক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতার সঙ্গেও তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নিজে 'পিকিংপন্থী' হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্ক তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। বড়দা শহীদুল্লা কায়সারের প্রভাব তাঁর উপর এত বেশি ছিল যে তাঁর সামনে কখনোই তিনি মস্কোপন্থীদের সমালোচনা করতেন না।জহির রায়হান তাঁর নির্মীয়মান 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছবিটি মস্কো পাঠাতে চেয়েছিলেন।' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ৯)। এভাবে তাঁর মস্কো প্রীতির ধারণা পাওয়া যায়।

'১৯৬৮, ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে প্রকাশ্যে ও গোপনে জহির রায়হান জড়িত ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মে। তিনি জড়িত ছিলেন কমরেড মণিসিংহের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে। ১৯৬৯ সালের মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কৃষক সমিতির বিক্ষোভ সমাবেশের দৃশ্য তিনি মুভি ক্যামেরায় ধারণ করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৭০ সালের 'ডাকসু' নির্বাচনের সময় তাঁর 'মরিস' গাড়িটি ড্রাইভারসহ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) কে।' (চৌধুরী আতাউর রহমান ১৯৮২ : ৩০-৩১)। ১৯৬৯ সালে এদেশ রাজনৈতিকভাবে অগ্নিগর্ভে প্রবেশ করে। একদিকে শাসকবর্গের নিষ্ঠুর নির্যাতন, দমন, অন্যদিকে সচেতন মানুষের প্রতিবাদ, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। জহির রায়হান নানা মাধ্যমেও এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এ বছরের ৪ জানুয়ারি ঘোষিত হয় ছাত্রদের ঐতিহাসিক ১১ দফা, ৮ জানুয়ারি গঠিত হয় 'ড্যাক'। ১১ দফার সমর্থনে ছাত্রদের মিছিলে নিহত হয় আসাদুজ্জামান, ২১ জানুয়ারি পালিত হয় স্বত:স্ফূর্ত হরতাল, ২২ ও ২৩ জানুয়ারি প্রতিবাদ, মিছিল, শোক সমাবেশ চলে , ২৪ জানুয়ারি পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। ...এ সময় সিনেমা হল বন্ধ থাকে। চিত্রশিল্পের কাজও থাকে বন্ধ। ছাত্র ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি, শিল্পীরা ও প্রতিবাদ জানায়। ৩০ জানুয়ারি চিত্রনির্মাতা ও কুশলীরা সভায় মিলিত হয়ে প্রতিবাদ করেন। পরে লিখিতভাবেও তারা প্রতিবাদ জানায়। জহির রায়হান এই লিখিত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।' (চিত্রালী : ৩১ জানুয়ারি ও ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯,)

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী সময়ে নূর খান উভয় পাকিস্তানের জন্য একটি শিক্ষানীতি প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ছাত্ররা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। 'পূর্ব পাকিস্তানের ৩১ জন ছাত্রনেতা ১৩ আগষ্ট (১৯৬৯) এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রথম জানান নূর খান ঘোষিত শিক্ষানীতির প্রতি তাঁদের কোন সমর্থন নেই। তাঁরা বলেন, এটা ছাত্রদের ১১ দফার পরিপন্থী।' (মোহাম্মদ হান্নান ১৯৮৭ : ৮৩)। এদিন ২৬ জন বিশিষ্ট নাগরিকও এক বিবৃতিতে ছাত্রদের সমর্থন করেন। 'বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন কবি জসীমউদ্‌দীন, বদরুদ্দীন উমর, শহীদুল্লাহ কায়সার, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, জহির রায়হান, আতাউস সামাদ প্রমুখ।' (দৈনিক পাকিস্তান : ১৯৬৯)

এছাড়া ঊনসত্তরের আন্দোলনকে কাহিনী করে তিনি একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন যার নাম 'জীবন থেকে নেয়া'। ভাষা আন্দোলন, শহীদ মিনার, ৬টি চাবি (৬ দফা) ইত্যাদি নিয়ে এই মহান ছবিটি নির্মিত হয়। এ বছর 'পাকিস্তান লেখক সংঘে'র পূর্বাঞ্চল শাখা পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা ও কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের খবরের প্রতিবাদে বাংলা একাডেমীতে 'লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি' প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। অন্যদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯ জন শিক্ষক ও চলচ্চিত্র শিল্পীর বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০ জন শিল্পী ও কর্মী বিবৃতি দেন। 'এতে স্বাক্ষর করেন খান আতাউর রহমান, জহির রায়হান, হাসান ইমাম, শবনম প্রমুখ।' (দৈনিক পাকিস্তান : ১৫ জানুয়ারি ১৯৭০)। এছাড়া ১৯৭০ সালে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্য তালিকায় পাকিস্তান 'দেশ ও কৃষ্টি' গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করায় প্রতিবাদে ছাত্ররা আন্দোলন করে যার সঙ্গেও জহির রায়হানের একাত্মতা ছিল। ২৯ আগষ্ট পূর্ব বাংলার বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও পয়লা সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। 'এ দিন ১৬ জন বুদ্ধিজীবী 'দেশ ও কৃষ্টি' গ্রন্থখানি পুরোপুরি বাতিলের আহবান জানিয়ে বিবৃতি দেন। এতে স্বাক্ষর করেন কবি সুফিয়া কামাল, কবি জসিমউদ্‌দীন, শহীদুল্লা কায়সার, ড. আহমদ শরীফ, ওবায়দুল হক, সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, বজলুর রহমান, জাহেদুর রহিম, জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান প্রমুখ।' (দৈনিক পাকিস্তান : ২৯ আগষ্ট ১৯৭০)

জহির রায়হান সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন অস্ত্র হাতে নিয়ে নয় ক্যামেরা হাতে। '১৯৭১ সালের প্রথম থেকেই দেশ বিমূর্ত রূপ ধারণ করে। তখন প্রতিবাদের ঝড় ওঠে আকাশে বাতাসে। ১৯৭১ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উপলক্ষে চলচ্চিত্র শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এফডিসির শহীদ মিনারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জহির রায়হান বক্তৃতা দেন।' (অনুপম হায়াৎ ২০০৯ : ৪০)। এ সালের পয়লা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় ৩রা মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় অধিবেশ বন্ধ হওয়া সারা দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 'এ দিন বাংলা একাডেমীতে বেতার টিভি, চলচ্চিত্র ও অংকন শিল্পীদের নিয়ে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ গণহত্যার প্রতিবাদ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় শপথ গ্রহণ করে।' (সুকুমার বিশ্বাস ১৯৯৬ : ১৪৫)। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানও এই অসহযোগ গণআন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত হন। 'অসহযোগ ও গণ আন্দোলন চলাকালে ৩৩ জন চলচ্চিত্রসেবী সামরিক শাসনের অবসান, নির্ধারিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ও হত্যা-নির্যাতন বন্ধের দাবি করে বিবৃতি দেয়। এই বিবৃতি দাতাদের একজন ছিলেন জহির রায়হানও।' (চিত্রালী : ১২ মার্চ ১৯৭১)। ১২ মার্চ

বাংলার মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বাস্তবমুখী প্রত্যক্ষ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য হাসান হাফিজুর রহমানকে আহবায়ক করে 'লেখক সংগ্রাম শিবির 'গঠন করা হয়। এর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জহির রায়হান।' (সুকুমার বিশ্বাস ১৯৯৬ : ১৯৫)। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ সাপ্তাহিক 'চিত্রালী' তে গণশিল্প প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধে জহির রায়হান বলেন, 'গণশিল্পীরা যারা এতোদিন নির্জীব হয়েছিলেন। পলাতক ছিলেন। হতাশায় ভুগছিলেন কিংবা পেটের দায়ে অথবা জান বাঁচাতে গিয়ে শত্রু শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন সবাই আবার গাঁ ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ময়দানে নামলেন।' এ সময় বিশেষ করে '৭১- এর ২৫ মার্চে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারে বিচলিত হয়ে জহির রায়হান রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন। এ সময় তিনি 'মাও সেতুঙে'র সামরিক প্রবন্ধাবলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দীর্ঘ স্থায়ী গণযুদ্ধের কথাও ভাবতেন। কিন্তু পার্টির কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য ঢাকা ছেড়ে প্রথমে আগরতলা এবং পরে কলকাতায় যান।' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ১১)। ২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্পর্কে জহির রায়হান নিজেই বলেছেন,

> মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে অসহায় বাংলার মেহনতি মানুষ তার দুর্জয় মনোবল আর তার সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধে। বাংলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার আর পুলিশ বাহিনী তাদের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্য অস্ত্র তুলে নিলো হাতে। আর অন্যদিকে ইয়াহিয়া খানের বর্বর সেনারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পুরো দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করতে লাগলো। হিংসার এই উন্মত্ততার মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের নিজস্ব সরকার গঠন ছাড়া আর অন্য কোনো পথ রইলো না। বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিরা তাই মুজিবনগরে সমবেত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৮২ : ৩২৩)

যুদ্ধ শুরু হলে জহির রায়হান গোপনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সীমান্তে যাবার জন্য তিনি নিজেই অস্থির হয়ে পড়েন। এ সময়ের কথা লিখেছেন জহির রায়হানের বড় ভাবি : 'ও নিজেও সীমন্তে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। ওর বড় দাকে বলতো– বড়দা, আমি চলে যাব। এখানে থেকে আমি কিছু করতে পারবো না। এবার আমি আমার স্বপ্নকে কাজে লাগাব। ক্যামেরায় ধরে রাখতে হবে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস। এতো দিন শুধু ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। এবার দিন এসেছে, মানুষের জন্য কাজে লাগাতে হবে আমার ক্যামেরা।' (পান্না কায়সার ১৯৯১ : ৯৫)

একাত্তরের ২৫ মার্চ পাক-বাহিনীর আক্রমণের পর দিনের পর দিন নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন জহির রায়হান। ভারতে যাবার আগ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারায় বেদনা সারাক্ষণ তাঁকে যন্ত্রণাদগ্ধ করতো। ভারতে তিনি যান ১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল। কুমিল্লা পর্যন্ত অনুজ জাকারিয়া হাবিব সঙ্গে ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণায়, 'তখন জহিরের খালি পা, পরনে লুঙ্গি গায়ে আধা ময়লা একটি শার্ট। যাবার পূর্ব মুহূর্তে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জহির বলেন- 'চলি, আবার দেখা হবে, সুদিনে এই বাংলায়।...আমার জন্য কোন চিন্তা করো না । পথের মানুষ আমি পথেই নেমে গেলাম।' (জাকারিয়া হাবিব : ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩)

মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে তিনি ঢাকা ছেড়ে প্রথমে আগরতলা এবং পরে কলকাতায় যান। ভারতে গিয়ে জহির রায়হান প্রথমে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আশ্রয় নেন। এখানে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু চিত্র পরিচালক বাবুল চৌধুরীর সাক্ষাৎ পান। 'জহির রায়হান তাঁকে দেখে বেশ খুশি হন এবং তাঁর অনুরোধে জহির রায়াহনের স্ত্রী সুচন্দা ও দুই পুত্রকে খুঁজে বের করে প্রথমে আগরতলা এবং পরে কলকাতায় নিয়ে যান। সময়টা তখন ১৯৭১ সালের জুন মাস।' (বাবুল চৌধুরী : ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭)। ভারত পৌঁছে তিনি যুদ্ধের প্রচার ও প্রসারে নিযুক্ত হন। এজন্য সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশের যেসব শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিককর্মী সে সময় কলকাতায় আশ্রয় নেয় তাঁদেরকে সংগঠিত করে ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিকের উদ্যোগে Bangladesh Liberation Council of Intellgentsia গঠন করেন। এই সংগঠনের সভাপতি হন আজিজুর রহমান মল্লিক আর সাধারণ সম্পাদক জহির রায়হান। তিনি যথাযথভাবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতেন। জনাব ওয়াহিদুল হক তাঁর অবদান সম্পর্কে বলেছেন :

> 'জহির রায়হান ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। কি প্রচণ্ড পরিশ্রমে সংগঠনের জন্য Bangladesh Liberation Council of Intelligentsia কাজ করেছে তা বলা যায় না। একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একদিন হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে জীবন থেকে নেয়া ছবির একটা প্রিন্ট কলকাতায় এসেছে। সারাদিন খোঁজার পর পাওয়া গেল সেটি। শেরপুর এলাকার একটি সিনেমা হলের মালিক সাহস করে নিয়ে এসেছেন। মালিক জানালেন এটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং প্রিন্ট তিনি দেবেন না। তখন মীমাংসায় বসা হল। জনাব খায়ের (সংসদ সদস্য) এর দায়িত্ব নিলেন। ষাট হাজার টাকা নগদ দেওয়া হল মালিককে। এরপর ঠিক হল ছবি দেখিয়ে যা আয় হবে তার অর্ধেক পাবে শিল্পীরা বাকিটা পাবে এম. সি. এ। জহির রায়হান নিজে কিছুই নিলেন না । মনে রাখা দরকার সবার আর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিল।' (হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৮২ : ১৯৬)

'সেই দিনগুলোতে জহির রায়হানের আর্থিক অবস্থা এতোটাই খারাপ ছিল যে স্ত্রী পুত্রের খাবার যোগাতে হিমশিম খেয়েছেন। টাকার অভাবে ছেঁড়া চপ্পল পায়ে চলাফেরা করেছেন।' (পান্না কায়সার ১৯৯১ : ৯৫)। দেশমাতৃকাকে পাক-বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করতে এসব সাধারণ কষ্ট তিনি হাসি মুখে স্বীকার করে নিতেন। স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে তিনিও ছিলেন একাত্ম প্রাণ। কোন বাধা, কোন কষ্ট তাঁকে তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। জহির রায়হানের মুক্তিসংগ্রাম প্রসঙ্গে পরিচালক আলমগীর কবির বলেছেন :

> '২৫ শে মার্চ ৭১ থেকে বাঙালার বুকে বিদেশী দানবদের তাণ্ডবনৃত্য। কিন্তু কিংকর্তব্য বিমূঢ়তায় ভুগতে হয় নি জহিরকে...। সে জানতো পরবর্তিত অবস্থায় তার কর্তব্য কি।
>
> যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিল্পী সাহিত্যিক স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন কামরুল হাসান, জহির রায়হান, হাসান ইমাম ও অন্যান্য কয়েকজন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অস্থায়ী সরকারের কোন কোন মহলের কাছে জহিরের রাজনৈতিক 'ঢং' উপাদেয় ছিল না। ফলে মাঝে মাঝে স্বাধীনতা যুদ্ধে জহিরের অংশগ্রহণের উদ্যম উৎসাহকে রীতিমতো বাধা প্রদান করা হতো। বলাবাহুল্য

জহিরকে নিরস্ত করার ক্ষমতা তাদের ছিলোনা। সে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিল আত্মিক তাগিদে।...সে জানতো যে দেশ ভালবাসা এবং তাকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা তার জন্মগত এবং আদর্শগত অধিকার। তাই আমরা জহিরকে দেখেছি এক বহুমুখী ভূমিকায়। এ বেলা সে পাক-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছে , ও বেলা দেখতাম সাংস্কৃতিক দলের অনুশীলনে স্ক্রিপ্ট পুনর্বিন্যাস করছে। যখন কিছু কিছু লোককে দেখেছি নিজেদের ফিল্মের প্রিন্ট বিক্রি করে আর্থিক স্বচ্ছল্য বাগাতে সচেষ্ট, ঠিক তখনি দেখেছি জহিরকে তার 'জীবন থেকে নেয়া'র ভারতে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ সরকারকে দান করতে,স্বীয় অর্থ কষ্ট থাকা সত্ত্বেও।... রাত নেই, দিন নেই, ঘুম নেই 'স্টপ জেনোসাইড' তৈরী করছে। ও জানতো বাঙলার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রচারই যথেষ্ট নয়। বিশ্বের সকল পরাধীন শোষিত মানুষের সংগ্রামের সাথে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের একাত্মতা বোঝাতে হবে এই ছবির মাধ্যমে ।' (সুরভী দাস ২০০২ : ৩৫)

এভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেশের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে গেছেন।

কর্মজীবন

১৯৬৬ সালে তাঁর লোকগাথা ভিত্তিক চলচ্চিত্র 'বেহুলা' মুক্তি পায়। এ বছরের জুন মাসে তিনি 'সৃজনী চলচ্চিত্র সংস্থা'র ব্যানারে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নির্মাণের ঘোষণা দেন। পরের মাসে ১৭ জুলাই 'পূর্ব পাকিস্তান প্রযোজক ও পরিচালক সংঘ' গঠিত হয় যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জহির রায়হান। '৬৬ এর নভেম্বরেই এফ.ডি.সিতে শুরু হয় ফিল্ম ইন্সটিটিউটের কাজ। এই উদ্দেশ্যে গঠিত উপদেষ্টা কমিটি ও পাঠ্যসূচি তৈরি কমিটিতে অন্যান্যের সঙ্গে জহির রায়হানও ছিলেন। (চিত্রালী : ২৫ নভেম্বর ১৯৬৬)। ১৯৬৭ সালের ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিন জহির রায়হানের প্রযোজনায় 'যোগ বিয়োগ' নামে একটি নতুন ছবির কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যেই গুজব রটে যে 'বেহুলা' ও 'আনোয়ারা'র নায়িকা সুচন্দাকে তিনি বিয়ে করেছেন। (চিত্রালী : ২১ ও ২৮ এপ্রিল ১৯৬৭) । ১৯৬৭ সালের ১০ নভেম্বর তাঁর প্রয়োজনায় আমজাদ হোসেনের পরিচালনায় 'জুলেখা' ছবি মুক্তি পায়। এ বছর ডিসেম্বরে তাঁরই নেতৃত্বে গঠিত হয় 'সেন ওয়ার্কশপ' গোষ্ঠী যেখানে স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ছবি নির্মাণ করা হতো। ১৯৬৮ সালের ২ জানুয়ারি তাঁর প্রযোজিত 'দুই ভাই' এবং ১০ মার্চ 'সংসার' ছবি দুটি মুক্তি পায়। প্রথম স্ত্রী সুমিতা ২৭ মার্চ ঢাকা এফ.ডি.সি'র আদালতে বিনা অনুমতিতে চিত্রনায়িকা সুচন্দাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করার জন্য জহির রায়হানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ' (চিত্রালী : ২৯ মার্চ ১৯৬৮ ও মাসিক ঝিনুক : এপ্রিল ১৯৬৮) মে মাসেই জসিমউদ্‌দীনের জনপ্রিয় নাটক 'বেদের মেয়ে' অবলম্বনে চলচ্চিত্রের কাজ শুরু করেন। জুলাই মাসে ঢাকা টিভি থেকে জহির রায়হান রচিত নিরীক্ষাধর্মী নাটক 'অনেকগুলো মৃত্যু' প্রচারিত হয়। ১৯৬৮ সালের ৪ অক্টোবর তাঁর প্রযোজনায় নুরুল হক বাচ্চুর পরিচালনায় 'কুঁচবরণ কন্যা' ছবিটি মুক্তি পায়। ১৯৬৯ সালে দেশের উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেও ৪ এপ্রিল মুক্তি পায় তাঁর প্রযোজিত সঙ্গীত বহুল পারিবারিক ছবি 'মনের মত বউ'। ১৩ জুন মুক্তি পায় 'বেদের মেয়ে' ছবিটি এ বছর ৮ আগস্ট তাঁর প্রযোজিত আর একটি ছবি 'শেষ পর্যন্ত' মুক্তি পায়। ১৯৭০ সালের ১১ এপ্রিল মুক্তি পায় বহুল আলোচিত জনপ্রিয় ছবি 'জীবন

থেকে নেওয়া'। এটি একটি রাজনৈতিক ছবি। এ বছর তিনি 'লেট দেয়ার বি লাইট' এর কাজও শুরু করবেন বলে জানান। ১৯৭০ সালের ১ মে তাঁর চিত্রনাট্যে রহিম নেওয়াজের 'যোগ বিয়োগ' মুক্তি পায়। জুন মাসে তিনি 'জ্বলতে সুরুজ কি নিচে' ছবির ইউনিট কে নিয়ে শুটিংয়ের জন্য লাহোর যান। ১৯৭০ সালের ১০ জুলাই 'এক্সপ্রেস' নামে একটি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সাপ্তাহিকী প্রকাশ শুরু করেন। জহির রায়হান হলেন পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আর নির্বাহী সম্পাদক হল আলমগীর কবির। ৭ আগস্ট থেকে এফসিডিতে শুরু হয় জহির রায়হানের নতুন ছবি 'লেট দেয়ার বি লাইট' এর শুটিং। (চিত্রালী : ১৪ আগস্ট ১৯৭০)। ১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানির ফ্রাংকফুট চলচ্চিত্র উৎসব থেকে খবর আসে যে জহির রায়হানের পরিচালিত 'কাঁচের দেয়াল' (১৯৬০) 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' পেয়েছে। (দৈনিক সংবাদ : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)

১৯৭১ সালে এপ্রিলে ভারত আসার পর থেকে তিনি নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেন। এরই ফাঁকে জুন-আগস্টের মধ্যে 'স্টপ জেনোসাইড' নামে একটি প্রামাণ্য চিত্রের কাজ শেষ করেন যা সেপ্টেম্বরে মুক্তি পায়। আর নভেম্বরের মধ্যে তাঁর পরিচালনায় 'এ স্টেট ইজ বার্ন' এবং তাঁর প্রযোজনায় আলমগীর কবীরের পরিচালনায় 'লিবারেশ ফাইটার্স' ও বাবুল চৌধুরীর পরিচালনায় 'ইনোসেন্ট মিলিয়নস' নামে প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়। '৩০ নভেম্বরের পর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রাক্কালে জহির রায়হানের নেতৃত্বে দুটি চলচ্চিত্র ইউনিট গঠিত হয়। একটির নেতৃত্বে থাকেন জহির রায়হান এবং অপরটির নেতৃত্বে থাকেন আলমগীর কবীর। জহির রায়হান ঢাকা-ময়মনসিংহ নিয়ে গঠিত পূর্ব সেক্টরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতার চিহ্ন এবং মিত্র বাহিনীর অভিযান ক্যামেরায় ধরে রাখেন।' (আলমগীর কবীর ১৯৮৪ : ১৯৫)। কলকাতার অবস্থানকালে 'জহির রায়হান 'ধীরে বহে মেঘনা' নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নামকরণ ও কাহিনী কাঠামো দাঁড় করান বলে আলমগীর কবীর সূত্রে জানা যায়। এটি যৌথভাবে জহির রায়হান ও আলমগীর কবীরের পরিচালনা করার কথাও ছিল।' (চিত্রালী : ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)। মাত্র ছত্রিশ বছরে অতি ক্ষুদ্র জীবনকালে জহির রায়হানের কর্মযজ্ঞ দেখলে মনে হয় যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর অবস্থান। তিনি সমগ্র জীবন বিচিত্র কাজের মধ্যেই নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন।

সাহিত্যজীবন

দেশের দ্বন্দ্ব ও প্রতিবাদমুখর সময়, সমাজ ও জীবনের অন্তঃসারকে আত্মস্থ করায় এ সময়কার রচনা তাঁর জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। '১৯৬৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে আউটার স্টেডিয়ামে বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এ উপলক্ষে প্রকাশিত 'তরঙ্গ' নামে একটি বৃহৎ পুস্তকে বিপ্লবোত্তর পঞ্চাশ বছরের সোভিয়েত চলচ্চিত্রের ওপর একটি মনোগ্রাহী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন জহির রায়হান।' (চৌধুরী আতাউর রহমান ১৯৮২ : ৩১) । পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস রচিত হয় 'আরেক ফাল্গুন'। এ উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেশ নিয়ে তাঁর আশাবাদী মানসিকতা ফুটে

উঠেছে। বর্ণিত আছে ,'...আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।' এ বছরই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বরফ গলা নদী' পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। পূর্বে এটি 'উত্তরণ' সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭০ সালে তাঁর তিনটি উপন্যাস প্রকাশ পায়। উপন্যাসগুলি হল, 'আর কত দিন', 'কয়েকটি মৃত্যু', ও 'একুশ ফেব্রুয়ারী'। এ তিনটি উপন্যাসই রাজনীতি নির্ভর। 'তাঁর সমসাময়িক লেখক শিল্পীদের ভেতর তিনি ছিলেন রাজনীতির প্রতি সবচেয়ে বেশি অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাঁকে যাঁরা জানেন তাঁরা সবাই স্বীকার করবেন, তিনি সব সময় খোলাখুলি তাঁর রাজনৈতিক মত ব্যক্ত করতেন।' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ১০)। এ সব উপন্যাসেও তিনি তৎকালীন রাজনীতিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একীভূত করেছেন। তাঁর আদর্শ ও মতামতকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন এসব সাহিত্য মাধ্যমে। এছাড়া ১৯৭১ সালে 'পাকিস্তান থেকে বাঙলাদেশ' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। মোটকথা, তাঁর জীবনের শেষ পর্বের প্রায় সব সাহিত্যকর্মই ছিল রাজনীতি নির্ভর। বিষয়বস্তুর এমন নির্বাচন তাঁকে তাঁর সমকালীন লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

জহির রায়হানের অন্তর্ধান

'স্টপ জেনোসাইড' এর প্রতি মুজিবনগর সরকারের কিছু নেতা এই কারণেই কুপিত ছিলো যে, এ ছবি শুরু হয়েছে লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, আর শেষ হয়েছে আন্তর্জাতিক 'জাগো জাগো সর্বহারা' এর সুর বাজিয়ে। তাছাড়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ তখনও আমেরিকার সাহায্য ও সমর্থন পেতে উন্মুখ ছিলো। অথচ এ ছবিতে সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য উত্থাপন করা হচ্ছে।' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ১২)। এখানে আবার শেখ মুজিবকে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে দেখানো হয়। '৭১ সালের শেষের দিকে জহির রায়হানের কার্যকলাপকে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলো।' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ১৩)

যদিও তিনি মার্কসবাদী চেতনায় দীক্ষিত ছিলেন কিন্তু ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর শহীদুল্লা কায়সারকে ধরে নেওয়ার সংবাদ শুনে জহির রায়হান একেবারেই ভেঙে পড়েন। ১৭ তারিখে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক হেলিকপ্টারে ঢাকা এসে আলবদরের মরণ-কামড়ের খবর বিস্তারিত জানতে পারেন।'... সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, তিনি শ্রেতপত্র প্রকাশ করবেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে দায়ী করেন। তিনি তখন মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর ঘাতক বাহিনী আলবদরদের দ্বারা ধৃত শহীদুল্লা কায়সারকে খোঁজার জন্য পীর ফকিরেরও শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। এমন একজনের খপ্পরে পড়ে তিনি আজমীর পর্যন্ত গিয়েছিলেন।' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ১৩)। অন্যদিকে পান্না কায়সার স্মৃতিচারণ করে বলেন : 'বড়দাকে ধরে নিয়ে গেছে কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাটা ওর সহকারী ওয়াহিদের হাতে ছুড়ে দিয়ে ছুটে এলো বাড়িতে।...আমার হাতটা মেজদার হাতের মুঠোয় নিয়ে বললো– 'ভাবী, আপনি কেন, বড়দা ছাড়া আমিও বাঁচতে পারবো না। আমার শরীরের একটা অংশ

বড়দা।... বড়দাকে ছাড়া আমরা জীবনের কিছুই করতে পারি না। আমি বেঁচে থাকব আর বড়দা নেই– তা হতে পারেনা। বড়দাকে আমি খুঁজে বের করবোই।' (পান্না কায়সার ১৯৯১ : ১৪৬-১৪৭)। এরপর জহির রায়হান একদিকে বড়দাকে খুঁজেছেন অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ১৯৭১ সালের ১৫ জানুয়ারি ভারতে যান আজমীর শরীফে। ২৭ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন। এরপর অভিশপ্ত ৩০ জানুয়ারি এদিন সকালে অজ্ঞাতনামা একব্যক্তি টেলিফোনে জানায় শহীদুল্লাহ কায়সারকে পাকিস্তানিদের দোসর বিহারী অধ্যুষিত মিরপুরের এক বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে। সেখবর শুনে জহির রায়হান বেরিয়ে পড়েন। পান্না কায়সারের বর্ণনায় :

> কথা শেষ করে মেজদা আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখলাম ওর মুখটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।
>
> কে ফোন করেছে?
>
> ভাবী; বড়দার খোঁজ পাওয়া গেছে। মিরপুরে বার নাম্বার সেকশনের একটা বাড়িতে বন্দি হয়ে আছে। আমি এখনই বের হবো। বিকালের মধ্যে বড়দাকে নিয়ে আসব।
>
> (পান্না কায়সার ১৯৯১ : ১৫৬)

কিন্তু এরপর শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হান দু'জনের কেউই ফিরে এলেন না, কালের গর্ভে দুজনেই হারিয়ে গেলেন। জানা যায়, 'ওই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হানের বড়ভাই সাংবাদিক ঔপন্যাসিক শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজে মিরপুর যাওয়ার পর জহির রায়হান ১২ নম্বর সেকশনের পানির ট্যাংকি এলাকায় পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর দোসর বিহারী রাজাকারদের সংঘবদ্ধ সশস্ত্র হামলার শিকার হন। অবাঙালি বিহারীদের ছোঁড়া বুলেটে ঝাঁজরা হয়ে যায় তাঁর বুক। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর তার গুলিবদ্ধ রক্তাক্ত দেহ অজ্ঞাত স্থানে টেনে নিয়ে যায় বিহারীরা। সেই থেকে গুম জহির রায়হান।' (জুলাফিকার আলী মানিক : ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯)।

মিরপুরে তাঁর গুম, নিখোঁজ অথবা নিহতের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে জুলফিকার আলী মানিক, ড.সুমান হায়দার, মেজর জেনারেল (অব.), গোলাম হেলাল মোরশেদ খান ও সৈনিক আমির হোসেনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণের ভিত্তিতে দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় ১৯৯৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর এবং ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০ , ২৩ ও ২৫ ডিসেম্বর সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে।

তবে এটি বিস্ময়কর যে তাঁর ও তাঁর ভাইয়ের অন্তর্ধান সম্পর্কে কোন তদন্ত হয় নি। এ কারণেই পরিবারের বিশ্বাস তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শাহরিয়ার করিব বলেছেন, 'কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভ্রান্তি, নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা, ও বিভক্তিতে তিনি বিক্ষুব্ধ হতেন। কখনো বা হতাশ হয়ে পড়তেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মস্কো-পিকিং বিভক্তির পর তিনি পিকিংপন্থীদের শিবিরে অবস্থান করে পরবর্তীকালে পিকিংপন্থীদের বিভক্তির সময় কোনো বিশেষ দলের পক্ষ নেননি। তাঁর লেখা ও ছবিতে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস পুরোপুরি প্রতিফলিত না হলেও কিছু লেখা ও ছবি থেকে এটা পরিষ্কার

বোঝা যায় জহির রায়হান কোন শিবিরের লোক প্রগতির না প্রতিক্রিয়ার। নি:সন্দেহে বলা যায় প্রগতির শিবিরেই তাঁর অবস্থান এবং এই শিবিরে অবস্থানের কারণেই প্রতিক্রিয়ার নির্মম শিকার হয়েছিলেন তিনি।' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ১৪)। যা-ই হোক তাঁর মতো সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব বাংলা সাহিত্যে অপ্রতুল। অতি অল্পকাল তাঁর লাবণ্যে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হয়েছে এদেশের সাহিত্যাঙ্গন। তাঁর চলে যাওয়ায় বাংলা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্র জগতে অপূরণীয় ক্ষতের সৃষ্টি হল।

প্রায় দুইশত বছরের শাসনামলে ব্রিটিশ শাসনচক্র তাদের বৈষম্যমূলক আচরণের সুবিধার্থে যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বীজ রোপন করেছিলো ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগই সেই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষ। মূলত 'সেই মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা' ছিলো খণ্ডিত, অশ্রুসিক্ত ও বৈষম্যমূলক যার মধ্যে সবচেয়ে বিপর্যস্ত অধ্যায় হলো পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্ন্তভুক্তি। এই 'স্বাধীনতা ছিল একই সঙ্গে আমাদের triumph ও tragedy।' (অমলেশ ত্রিপাঠী ১৯৯১ : ১৯)। ফলত 'অদ্ভূত ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়াও এর পূর্বাংশে এমন একটি সমপ্রকৃতির অখণ্ড দেশ, যার দু'কোটি অধিবাসী একই ভাষাভাষী, অথচ সাড়ে চার কোটি লোক অধ্যুষিত এর পশ্চিমাংশ হচ্ছে বহুজাতিক (Heterogeneous)।' (কামরুদ্দীন আহ্মদ ১৩৮৩ : ৯৪)। বিভাগকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শ্রেণি বিকাশ কোন দিক থেকেই মিল ছিল না। 'দেশ বিভাগকালে এ ভূখণ্ড ছিলো শিল্পায়নে ক্রমাগ্রসর ও বৃদ্ধিশীল কৃষিপ্রধান অঞ্চল। অপর পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভিত্তি মূলত প্রতিষ্ঠিত ছিলো পশুচারণ ও পশুপালনের উপর। উৎপাদিত পণ্যের মানদণ্ডেও বাংলাদেশ ছিলো পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধ। বহুকালব্যাপী পৃথিবীর একমাত্র পাট রপ্তানিকারক এই অঞ্চলের অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য ছিলো ধান এবং চা। অর্থনৈতিক কাঠামোর এবং উৎপাদিত পণ্যের বৈষম্য পাকিস্তানের দুই অংশের চারিত্রকে গোড়া থেকেই করে রেখেছিল স্বতন্ত্র।' (কামরুদ্দীন আহ্মদ ১৩৮৩ : ৯৫)

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে তৈরি হয় এক দল নব্য শিক্ষিত মহল। তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ঢাকা কেন্দ্রিক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। দেশ বিভাগের সময় তারা অনেকটা পরিপক্ক হলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘবদ্ধতায় তাদের মধ্যে সমন্বয় ছিল না। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এদেশের মৃত্তিকা সংলগ্ন জীবন, সমাজ বিন্যাস এবং আর্থ উৎপাদন কাঠামোতে পাকিস্তানি শাসকবর্গ ধর্মকে স্থাপন করলো সব কিছুর কেন্দ্র মূলে। ধর্মকে সাধারণ লোককে শোষণ করার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হল, সমস্ত দেশ গণশক্তির জন্য কারাগারে পরিণত হল।' (কামরুদ্দীন আহ্মদ ১৩৮৩ : ৯৯-১০০)। বাংলাদেশে নব্য শিক্ষিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের পাশাপাশি সামন্ত মূল্যবোধ আশ্রয়ী যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির লালন অব্যাহত ছিলো' (সুকুমার সেন ১৯৭৬ : ১১৭)। তারা পাকিস্তানকে স্বাগত জানালো । এসময় আরো এক শ্রেণি মধ্যবিত্তের জন্ম হয়। এদের মধ্যে 'একদিকে অবস্থান নেয় মুক্ত চেতনার অনুসারী, মানবতাবাদী, গণতন্ত্র ও মার্কসীয় চেতনাপৃষ্ঠ নব্য শিক্ষিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি, অন্যদিকে সামন্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী পাকিস্তানি প্রশাসন তথা বেনিয়া পুঁজিবাদী শক্তি আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি।'(সুকুমার বিশ্বাস ১৯৮৮ : ৬৮-৬৯)। এর ফলেই বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম কিছুটা সময়ের জন্য স্তনমিত হয়ে যায়। পশ্চিমা পাকিস্তানিদের আচরণের ফলে প্রথমে থেকেই মোহভঙ্গ হতে শুরু করে এ দেশবাসীর। কালক্রমে বাংলাদেশিদের জাতি শোষণ, শ্রেণি শোষণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা নিরোসনকল্পে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে 'বিশ শতকের ক্রমবর্ধমান বাঙালি বেনিয়া পুঁজিবাদী এবং স্ফীতকায় বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও

মার্কসবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিবাদ করলো ১৯৪৮-এ।' (সৈয়দ আকরম হোসেন ১৯৮৫: ১৬)। এক্ষেত্রে 'বাঙলায় সাম্যবাদী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ।' (সুমিতা চক্রবর্তী ১৯৯২ : ২৯৯)। তাঁর প্রতিবাদী চেতনা সমগ্র বাঙালির মধ্যে সংক্রমিত হয় এবং কাল পরম্পরায় স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়।

'বাংলাদেশের বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ষড়যন্ত্রমূলক চারিত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বৃহত্তর জনজীবনে ধর্মাদর্শনির্ভর আজাদি'র মোহ কিছুকাল স্থাপিত লাভ করে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানি প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ঐ মোহ দূরীভূত করতে অনেকটা সক্ষম হয়। নতুন রাষ্ট্রের শাসকবর্গ প্রথমে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানেও একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদ্যমান, যারা সমাজের সম্ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে নিজস্ব সত্তা বিলীন না করে বাংলা ভাষার রক্ষণ ও আধুনিকরণের জন্য প্রস্তুত।' (কামরুদ্দীন আহ্মদ ১৩৮৩ : ৯৬) যখনি পাকিস্তান সরকার তাদের কোণঠাসা করতে চায় তখনি তারা প্রতিবাদ করে, অধিকার আন্দোলনে একত্রিত হয়। মূলত 'সংগ্রাম, রক্তপাত ও উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-১৯৫১ কালমধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক অন্তঃশীলা পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বন প্রত্যাশা এ পর্যায়ের মধ্যবিত্ত মানসের অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করে। গণতন্ত্র, মানববাদ ও প্রগতিশীল চেতনার ক্রম প্রসার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনে গতি সঞ্চারে অনেকাংশে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি প্রশাসনযন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট সামন্ত মূল্যবোধ আক্রান্ত সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের সর্বাধিক প্রয়াস সত্ত্বেও নব জাগ্রত সচেতন মধ্যবিত্তের গতিশীল কর্মকাণ্ড বৃহত্তর সমাজ জীবনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ৫৪)

একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চরিত্রই সেই দেশের শিল্প সাহিত্যকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে তোলে। দেশ বিভাগের পর থেকে এ দেশে জন্ম নেওয়া মধ্যবিত্তের প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, প্রত্যাশা, সংগ্রাম, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ প্রভৃতি অনুভূতিই এদেশীয় সাহিত্যে বিশেষ করে কথাসাহিত্যের মূল উপজীব্য। রাষ্ট্র ও সমাজ বিন্যাসের নতুন রূপ এবং অস্তিত্বের নবতর জিজ্ঞাসা এই সাহিত্য শাখাকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র। জীবন প্রবাহের স্বরূপ আত্মস্থ করে তাকে অনিবার্য আঙ্গিকে রূপদান করার মহানকৃর্তী সাধনে এই সময় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে যথার্থ আধুনিক কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)। মানব অস্তিত্বের স্বরূপ অন্বেষায় তিনি সমাজ সত্যের মর্মমূল স্পর্শ করতে রচনা করে ছিলেন 'লালসালু' (১৯৪৮)। মূলত ব্যক্তি অস্তিত্বের উন্মীলন ও পরাভব অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় জীবনের নিগূঢ় সত্য উন্মোচন করেছেন। তাছাড়া 'চাঁদে অমাবস্যা' (১৯৬৪) উপন্যাসে আইউবি শাসনের ধর্মভীতি ও সমরাস্ত্র শাসিত সমাজ জীবনের অন্তর্জগতকে রূপায়িত করলেন।

এসময় দেশের শিল্পীবৃন্দ ছিলেন উদ্বেগাকুল, সন্দিহান তাই সমাজ জীবনের অন্তর বাইরে সকল বৈপরীত্যময় সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মে। এজন্য কখনো তাঁরা গ্রামীণ জীবনকে চিত্রিত করেছেন, কখনো আবার আশ্রয়

নিয়েছেন শহুরে জীবনের ইটপাথরের কারাগার। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'সত্যেন সেনে'র (১৯০৭-১৯৮১)' 'পদচিহ্ন' (১৩৭৫)। গ্রামীণ বাস্তবতা অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত হলেও এখানে ধরা পড়েছে সমাজ জীবনের বহির্বাস্তবতার সঙ্গে অন্তর্জগতের টানা পড়েন। এ সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'শহীদুল্লাহ কায়সারে'র (১৯৫২-১৯৭১) 'সারেং বৌ' (১৯৬২) গ্রামীণ লোকজীবনের গীতল বিন্যাসে রূপায়িত হয়েছে সমুদ্র উপকূলবর্তী জনপদের বাস্তব ও ভাব জীবনের অনুপুঙ্খ চেতনা রাশি। 'আলাউদ্দিন আল আজাদ'র (১৯৩২-২০০৯) 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) রচিত হয়েছ নদী তীরবর্তী শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব রূপায়ণের দলিল হিসেবে। মূলত সমাজ কাঠামোর ভেতর বাইরের রূপান্তর প্রক্রিয়া উন্মোচনই লেখকবৃন্দের মূল উদ্দেশ্য।

গ্রামীণ জীবনের পাশাপাশি এ সময়ের উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসা, মানব মনের নৈরাশ্য, অন্তর্যন্ত্রণা, মনোবিকলন আর রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত। এসব চেতনাস্পর্শী উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে– শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬৩), আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮১) 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩) সত্যেন সেনে'র (১৯০৭-১৯৮১) 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬৭) ও 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯), রাজিয়া খানে'র (১৯৩৬-২০১১) 'বটতলার উপন্যাস' (১৯৫৯), সৈয়দ শামসুল হকে'র (১৯৩৫-১৯১৬) 'দেয়ালের দেশ' (১৯৫৯), ও 'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯), আলাউদ্দিন আল আজাদে'র (১৯৩২-২০০৯) 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬০), আহসান হাবীবে'র (১৯১৭-১৯৮৬) 'আরণ্য নীলিমা' (১৯৬১), শহীদুল্লা কায়সারে'র (১৯২৭-১৯৭১) 'সংশপ্তক' (১৯৬৫), সরদার জয়েন উদ্দীনে'র (১৯২৩-১৯৮৬) 'অনেক সূর্যের আশা' (১৯৬৯), জহিরুল ইসলামে'র (১৯৫১-২০১৫) 'অগ্নিসাক্ষী' (১৯৬৯) প্রভৃতি।

জীবন ও জাগতিক বস্তুঅভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞানের প্রাচুর্যই কোন শিল্পী মানসের মৌলিক ক্ষেত্রভূমি। শিল্পীর জীবনদৃষ্টি ক্রমাগত আবিষ্ট হতে থাকে পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিত, পরিপার্শ্ব, সমাজ-রাজনীতি ও মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিশিষ্ট জ্ঞানের মধ্যে। জহির রায়হানও সমাজ কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আপন ভাবজগৎ ও বাস্তবিক রূঢ় জগৎকে একীভূত করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। কল্পনা বৈচিত্র, আঙ্গিক বৈচিত্র ও পোড়খাওয়া মানুষের জীবন প্রতিরূপের নানা অনুষঙ্গ তাঁর লেখনী শিল্পকে দিয়েছে ব্যতিক্রমী মাত্রা আর অল্প কথায় অধিক বলার কৌশল তাঁর কথাসাহিত্যকে অনন্য মহিমায় অধিষ্ঠীত করেছে। সময়টি ছিল দূর্যোগপূর্ণ সংগ্রামী চেতনার কাল। দেশ বিভাগের পর এদেশের সমাজ মানস অন্তঃশীলা দুঃখ দহনে হয়ে পড়েছিল গতিচ্যুত, দিকভ্রান্ত। এ সময় প্রগতি ও গণতন্ত্র বিমুখ রাষ্ট্রযন্ত্র বাঙালি মানসভূমিকে বিনষ্ট করতে চেয়েছিল। ফলে সত্তাসন্ধান, আত্মসন্ধান ও জাতি সন্ধানের প্রশ্নটি নবরূপে উত্থাপিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। জনজীবনের সাথে সাথে সাহিত্যিক অঙ্গনেও এ আন্দোলনটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। জীবনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে ফিরে পাবার ও চূর্ণিত সত্তার পূর্ণ অবয়বটিকে বোধ-কল্পনার পরিধি সীমায় আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষায় এবং ব্যক্তি চেতনার খণ্ডদ্বীপে দাঁড়িয়ে সমষ্টি ও সমগ্রতার মূল ভূ–ভাগের দিকে বাহু বিস্তারের উজ্জ্বল করুণ উৎকণ্ঠায় স্পন্দিত' (আজীজুল হক ১৩৮৯ : ৬০) হয়ে গড়ে ওঠে বাঙালির শিল্প চৈতন্য।

এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রই বাংলাদেশের সাহিত্যের বিশেষ করে কথাসাহিত্য ধারায় অভূতপূর্ব ও যুগান্তায়কারী মাত্রা সংযোজন করেছে। পঞ্চাশের দশকের ঘটনাচক্রে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণে অনেক সাহিত্যিক প্রাগ্রসর হয়েছেন। জহির রায়হান এই সময়, সমাজ ও প্রগতিশীল মনন বৈশিষ্ট্যের অন্যতম পুরোধা পুরুষ। তিনি 'বিরল প্রতিভার অধিকারী। শুধু বাংলাদেশে এবং সমকালের প্রেক্ষিতেই নয়, বৃহত্তর স্থান ও ব্যাপকতর কালের প্রেক্ষাপটে ও উক্তিটি সত্য।' (কবীর চৌধুরী ২০০১: ৬০)। এক দ্বন্দ্ব ক্ষুব্ধ, জটিল ও রক্তাক্ত সময়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে জহির রায়হানের সাহিত্য জীবন। এই সময়ের ইতিহাস 'নিরন্তর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এগুলো থেকে ক্রমমুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস।' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৮৫: ২৯৭)। জহির রায়হান অন্ধকারাচ্ছন্ন সীমারেখা দিয়ে পথ চলতেন ও সময় পরম্পরার বিচিত্র বিপ্রতীপ অভিজ্ঞতার মধ্যেও সদর্থক করে তুলতেন। তাঁর কথাসাহিত্য জুড়ে মধ্যবিত্তের বলিষ্ঠ পদচারণ লক্ষণীয়। নিজে দ্যোদুল্যমান হৃদয়ের ন্যায় মধ্যবিত্ত মানস রূপায়ণ করেছেন আপন মহিমার দ্যুতি ছড়িয়ে। আর রোম্যান্টিকতার অনিঃশেষ ও সর্বতোচারী ভাবনা প্রকাশ থেকে বোঝা যায় তিনি কতোটা জীবনাপলব্ধি ও শিল্পভাবনায় রোমান্টিক ভাবদর্শের দ্রষ্টা।

জহির রায়হান বাংলা ও বাঙালির ঐতিহাসিক ঘটনারাজির প্রত্যক্ষদর্শী। একারণেই তাঁর সাহিত্যে ইতিহাসের ছায়াপাত এসেছে। শুধু তাই নয় তাঁর কথাসাহিত্যে ফিরে ফিরে এসেছে নর-নারীর রোমান্টিক প্রেম-বিরহ, মধ্যবিত্তের সমস্যা সঙ্কুল জীবনচিত্র, ধর্মচারীদের মিথ্যাচার, শোষক শ্রেণির কুচক্র, শোষণ এবং আবহমান বাংলার শ্বাশ্বত রূপ মহিমা। তিনি ছিলেন চলচ্চিত্রকার; তাই তাঁর পর্যবেক্ষণ চেতনাটি ছিল সূক্ষ্ম শাণিত। চলচ্চিত্রের রূপ, রীতি ও পরিভাষাকেও একীভূত করেছেন কথাসাহিত্যের নির্মল অঙ্গে, যা তাঁকে সমকালীন সাহিত্যিদের থেকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র করেছে। তাছাড়া শিল্পোত্তরণ সাধানায় মত্ত ছিলেন তিনি যার মন্ত্রমূল ছিল তাঁর পরিবার ও ভাষা আন্দোলনের দীক্ষা। একজন জীবন ঘনিষ্ঠ শিল্পীর কাছে জাতীয় চেতনার প্রতিক্রিয়া তাঁর সৃষ্টির প্রত্যয় ও প্রকরণে কতটা বিস্তার লাভ করে সে সম্পর্কে W.H Auden বলেছেন, 'In a work of art, the single event must be seen as an element in a University significant pattern: The area of the pattern actually illuminated by the artist's vision in always, of course, more on less limited, but one is aware of its extending beyond what we see far into time and space.' (W.H. Auden, 1979: 421-422)

এমনই ভাবেই জহির রায়হানের শিল্পসত্তায় সমাজ ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রয়েছে। শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ মানুষ। ব্যক্তি জীবনের মতো তাঁর সাহিত্য পরতে আবেগের প্রবল উচ্ছলতা লক্ষ করা যায়। সত্তাসন্ধান ও আত্মঅনুসন্ধানে বাহ্যিক জগতের মতো তাঁর জীবনার্থের পরিণামে ছিল অস্থিরতা, অমীমাংসা। এই অন্তর যন্ত্রণাই ছিল তাঁর প্রগতিশীল বিভাগোত্তরকালীন সময় ও সমাজের বাস্তবিক মানদণ্ড প্রকাশের প্রেক্ষণবিন্দু। এ কারণেই সমাজ ও রাষ্ট্র বিন্যাসের পরিবর্তিত রূপ এবং জাতিসত্তা উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সাহিত্যাদর্শই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে তাঁর সেই মতার্দশ ও শিল্পচেতনা প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছি।

টীকা

১. পূর্ব পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন অর্থাৎ : পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে একটি মীমাংসাকারী ভূমিকা পালন করেছে, তা নিঃসন্দেহ। আর এ ভূমিকার বীজ পাকিস্তান সৃষ্টির পরে উপ্ত হয়নি, হয়েছিল পাকিস্তানের পূর্বে ১৯৪০-৪২' ৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদেরই একাংশের মধ্যে। এ বীজের বৃদ্ধি ঘটেছিল ৪৩ এর যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে জনতার পাশে যেয়ে তাঁদের দাঁড়ানোয়, রক্তক্ষয়ী আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিরুদ্ধে তাদের শান্তির মোর্চা সংগঠনে এবং নেতৃত্ব দানে, কোলকাতার রশীদ আলী দিবসের সংগ্রামী আওয়াজকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তারিত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের জঙ্গি ভূমিকা পালনে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তর্ক, বিতর্ক, বক্তৃতা- অর্থাৎ তার সাহিত্য সংস্কৃতির পরিবেশে তাদের মানবকল্যাণ, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিকতার বোধ সৃষ্টির মধ্যে। এই মুসলিম তরুণদের আদর্শগত ভাবনাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পূর্ববাংলার মানুষের মোহমুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগামীর দায়িত্ব পালন করে। আর তারই ফলে ১৯৭১।' (সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ব বঙ্গীয় সমাজ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ , এপ্রিল, ১৯৯৩ : ১৩৩)

২. ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই ঢাকায় এপ্রিল থেকে আরম্ভ করে আগস্ট পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলত। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো কেবল মাত্র হিন্দু প্রধান শহর গুলোতে বিদ্যমান, কিন্তু মুসলমান প্রধান গ্রামাঞ্চল শান্তিপূর্ণ ছিল। শহরের ঘটনাবলীতে গ্রামের লোকের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে লাগল। ফলে ১৯৪২ সালের শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।' (কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকা, ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৮২ : ৫৫-৫৬)

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপন্যাস : জীবনবোধ ও শিল্পরীতি

উপন্যাস : জীবনবোধ ও শিল্পরীতি

বিচিত্র জীবনসংঘাতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মতোই জহির রায়হানের সাহিত্যশিল্প ছিল বর্ণাঢ্য আর বৈচিত্র্যে ভরপুর। দূর অতীত কিংবা দূর ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন তৈরি না করে তিক্ত এবং বর্ণহীন বর্তমানকে বিধৃত করেছেন শৈল্পিক ভাষায়। তাঁর রচিত গল্প বা উপন্যাসে শিল্পকে ছাপিয়ে জীবনই হয়ে উঠেছে প্রধান উপজীব্য। প্রতিটি সৃষ্টিকর্ম যেন জীবন থেকে নেয়া। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন, যদিও তাঁর সাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাস প্রকাশের সময়কাল মাত্র দশ বছর। প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে আর শেষ উপন্যাস ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। মোট আটটি উপন্যাস লিখেছেন যাদের পটভূমি কোনাটির গ্রাম আবার কোনাটির শহর । দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সমাজের নানা শ্রেণি পেশাজীবী মানুষ, তাদের জীবনাচার, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেমপ্রকৃতি প্রভৃতির আবেগী ও বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাই তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি । নিম্নে উপন্যাসের তালিকা দেওয়া হল :

উপন্যাস	প্রেক্ষাপট
ক. শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৫০)	**প্রেমচেতনা**
খ. তৃষ্ণা (১৯৫৬)	**আর্থ-সামাজিক**
গ. হাজার বছর ধরে (১৯৬৪)	**গ্রামীণ জীবনযাত্রা**
ঘ. বরফ গলা নদী (১৯৬৪)	**মধবিত্ত জীবনভাবনা**
ঙ. আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯)	**ভাষা আন্দোলন**
চ. একুশে ফেব্রুয়ারী (১৯৭০)	**ভাষা আন্দোলন**
ছ. আর কত দিন (১৯৭০)	**দেশীয় ও বৈশ্বিক রাজনীতি**
জ. কয়েকটি মৃত্যু (১৯৭০)	**আর্থ-সামাজিক ও মৃত্যুচিন্তা**

জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও মতাদর্শ শিল্পিত রূপে এসব উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। এখন উপন্যাসগুলির বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

শেষ বিকেলের মেয়ে

জহির রায়হানের প্রথম উপন্যাস 'শেষ বিকেলের মেয়ে' একটি পঞ্চভুজ প্রেমকাহিনীর সার্থক শিল্পরূপ। তবে প্রণয় সম্পর্কের অন্তরালে সমাজে বিন্যস্ত মানবজীবনের বিচিত্র বাঁক ও অনুভূতি উপন্যাসের গাঠনিক মানদণ্ড দারুণভাবে একীভূত হয়েছে। 'ব্রিটিশ বাণিজ্যশক্তি ও শিল্পশক্তির অভিঘাতে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা কেন্দ্রীক যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে, বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যবিত্তের ইতিহাস তা থেকে স্বতন্ত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত কলকাতা শহর এবং মধ্যযুগের মুঘল শাসকবর্গ সৃষ্ট ঢাকা নগরীর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে গোড়া থেকেই স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশ লাভ করেছে।' (Jadunath Sarkar, 1945 : 270 ও Abdul Karim, 1964 : 1-2) এছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ পলাশির বিপর্যয় (১৭৫৭), চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩), সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭), কংগ্রেস (১৮৮৫) ও মুসলিম লীগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিভেদের রাজনীতি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব বাংলার জনজীবনে অপরিসীম। সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যাঙ্গনের প্রতি শাখার মতো উপন্যাসেও এর প্রভাব অনস্বিকার্য। এ সময় সমাজ জীবনের জটিল ও দ্বান্দ্বিক চেতনা প্রবাহই প্রাক বাংলাদেশ পর্বের উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। 'শোষণ-নিপীড়ন, প্রতিবাদ, রক্তক্ষরণ ও দ্রোহ এ পর্যায়ের সমাজ-চৈতন্যকে যেমন করেছে অস্থির ও দ্বন্দ্বরক্তিম তেমনি সমাজ বিকাশ-প্রক্রিয়ার বহুভুজ জটিলতা শিল্পীর আত্মপ্রকাশকেও করেছে তার অনুগামী। ব্যক্তি ও সমষ্টি অস্তিত্বের বহুমুখী সংকটে বাংলাদেশের শিল্পীচিত্ত হয়ে উঠেছে উদ্বেগাকুল, জাতিসত্তার প্রশ্নে সতর্ক ও সন্ধানী এবং অভীপ্সার বিচিত্র রূপকল্প সৃজনে ঐকান্তিক।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ১১৫)। মূলত সামাজিক জীবন পটচিত্রের অন্তর-বাহিরের বৈপরীত্যময় সত্যের সমগ্রতা সন্ধানে সমাজ কাঠামোর দ্বন্দ্বময় ক্রমবিকাশ, উপনিবেশ শৃঙ্খলিত সমাজের জীবনকামী মানুষের আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা সন্ধানের জটিল রূপ সৃষ্টিই তখনকার রচিত উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য। আর এসব উপন্যাসের মধ্যে জহির রায়হানের 'শেষ বিকেলের মেয়ে' অন্যতম। আপাতদৃষ্টিতে রোমান্টিক প্রেমকাহিনী হলেও ঔপন্যাসিক এখানে বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্তের দ্বান্দ্বিক জটিল ও বিবর্ণ মানস বৈশিষ্ট্য সূক্ষ্ম ও দক্ষভাবে চিত্রিত করেছেন। 'কলোনি শাসিত সমাজের সময়দাস মধ্যবিত্তের স্বপ্নলালিত জীবন এ উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯: ১৬০)

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কাসেদ সীমিত আয়ের কেরানি বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। জীবনের মোড়ে মোড়ে বাধাপ্রাপ্ত নিম্ন মধ্যবিত্তের স্বপ্নময় জীবনকল্পনা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্টে। কাসেদের মধ্যে সংবেদনশীলতার অতিরেক সৃষ্টির জন্য স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে কবিত্বশক্তি আরোপিত করা হয়েছে। জীবনের দ্বন্দ্বমুখর নানা ঘটনাক্রমের মাধ্যমে উপন্যাসটির চরিত্র ও বর্ণনাশৈলী কতটা বাস্তবিক, সময়সিদ্ধ ও জীবনধর্মী উপন্যাসের শুরুতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জহির রায়হান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন পরিবার থেকে, সময় থেকে, আপন সমাজ থেকে। তাঁর পরিবারটি ছিল প্রগতিশীল, রাজনীতি সচেতন, উদার, মানবিক স্নিগ্ধতায় ভরপুর। তাঁর অগ্রজ বামপন্থী রাজনীতিক, কথাশিল্পী ও সাংবাদিক। বড়বোনও ছিলেন শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী। জীবনে তাঁদের প্রভাব অনেক। অন্যদিকে ষাটের দশকে পূর্ববাংলায় ঘটে যাওয়া ভাষা আন্দোলন তাঁর সত্তাকে আমূলে নাড়া দিয়েছে। এ আন্দোলন একদিকে তাঁকে সামাজিক যুগপৎ রাজনৈতিক মতার্দশ প্রভাবিত করেছে অন্যদিকে করেছে দায়িত্বশীল, দায়বদ্ধ। এছাড়া শাসক আইয়ুব খানের সময়ের সাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্রহীনতা, শোষণ-নির্যাতন-অত্যাচার-জুলুম তাঁকে সোচ্চার কণ্ঠ তোলার সাহস জুগিয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রতিটি উপন্যাসে প্রতীয়মান, যার সূচনা ঘটে প্রথম উপন্যাস 'শেষ বিকেলের মেয়ে' এর মাধ্যমে। এ উপন্যাসে যেমন এসেছে শ্রেণিচেতনা, সমাজ বৈষম্যের চিত্র, তেমনি অঙ্কিত হয়েছে দুর্বৃত্তের মুখাকৃতি, সুবিধাবাদীদের নগ্নমূর্তি এবং শোষিত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত, দরিদ্র, নিঃস্ব, অসহায় মানুষের ছবি, চিত্রিত হয়েছে লড়াকু, সংগ্রামী এবং মধ্যবিত্ত ভাবুক সাধারণ মানুষের প্রতিচিত্র। অন্যদিকে বলেছেন সদ্যজন্ম নেওয়া শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের কথা, তাদের আবেগ, জীবনের শাশ্বত বহমান বৈশিষ্ট্য, জাগতিক ভাবনা এবং শ্রেণিবাস্তবতার স্বরূপ। মূলত, 'খণ্ডিতভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সামগ্রিক মানবিক দৃষ্টিতে জহির রায়হান মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তিনি মানুষকে সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে তার ভেতরকে দেখেছেন, বহিরাঙ্গিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার নিরিখেও বিচার করেছেন।' (মাহমুদুল বাসার ২০০১ : ৩৩-৩৪)

'শেষ বিকেলের মেয়ে' উপন্যাসটি কল্পনায় ভরপুর, স্বপ্ন-আবেশে সাজানো। স্বপ্নের পাশাপাশি প্রকৃতির বর্ণনা এনেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজ অবক্ষয়ের চিত্র কিংবা বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্বমুখর ছবি। তিনি দেখিয়েছেন সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনের কাঙ্ক্ষিত, প্রলুব্ধ স্বপ্ন কেমন করে ফিকে হয়ে যায়। কেমন করে বিত্তবানেরা তাদেরকে ক্রীড়নক করে রাখে। স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যর্থ হলে কেমন করে দূরে ফেলে দেয়। কাসেদের সঙ্গে জাহনারার সামান্য খুনসুটিতেই দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এক নিমেষে ভুলে কাসেদকে দূরে ঠেলে দেয় এভাবে :

> শরীর খারাপ বলে নিচে নেমে এসে একবার কাসেদের সঙ্গে দেখাও করতে পারলো না জাহানারা? এর আগে জ্বর নিয়েও ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছে সে, কাসেদ নিষেধ করলেও আমলে দেয়নি।
>
> আর আজ?
>
> কথাটা সহসা বিশ্বাস হতে চাইলো না ওর।
>
> চাকরটা মৃদু হেসে চলে গেলো ভিতরে।
>
> হাসলো না, যেন বিদ্রুপ করে গেলো ওকে।
>
> আবার একা।
>
> ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করলো কাসেদ। ভালো লাগছে না, বারবার করে মনে হলো, জাহানারা আজ ইচ্ছে করে অপমান করলো তাকে। সে কোন অপরাধ করে নি তবু তাকে শাস্তি দিলো জাহানারা। কাসেদের মনে হলো পুরো দেহটা জ্বলছে ওর।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৯৬-৯৭)

এ উপন্যাসের পটচিত্র অঙ্কিত হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও অবসান ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নিদর্শন মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব। পূর্ববাংলায়ও তখন এ সমাজের আনাগোনা শুরু হয়েছে। এ উপন্যাসেও মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষা সচেতনতা লক্ষ করা যায় যেমন আছে আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'মুক্তি' (১৯৪৮) উপন্যাসে। সেখানকার নায়ক আশরাফ বিয়ের প্রথম রাতেই কনেকে প্রশ্ন করেছিল সে লেখা পড়া জানে কিনা। তেমনি এ উপন্যাসে কাসেদের মা খালাতো বোন নাহারের জন্য ছেলে দেখতে বললে খালু বৌ এর লেখাপড়া প্রসঙ্গে বলেছেন :

> ...আজকাল ছেলে পাওয়া বড় ঝকমারি বড়বু। ম্যাট্রিক পাশ করা ছেলে, সেও আবার ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে চায় বুঝলেন না?
>
> ...সে জামানা পুরোনো হয়ে গেছে বড়বু। এখন লোকে লেখাপড়া না জানা বউ-এর কথা চিন্তাও করতে পারে না।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯)

আবহমান কাল ধরে প্রচলিত যে, মেয়েদের অবস্থান সমাজের নীচের তলায়। তাইতো সীতার মতো বারবার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সমাজ তাদের গুণ সম্পর্কে সন্দিহান। বিংশ শতাব্দীতে যখন চারিদিকে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে তখনও নারী ঘরের কোণে আবদ্ধ, মেকি পোশাকে হয়তো কোথাও কোথাও দৃশ্যমান তবু আন্তর স্বাধীনতার ছায়া সে মাড়ায়নি। উপন্যাস উল্লেখিত সময়েও নারীর বিবাহ নিয়ে নানা জটিলতা দেখা যায়। নানা প্রতিবন্ধকতা বার বার তার অসহায়ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে গৃহকর্মে সুনিপুণা মেয়ে নাহার তার যোগ্য স্বামী পায়নি, পায়নি তার যোগ্য সম্মানটুকুও। মেয়েদের অসহায়ত্বের বর্ণনা কাসেদের খালু ও মায়ের কথোপকথনে বোঝা যায় :

> খালু বললেন, আজকাল মেয়ে বিয়ে দেবার মত ঝকমারী আর নেই বড়বু। যাদের টাকা আছে তারা টাকা পয়সা নিয়ে ভালোভালো ছেলে বেছে নেয়।
>
> ...মা বললেন, আগের দিনে লোকে বংশ দেখতো। এখন সি. এস. পি ছাড়া দেখে না।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৭)

এখানে শুধুমাত্র মেয়েদের অবস্থানই নয় সমাজে সহায়সম্বলহীন মানুষের জীবন মূর্তিও প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে এ উপন্যাসে নারীদের মতামতের গুরুত্ব নেই বললেই চলে এমনকি তারা নিজেরাও সচেতন নয়। তাইতো মা কাসেদের কাছে নাহারের বিয়ের মত চাইলেন। কিন্তু কাসেদ তার বোনের মতামত জানতে চাইলে মা বলেন :

> ওকে আবার জিজ্ঞেস করবো কি? মা চোখ তুলে তাকালেন ওর দিকে।
>
> আমরা কি ওর খারাপ চাই? ছেলেটা শুনছি দেখতে শুনতে ভালো।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৭৭)

অন্যদিকে কাসেদ নাহারের মতামত জানতে চাইলে নাহার বিরক্ত ও বিতৃষ্ণা কণ্ঠে জানিয়েছে, 'আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করবেন, আমার কোন মতামত নেই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৭৮)

মধ্যবিত্ত সমাজের যৌতুকের মতো ঘৃণ্য প্রথার প্রচলনও ছিল, বাংলাদেশের সমাজে তো বটেই। এ উপন্যাসে সমাজের সে দিকটি ফুটে উঠেছে মকবুল সাহেবের পারিবারিক বর্ণনায় : 'একবার এই অফিসের একটি ছেলেকে নাকি জামাতা বানাবার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন তিনি। ...কিন্তু বিয়ে হলো না। ছেলেটি রাজী হলো না বিয়ে করতে। কেন? কেউ জানে না। শুধু জানে, ছেলেটি নাকি মকবুল সাহেবের কাছ থেকে কিছু নগদ কড়ি দাবি করেছিলো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯)

একটি সমাজে ভাল-মন্দ উভয়ের সমাগম থাকে। এ উপন্যাসে যেমন সহজ সরল মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের বিবরণ, তাদের আচারণ প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি কিছু কঠিন-জটিল-কুটিল মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়, যারা বিচরণ করে উপরি খাওয়ার লোভে, নিজ স্বার্থ চরিতার্থে অন্যায় করতেও দু'বার ভাবে না। এমন শ্রেণির মধ্যে রয়েছে শিউলি ও জাহানারা। শিউলির সঙ্গে কাসেদের দেখা হয় জাহানারাদের বাড়ি। শিউলি বড়লোক, চঞ্চল ও সুবিধাবাদী। তার প্রেমিক থাকে ইতালিতে। তাই সময় কাটানোর ও বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য সরল প্রাণ কাসেদকে ব্যবহার করে। অন্যদিকে সে যখন জানতে পারে জাহানারার সঙ্গে কাসেদের সুসম্পর্ক রয়েছে প্রায় প্রেমের কাছাকাছি তখন ঈর্ষান্বিত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উভয়ের সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি করে। শিউলি বলে, 'এখনো বুঝলেন না? ঠোঁট টিপে আবার হাসলো সে এই সহজ কথা বুঝতে দেরি হচ্ছে আপনার? চারপাশে এক পলক দেখে নিয়ে আরো কাছে সরে এলো শিউলি। মাস্টার আর ছাত্রীতে মন দেয়া নেয়ার পালা চলছে, বুঝলেন?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৮০)

অন্যদিকে কাসেদ যখন শিউলির কাছে নিজেকে সমার্পণ করতে চাইল তখন তার মায়াজালে বিদ্ধ কাসেদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে ফেলল। লেখকের বর্ণনায় : 'কাসেদের বুঝতে আর বিলম্ব হলো না সন্ধেবেলার এই শিউলির সঙ্গে সকালের সেই শিউলির কোন মিল নেই। এরা যেন দু'টি ভিন্ন মেয়ে। সম্পূর্ণ আলাদা।'(জহির রায়হান ২০১৩ : ৯৯)। শিউলির মতো জাহানারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও এমন।

তৎকালীণ সময়ে হিন্দু-মুসলিম নর-নারীর বিবাহ সমাজ স্বীকৃত না হলেও অনেক ঔপন্যাসিক হিন্দু মুসলিম নর-নারীর বিবাহ বন্ধনকে উপন্যাসের অনুষঙ্গ করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু তখনকার সময়ের উপন্যাসে নাগরিক জীবনে প্রেমের ঘটনা বহুল প্রচলিত ছিল না। ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে মুসলমান পরিবারের নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ ছিল খুবই সামান্য, তাকে মনে করা হতো অন্যায় ও গর্হিত। সালমা নারী পুরুষের বন্ধুত্বকে কটাক্ষ করে বলেছে :

> আগের দিনে ছেলের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব হতো। মেয়েদের সঙ্গে মেয়ের। আজকাল ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্বের পালাটা বড় জোরেশোরে শুরু হয়েছে। ...বন্ধুর স্ত্রীকেও বলি বান্ধবী, নিজের স্ত্রীকেও বলি বান্ধবী। বন্ধুর প্রেমিকা, তাকেও ডাকি বান্ধবী বলে। আবার নিজের প্রেয়সী– তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলি, বান্ধবী।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৬)

মূলত সে সময় নারী-পুরুষের মেলামেশা পূর্ববাংলার সমাজ কাঠামোয় ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষিত না হওয়ায় শুধু সমাজের চোখে নয়, নিজেদের এমনকি তরুণ যুবকদের মধ্যেও সংকোচ কিংবা অস্বস্তি সৃষ্টি হত। এ সম্পর্কে কাসেদ ও শিউলি এক সঙ্গে রিকশায় বসার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। অপরিচিত কোন মেয়ের সঙ্গে রিকশায় চড়ার অভিজ্ঞতা কাসেদের সেটাই প্রথম। লেখকের বর্ণনায় : 'তাই বারবার অস্বস্তিবোধ করছিলো কাসেদ। কপালে মৃদু ঘাম জমছিলো এসে, বারবার ওর কাছ থেকে সরে বসার চেষ্টা করছিল সে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৬)। এ ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে মূলত ঔপন্যাসিক সমাজের ক্রমপরিবর্তনের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

সমাজের বহুল পরিচিত একটি বিষয় পরচর্চা। এখানকার অনেক চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আপনকর্ম ফেলে, দুর্বলতা ভুলে গিয়ে কিছু মানুষ অন্যের ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। উপন্যাসে এমন মানুষের মধ্যে রয়েছে বড় সাহেবের কোম্পানির লোকেরা। অফিসের কর্ণধার হলেও বড় সাহেবের সমালোচনা করতে কোম্পানির লোকেরা পিছুপা হয়নি। সামনে বলার সাহস নেই তবে তার অবর্তমানে, তারা মুখরোচক সমালোচনায় মুখর থেকেছে অফিস রুমে। মকবুল সাহেব অসুস্থ হলে তার সেবা শুশ্রুষার দায়িত্ব নিলে তারা সমালোচনা করে এভাবে : 'একাউনটেন্ট তার টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে বলেন, পরশু দিন বিকেলে দেখলাম বড় সাহেব তাঁর গাড়ি করে ওদের হাসপাতাল থেকে বাসায় পৌঁছে দিচ্ছেন।'(জহির রায়হান ২০১৩ : ৭৯)

ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্তের বসতঘর এমনকি আসবাবপত্রের খবর পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। রাজধানী ঢাকা নগরীর নতুন এলাকায় সদ্য চুনকাম করা বিত্ত, বৈভব ও প্রাচুর্যেভরা অট্টালিকার পাশাপাশি পুরোনো ঢাকার অন্ধকার খুপরির বিবরণও দিয়েছেন। বিধৃত করেছেন নিম্নমধ্যবিত্তের সাংসারিক অভাব দৈন্যকেও। বর্ণিত আছে :

> লালবাগে একটা সরু গলির ভেতরে একখানা আস্তর উঠা একতলা দালান আর একটা দোতলো টিনের ঘর নিয়ে থাকেন মকবুল সাহেব। বড় পরিবার, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি। বাইরের একখানা ঘর বৈঠকখানা এবং স্কুল পড়ুয়া দুই ছেলের শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের চেয়ে ধুলোবালি আর আবর্জনার আধিপত্য সবার আগে চোখে পড়ে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৬১)

এভাবে ১৯৪৭ পরবর্তী ঢাকা শহরে সদ্য অঙ্কুরিত নাগরিক জীবন, অর্থনৈতিক কাঠামো, এবং নগরায়নের নানা উপাচারে সাজিয়ে তুলেছেন 'শেষ বিকেলের মেয়ে' উপন্যাসের বাণী বুননে।

উপন্যাসের স্রষ্টা মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তবে বাংলাদেশের উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ বিলম্বিত হয়েছে। বিভাগোত্তরকালে সামন্ত মূল্যবোধ আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সহযোগী শক্তিতে পরিণত হওয়ায় বুর্জোয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী ও পুঁজি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বন প্রত্যাশী মধ্যবিত্তের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ভেতরে ভেতরে তাদের মানসিকতা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। আর বিভাগপরবর্তী কালপর্বের উপন্যাসে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মানসের সেই সামূহিক অস্তিত্বগত সংকটের আদ্যপান্ত রূপায়ণ করা হয় ।

বঙ্গদেশে নাগরিক সভ্যতার যাত্রা মোঘল আমল থেকে শুরু হলেও বাংলায় আধুনিক নগর জীবনের শুরু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা লগ্নে। ১৮৫৭ সালে সেপাহি বিদ্রোহের পর বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন। মূলত ব্রিটিশ শাসনের শুরু হয় শিল্পতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সূচনার মধ্য দিয়ে। আর ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে, নগর জীবন ও সংস্কৃতির রূপান্তরে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। ' উনিশ শতকের বাঙ্গালি রেনেসাঁ বা নগজাগরণ মূলত পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার সম্ভোগের ফল।' (বদরুল হাসান ১৯৯০ : ০১)। প্রথম ইতালির ফ্লোরেন্সে এই নবজাগরণের সূচনা। মধ্যযুগীয় স্থবির জীবন থেকে মোহমুক্তি, সামন্তসমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ, নগরের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসে স্বাধীনতা অর্জনই ছিল এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। যা পরবর্তীকালে বাঙালি সমাজে সংযুক্ত হয় ব্রিটিশ শাসনকালে। প্রথমদিকে হিন্দু সম্প্রদায় নব চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়। তবে 'জাতীয় জীবনে এ সময়ে যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল। তার সবটাই ছিল আরোপিত।' (জুলফিকার আলী মানিক ১৯৯৫ : ১৭)। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সূচনালগ্ন থেকে আবর্তিত হয় মুসলিম নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি। সামাজিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে আবার তারা সাহিত্যেও ঠাঁই করে নিয়েছিল। '১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বে রচিত উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন সংগঠনের বিচিত্র রূপ এবং উদ্ভিন্নমান মধ্যবিত্ত জীবনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯: ৩৭৫)। পরে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালপরিসরের উপন্যাসে তা আরও মাত্রাবহুল হয়ে উঠেছে। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির আচারণগত বৈশিষ্ট্য হল- অস্তিত্বশঙ্কা, আত্মমগ্নতা, পলায়ণপরতা ও মনস্তাপে বিদীর্ণ-বিচুর্ণ জীবনানুভূতি, গ্রামীণ জীবন পেরিয়ে নাগরিক শিক্ষা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণ, ইতিহাস সচেতনতা প্রভৃতি। 'শেষ বিকেলের মেয়ে' উপন্যাসে নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্ত সত্তা কতটুকু ধারণ করেছে তা দেখার বিষয়।

রাজনীতি মধ্যবিত্ত জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ। এ উপন্যাসেও আমরা রাজনীতির স্পর্শ লক্ষ্য করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রতিবেশে নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের প্রণয় উপাখ্যান বিধৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে। কাসেদের জীবনের সবচেয়ে নীরব নায়িকা নাহারের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন :

> কাসেদের আপন বোন নয় নাহার।

মায়ের দূর সম্পর্কের এক খালাতো বোনের মেয়ে। ছোটবেলায় ওর মা মারা যান। ওর বাবা তখন কি একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

...কিছুদিন পরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মিলিটারীতে চলে যান। নাহারকে রেখে যান মায়ের কাছে। মাঝে মাঝে চিঠি আসতো।

কখনো মাদ্রাজ থেকে। কখনো পেশোয়ার থেকে। কখনো কানপুর। শেষ চিঠি এসেছিলো আরাকান থেকে।

তারপর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

কেউ বলেছে যুদ্ধে মারা গেছে।

কেউ বলেছে, জাপানীরা ধরে নিয়ে গেছে টোকিওতে। লড়াই শেষ হলো।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯-৪০)

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সব কিছুতেই অতৃপ্তি। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে নিজেরাই ভুলে যায় তারা কি চায়, কি তাদের প্রাপ্য। সেকারণে এ শ্রেণির মানুষের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকে অপূর্ণতা, সর্বক্ষণ অস্থিরতা গ্রাস করে থাকায় জীবনের পূর্ণার্থের সন্ধান মেলেনা কখনো। এখানে শিউলি কোনটি সঠিক, কোনটি সত্য তা বুঝতে অপারগ। তার চাওয়া আর প্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা। শিউলির উক্তিতেই যা প্রত্যক্ষিত : 'চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে সাপে-নেউলের সম্পর্ক রয়েছে যে। এই দেখুন না, আমি চাই ছেলেদের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে মিশতে আর ওরা চায় আমাকে ঘরের গীন্নী হিসেবে পেতে। ভাবুন তো কেমন বিচ্ছিরি ব্যাপার।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৮৫)

উপন্যাসটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প হলেও 'উপন্যাসিক বিকাশমান বাঙ্গালি মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব-জটিল ও বিবর্ণ অবস্থাকে সূক্ষ্মভাবে এ উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। কলোনিশাসিত সমাজের সময়দাস মধ্যবিত্ত স্বপ্নললিত জীবন এ উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ১৬০) সাধারণত নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনের কাঙ্ক্ষিত-প্রলুব্ধ স্বপ্ন চিরদিনই অপূরণীয়। তাই তারা ভর করে কল্পনায়। বাস্তবতার শূন্য কোটর থেকে কল্পনার আবেশে সুখ অনুভব করে। উপন্যাসের নায়ক কসেদ সেই প্রকৃতিরই। স্বপ্নই তার অবলম্বন, দু'চোখ ভরা কল্পনা। যে মেয়েকে দেখে, তাকেই ভালো লাগে। কাসেদের অবস্থান নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। কল্পনাপ্রবণ কাসেদের স্বপ্ন খুব বড় নয়, লোভনীয় নয়, বিত্ত-বৈভরের নয়, যেন-তেনভাবে টাকার পাহাড় গড়া নয় তার স্বপ্ন সামান্য, সুখী-ছোট্ট সংসারের, 'ওর মনে এখন রঙের ছোঁয়া লেগেছে। দুচোখে স্বপ্নের আবির ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। একদিন জাহানারাকে বিয়ে করবে কাসেদ।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৯)। তবে তার এ ভাবনা কোনদিন আলোর মুখ দেখেনি। সে সংশয়ে ভুগেছে, দ্বন্দ্বে অস্থির মন কাতর হয়েছে, স্বস্তি পায়নি, নিজের ভেতরের আন্তর্দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হয়েছে। কাসেদের স্বগোক্তি এমন :

> জাহানারা, এভাবে আর কতদিন চলবে বলতে পারো? কতদিন আমি ভেবেছি আমার মনের একান্ত গোপন কথাটা ব্যক্ত করবো তোমার কাছে। বলবো সব। বলবো এসো আমরা ঘর বাঁধি। তুমি আর আমি। আমরা দুজনা, আর কেউ থাকবেনা সেখানে। কেউ না। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৭৯)

আশা পূর্ণ হল না তার। মধ্যবিত্তের স্বাদ এমনই হয়। ব্যর্থতার গ্লানিতে তাদের চরিত্রে যুক্ত হয় অস্তিত্বের সংকট। দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে দাঁড়িয়ে বার বার ভুল করে যেমনটি করেছে কাসেদ। এক নারীর প্রণয় ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হয়ে আশ্রয় পেতে চেয়েছিল অন্য এক নারীর আঁচল তলে। সেখানেও ঠাঁই মেলে নি। পলায়ণপর মনস্তাপে বিদীর্ণ-বিচূর্ণ কাসেদের জীবনানুভূতি শেষ পর্যন্ত এমন : 'প্রথম পরাজয়ের গ্লানি মুছে যাবার আগেই দ্বিতীয় বার পরাজিত হলো সে। নিজের বোকামির জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো ওর। আগুনে হাত বাড়ালে পুড়বে জানতো। তবু কেন সে এমন করলো?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৯৯)

শেষ পর্যন্ত কাসেদের পিছুহটার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক নিম্নমধ্যবিত্তের পরাজিত মনকে বিধৃত করেছেন। কাসেদের মতো মধ্যবিত্তের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কোনদিন পিছু ছাড়েনা। প্রত্যহ কুরে কুরে নিঃশেষ করে তবু পারিপার্শ্বিক ঘটনা মোকাবেলার শক্তি ও সাহস কোনদিনই যোগান দিতে পারেনি। মূলত ঔপন্যাসিক দক্ষ হাতে নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন বৃত্তান্ত যথাযথ ভাবে চিত্রিত করেছেন এ উপন্যাসে।

প্লট কিংবা ঔপন্যাসিকের মতামতের মতো উপন্যাসে চরিত্রের যথার্থ রূপায়ণ সমান গুরুত্ববাহী। 'শেষ বিকেলের মেয়ে' উপন্যাসে জহির রায়হান জীবনের একই বৃত্তে আবর্তিত গুটিকতক মানব-মানবীর আংশিক ঘটনাক্রমকে বিন্যাস্ত করেছেন। তাঁর এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি অদ্যান্ত সাদা-সিধে। তাদের কারো মধ্যে ক্ষমতার দাম্ভিকতা নাই, চারিত্রিক জৌলুস নাই, দার্শনিক ভাবপ্রবণতা নাই বরং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অলিতে গলিতে হেটে চলা অতি চেনা পথিকগুলিই তাঁর উপন্যাসের চৌকাঠে ঢুকে পড়েছে। জীবন সংগ্রামে যুদ্ধরত বেশকিছু নর-নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠাই মুখ্য হয়ে উঠেছে চরিত্রগুলিতে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়ক কাসেদ। বড় সাহেবের কোম্পানির একজন সামান্য করণিক, অল্প বয়স, পুরোনো ঢাকার কলতা বাজারে বসবাস করা এক রোমান্টিক যুবক। বাবা অনেক আগে মারা গেছেন। মা আর এক দুঃসম্পর্কের বোন নাহারকে নিয়ে তার সংসার। তার কল্পনাপ্রবণ সংবেদনশীলতার অতিরেক প্রকাশ ঘটাতে লেখক তাকে কবি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। 'এ কারণেই জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কাসেদ কল্পনা চরিতার্থতায় আকাশস্পর্শী।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ১৬০)। স্বপ্নই ছিল তার অবলম্বন, দু'চোখ ভরা কল্পনা এমন :

> একদিন জাহানারাকে বিয়ে করবে কাসেদ। অর্থের প্রতি তার লোভ নেই। এক গাদা টাকা আর অনেকগুলো দাসীবাদীর স্বপ্নও সে দেখে না। ছোট্ট একটা বাড়ি থাকবে তার, শহর নয়, শহরতলীতে, যেখানে লাল কাঁকরের রাস্তা আছে আর আছে নীল সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে দু'পায়ে কাঁকর মাড়িয়ে বেড়াতে বেরুবে ওরা। সকাল কিম্বা সন্ধ্যায়। রাস্তায় লোকজনের ভিড় থাকবে না। নিরালা পথে মন খুলে গল্প করবে ওরা কথা বলবে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৯)

তার কল্পনার আকাশ সুবিশাল দিগন্ত বিস্তৃত, হৃদয় অকপট, উদার, মানবিক গুণসম্পন্ন লাজুক প্রকৃতির। তবে সে ছিল নিম্নমধ্যবিত্তের প্রতিনিধি, যার জীবনে ছিল নানা প্রতিবন্ধকতা। লেখকের বর্ণনায় :

> রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে গেছে। অতি সাবধানে হাঁটতে গিয়েও ডুবন্ত পাথর-নুড়ির সঙ্গে বারকয়েক ধাক্কা খেয়েছে কাসেদ। আরেকটু হলে একটা সরু নর্দমায় পিছলে পড়তো সে। গায়ের কাপড়টা ভিজে চুপসে গেছে। মাথার চুলগুলো বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন বাসায় এসে পৌঁছলো কাসেদ, তখন জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছে।
>
> বোধ হয় ঝড় উঠবে আজ।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৭)

এই ধাক্কা বা হোচোট খাওয়া শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় এটা তার জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে জীবনের প্রতিটি বাঁকে রয়েছে বাঁধা, না পাওয়ার যন্ত্রণা, স্বপ্নের অপূর্ণতা। আর এ ঝড় শুধুমাত্র প্রকৃতিগত নয় এই ঝড় কাসেদের জীবনের ঝড়ও বটে। তার মানসিকতার ঝড়কেও লেখক উপন্যাসের প্রথমে এভাবেই আভাস দিলেন।

মধ্যবিত্তের অন্যতম লক্ষণ ব্যক্তিত্বশীলতা। জীবনের নগ্নবাস্তবতায় দাঁড়িয়েও সে তার ব্যক্তিত্বের কাছে ছোট হয়নি। তাইতো সালমা যখন তাকে প্রশ্ন করে, যাবার জন্যে অমন হন্যে হয়ে উঠেছে কেন? তখন সে ব্যক্তিত্বপূর্ণ উত্তর দেয় : 'চিরকাল থাকবো বলে আসিনি নিশ্চয়। কাজে এসেছিলাম, সারা হলো চলে যাচ্ছি।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫)

মানুষ মাঝে মাঝে অনেক কিছু চিন্তা করে। কখনো তার অর্থ খুঁজে পায়, কখনো পায় না। তবু তার ভাবনার শেষ নাই। কাসেদও কল্পনা করেছে একদিন জাহানারাকে নিয়ে সুখের ঘর বাঁধবে। কিন্তু পূর্ণ হলো না তার সে স্বপ্ন। কপট আর ভণ্ডামির বন্যায় ভেসে গেল তার স্বপ্ন। সে দিন হয়তো আকাশে অনেক তারা জ্বলেছিল, রাস্তায় অনেক লোকও ছিল, হয়তো বাতাসে কোন বাগানের মিষ্টি গন্ধ ভেসে এসেছিল। কিন্তু তার কোন কিছুতেই কাসেদের শূন্যতা পূরণ হলো না। জাহানারার অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভেবে তার বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তক্ষরণ এমন :

> জাহানারা, কেন এমন করলে তুমি,
> তোমাকে ভালোবেসে পরিপূর্ণ ছিলাম আমি। যেদিকে তাকাতাম ভালো লাগতো আমার।
> আজ আকাশের নীল আর নিওনের আলো সবকিছু বিবর্ণ মনে হচ্ছে আমার চোখে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৮৪)

মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার পরিণাম এমনই হয়। মধ্যবিত্ত মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা। কাসেদের বেলায়ও ব্যতিক্রম নয়। সে স্বপ্ন দেখেছে। 'বাস্তবতা এর ভিন্ন। তবুও কল্পনার রোগে ছাড়ে না। বাস্তবতাবোধ যাদের নেই, শ্রেণি সচেতনতাবোধ যারা লালন করে না, তাদের মনের অলিন্দ থেকে কল্পনা সহজে বিদায়

নেয় না। কাসেদ তেমনি এক যুবক, যার আছে স্বপ্ন দেখার রোগ।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১: ৩৫)। কল্পনার আধিক্য থাকায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বারবার ব্যর্থ হয়। তার মানসিকতা এমন :

> যা হবার হোক ।
> জীবনে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে চায় সে।
> জাহানারাদের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর মনে হলো কে জানে হয়তো আজ এখানে এই শেষ আসা।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৯৬)

এমন পরিস্থিতিতেও সে দৃঢ় থাকতে পারে নি। পারে নি জাহানারাকে মনের কথা বলতে। দ্বিধা দ্বন্দ্বে দিকভ্রান্ত হয়ে নিজেকে শিউলির কাছে সমার্পণ করে। কিন্তু সেখানেও পরাজিত হয়। অবশেষে শেষ বিকেলের শান্তশিষ্ট মেয়ে নাহারই তাকে আশ্রয় দান করে।

জাহানারা ও শিউলি এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। বড়লোকেরা যে সুবিধাবাদী হয় তার উত্তম উদাহরণ চরিত্র দুটি। জাহানারা নিজের সুবিধার বা প্রয়োজনে কাসেদকে ব্যবহার করে। অন্যদিকে তার কাজিন শিউলিও বড়লোক, চঞ্চল, কপট এবং সুবিধাবাদী। তার প্রেমিক থাকে ইটালিতে, সময় কাটানোর জন্য বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা পেতে কাসেদের স্মরণাপন্ন হয়। দু'জনেই ঈর্ষাকাতর। তাইতো জাহানার সঙ্গে কাসেদের মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরাতে শিউলি মিথ্যার আশ্রয় নেয়। জাহানারাও ঈর্ষান্বিত হয়ে কাসেদের বাড়ি গিয়ে শিউলির প্রেমিকের কথা বলে আসে। লেখকের ভাষায় : 'কে জানে হয়তো এটা জাহানার একটা মনগড়া ব্যাপার। নিজে থেকে হয়তো একটা সিদ্ধান্ত টেনেছে সে। আর তাই নিয়ে ছুটে এসেছে কাসেদকে বলতে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৯১)। অন্যদিকে কাসেদ যখন শিউলিকে বিয়ে করার অনুরোধ জানায় তখন শিউলি তার সুবিধাবাদী, ভণ্ডামি চরিত্র উন্মোচন করে :

> কাসেদের দিকে চমকে তাকালো শিউলি। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো,
> আমার দিক থেকে যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে আমি মাফ চাইছি কাসেদ সাহেব।
> সত্যি আমি অপারগ, নইলে-।
> কথাটা শেষ করলো না সে।
> কাসেদের মনে হলো শিউলি হাসছে।
> তীক্ষ্ম বিদ্রুপে ঠোঁটের কোণজোড়া জ্বলছে ওর।
> কাসেদ হেরে গেলো।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৯৯)

এ দুটি চরিত্রকে জহির রায়হান ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন চরিত্ররূপে গড়ে তোলেন নি বরং ঢাকা নগরীর উঠতি ধনিক শ্রেণির অবস্থাকে তুলে ধরতে অবতারণা করেছেন।

এ উপন্যাসের সালমা হৃদয়হীনদের খপ্পরে পড়েছে। প্রথম দিকে কাসেদকে ভালোবাসলেও কাসেদ তাকে পাত্তা দেয়নি। অন্যদিকে বিয়ের পর তার স্বামীও তাকে মূল্যায়ণ করেনি। ফলে এক সময় কিছুটা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। যে সময় নারীদের ঘরে থাকাটাই সমাজের কাম্য, তাদের মতামত জানানোর স্থান বড়ই সংকীর্ণ, সেই সময়ে সমাজ চোখে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিয়ের পর এক সন্তানের জননী হয়েও কাসেদকে নিয়ে পালানোর প্রস্তাব দিয়েছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়, 'সালমা নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু মৃদু হাসি। তারপর টেনে টেনে বললো, আজ ; এখান থেকে বেরিয়ে, তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে দূরে বহু দূরে কোথাও?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৭৫)। কাসেদ অপারগতা জানালে সালমার স্বপ্নগুলো কাঁচের ঘরের মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

উপন্যাসের একটি চরিত্র বৃদ্ধ কেরানি মকবুল আহমেদ, থাকেন পুরানো ঢাকায়। ছাপোষা মানুষ, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা। চালাকি করে কাসেদকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাসায় তাঁর মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য। মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য যেভাবে হোক মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, মকবুল সেই বাস্তবতার প্রতিনিধি। লেখকের বর্ণনায় : 'লোকে বলে বাসায় নেমন্তন্ন করার পেছনে নাকি কন্যাদায় মুক্ত হওয়ার একটা গোপন আকুতি রয়েছে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯)

অন্যদিকে আর একটি চরিত্র কাসেদের অফিসের বড় সাহেব। প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে সে সুখী হতে পারে নি। তাকে ডিভোর্স দেয়। বিয়ে করে মকবুল সাহেবের মেজ মেয়েকে। ছোটকালে দরিদ্র ঘরের সন্তান হওয়ায় অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছে। অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনে বড় হয়েছে। বৈবাহিক জীবনের প্রথমে অসুখী থাকলেও মকবুল সাহেবের মেজ মেয়েকে নিয়ে মধুময় সংসার গড়ে তোলে। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে : 'তবু কোনদিন দমে যাননি বড় সাহেব। হতাশা আসতো মাঝে মাঝে, তখন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতেন তিনি। কান্না পেতো, কাঁদতেন, চোখের পানি ধীরে ধীরে চোখেই শুকিয়ে যেতো।' (জহির রায়হান, ২০১৩ : ৫২)

এ উপন্যাসে কাসেদের মা ও বাবা দুটি বিপরীতমুখী চরিত্র। লেখক মাকে দেখিয়েছেন আবহমান বাংলা ও বাঙ্গালি সমাজে চিরপরিচিত ধর্মপ্রাণ মাতৃবতী রূপে। অন্যদিকে পিতাকে দেখিয়েছেন সমাজ সচেতন, প্রখর যুক্তিবাদী, ধর্মকর্ম সম্পর্কে অনাস্থাবাদী, আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষ হিসেবে। এ দুটি চরিত্রই সমাজের অতি পরিচিত মুখ। কাসেদের মা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> 'পাশের ঘর থেকে মায়ের কোরান শরীফ পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। টেনে টেনে সুর করে পড়ছেন তিনি। রোজ পড়েন। সকালে, দুপুরে আর রাতে। মাসে একবার করে কোরান শরীফ খতম করা চাই নইলে উনি শান্তি পান না। রাতে ভাল করে ঘুমও হয় না তাঁর।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩০)

অন্যদিকে বাবার সম্পর্কে বর্ণিত আছে :

বাবা ছিলেন একেবারে উল্টো মেরুর মানুষ। ভুলেও কোনদিন ধর্ম-কর্মের ধার ধারতেন না তিনি। এক বেলা নামাজ কিম্বা একটা রোজাও কখনো রাখেন নি। মা কিছু বলতে গেলে উল্টো ধমকে উঠতেন, বলতেন ওসব বাজে কাজে সময় ব্যয় করার ধৈর্য্য আমার নেই।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩০-৩১)

এ উপন্যাসের অন্যতম একটি চরিত্র নাহার। নায়কের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। এমনকি উপন্যাসটির নামকরণ ও হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে তা ছিল নীরবে, নিভৃতে, বাণীহীনভাবে। সে নিজেকে মগ্ন রেখেছে সাংসারিক কাজে, সমাজের জটিল-কঠিন বক্তব্যের বাইরে। তার নির্লিপ্ততাই যেন মুখরিত হয়েছে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রে। চঞ্চল, কপট, প্রতিবাদী, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের পাশে তাকে স্থান দিয়ে ঔপন্যাসিক মহিমা, সরলতা, স্নিগ্ধতার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। সে নিঃশব্দে কাসেদের ধ্যান করেছে, হৃদয়ে লালন করেছে ; যার উগ্র বা সচেষ্ট প্রকাশ ছিল না, কিন্তু তার প্রেম হৃদয়ে বিকাশমান ছিল। সেকারণে বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে এসেছে কাসেদের কাছে। বর্ণিত আছে :

কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ভেতরে এলো নাহার। তারপর আলতো চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, এতকাল যার সাথে ছিলাম, তাকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না বলে চলে এসেছি। যেতে বলেন তো আবার চলে যাই। কাসেদ বিস্ময় বিমূঢ় স্বরে বললো, কাল তোমার বিয়ে আর আজ হঠাৎ এখানে চলে আসার মানে ? নাহার নির্বিকার গলায় বললো, বিয়ে আমার হয়ে গেছে। কার সাথে ? কাসেদ চমকে উঠল যেন। ক্ষণকাল ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নাহার। তারপর অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বললো, যার সাথে হয়েছে তার কাছেই তো এসেছি আমি। তাড়িয়ে দেন তো চলে যাই। কাসেদ বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওর হলুদ মাখানো মুখের দিকে। কিছুতেই সে ভেবে পেল না, সেই চাপা মেয়েটা আজ হঠাৎ এমন মুখরা হয়ে উঠলো কেমন করে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ১০৪)

'এটা সমাজেরই রূপ। এমন পানি গড়াতে গড়াতে নিচে বেয়ে স্থির হয়। মাৎসন্ন্যায়ের সমাজে এমনই হবে। কাসেদের মত স্বল্প আয়ের টানাটানির কেরানীদের, তাকে বিয়ে করতে হলো নাহারকে, যাকে নিয়ে কখনো কল্পনার আকাশ নির্মাণ করেনি।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৩৯)। এভাবেই জহির রায়হান উপন্যাসে চরিত্রগুলোকে কাহিনীর প্রয়োজনে বিকশিত করেছেন। গল্পের প্রয়োজনে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই বিধৃত করেছেন। হয়তো এতে কোন কোন চরিত্র পরিপূর্ণ বিকাশিত হয়নি, বিন্দু বিন্দু ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে চরিত্রগুলি ভাসা ভাসা ভাবে উপস্থিত হয়েছে তবুও সমাজ গৃহের একটি সাম্যক ধারণা রয়েছে উক্ত চরিত্র চিত্রণের মধ্যে যা একজন সার্থক শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

সার্থক উপন্যাস নির্মিতির প্রশ্নে বিষয় ও আঙ্গিকের সমন্বিত রূপায়ণ অনিবার্য। 'শেষ বিকেলের মেয়ে' উপন্যাসটি জহির রায়হানের প্রথম উপন্যাস হলেও ঔপন্যাসিক এখানে জীবনের অতি বাস্তব ঘটনাকে রূপায়িত করেছেন সাবলীল বাণীব্যঞ্জনায়। বিষয়ের সাথে মিল রাখতে চেয়েছেন আঙ্গিকের। বর্ণনাভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা চৈতন্যপ্রবাহরীতিকে

অনুসরণ করেছেন। ব্যক্তি চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের অন্যতম একটি রীতি চৈতন্যপ্রবাহরীতি। এ রীতিতে লেখক কর্তৃক উপন্যাসের কাহিনী, ঘটনা ও দৃশ্য বর্ণনায় প্রচলিত রীতির জায়গায় বর্ণনাকারী হিসেবে আসে কোনো ব্যক্তি চরিত্র। চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের ধারা প্রধানত দুটি। (১) অন্ত বিশ্লেষণ (Internal analysis) রীতিকে চরিত্রের বাইরে থেকেও লেখক চরিত্রে অন্তর্জগৎ দেখেন এবং প্রতিটি মুহূর্তকে ধরার চেষ্টা করেন। (২) অনুচ্চার মনোকথন (Interior monologue) রীতিতে বর্ণনার রীতি ও দৃষ্টিকোণ চরিত্রের চেতনার উপর নির্ভরশীল। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে গোপাল হকালদার তাঁর 'ত্রিবিদা' উপন্যাসে প্রথম এ রীতি ব্যবহার করেন। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যপ্রবাহধর্মী লেখকদের পূর্বসূরি। পরে কমল কুমার মজুমদারের উপন্যাসে তার বিশেষ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। আর বাংলাদেশের উপন্যাসের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহই প্রথম লেখক যিনি চৈতন্যপ্রবাহকে প্রথম উপন্যাসে ব্যবহার করলেন। 'শেষ বিকেলের মেয়ে'তে জহির রায়হান অনেকটা অবচেতনভাবেই এ রীতি অনুসরণ করেছেন। এ রীতির প্রথম বৈশিষ্ট্য অন্তর্বিশ্লেষণ উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। এখানেও লেখক বাইরে থেকে কাসেদের মধ্যে দিয়ে তাঁর আন্তর্জগৎকে ধরতে চেয়েছেন। কাসেদ প্রায় কল্পনায় মগ্ন হয়ে যেত, জাগর স্বপ্ন দেখত এবং তার মানস জগতের দূরাধিগম্য ও গভীরতর প্রদেশের ভাবনাবলী প্রকাশ করত। বর্ণিত আছে :

> পা থেকে মাথা পর্যন্ত জাহানারাকে দেখে নিলো কাসেদ। আজ ওকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেক আকর্ষণীয়। ওর চোখের আর মুখের লাবণ্য অনেক বেড়ে গেছে। কথার মধ্যেও আশ্চর্য পরিবর্তন। কাসেদের মনে হলো সে যেন এ মুহূর্তে আরো বেশি করে ভালোবেসে ফেলেছে ওকে। তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে ওর মনে। না, জাহানারাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের কোন কিছুই কল্পনা করতে পারে না কাসেদ। কিছুই না ।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৮২)

কেন্দ্রীয় চরিত্র এমন বিভোল মনে মগ্ন থাকলেও লেখক বারবার বর্ণনার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন ফলে এ রীতির পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয় নি।

অন্যদিকে অনুচ্চার মনোকথনরীতিরও সন্নিবেশ ঘটেছে এখানে। কাসেদ ভালোবাসে জাহানারাকে। তবে জাহানারা তাকে ভালোবাসে কিনা তা জানার প্রয়োজন মনে করেনা। বরং নিজের চেতনার উপর নির্ভরশীল হয়েই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে। ফলে বার বার ভুল করে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাইতো জাহানারা তাকে বলেছিল : 'জাহানারা পরক্ষণে বললো, কাউকে ভালোবাসতে যাওয়ার আগে তার সব কিছু জেনে নেয়া উচিত, নইলে পরের দিকে অশেষ অনুতাপে ভুগতে হয়।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৯০)।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের আরেফ আলীর সঙ্গে কাসেদের মিল রয়েছে। রাতের আবছায়াতে একটি হত্যাকাণ্ড দেখার পর আরেফ আলীর স্বাভাবিক জীবনের শান্তিবিনষ্ট হয়েছে। জাগতিক কাজগুলো প্রথা মাফিক করলেও তার অন্তরে বয়ে চলে চেতনার সূক্ষ্মস্রোত। এ উপন্যাসের কাসেদ জাহানারাকে ভালোবেসে তার চেতনায় মগ্ন হয়েছে। ফলে অফিসে কাজ করতে মন বসেনা । আনমনে সাদা কাগজে জাহানারার নাম লিখে পূর্ণ করে । আবার তা

কালি দিয়ে ঢেকে দেয়। জাহানারাকে নিয়ে নানা প্রকার হ্যালুসিনেশনে ভুগতে থাকে। কাসেদের এই যন্ত্রণা পিড়িত আত্মঅনুসন্ধান ও আত্মআবিষ্কার সবই চেতনাপ্রবাহরীতিতে অগ্রসর হয়েছে। তবে চৈতন্যপ্রবাহরীতির উপন্যাসে যে আপাত-অসংলগ্নতা থাকে তা এ উপন্যাসে নাই। শুধুমাত্র মকবুলের মেয়ে পরিচয় দিতে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন লেখক। উপন্যাসে তার নামটি পর্যন্ত নেই। তাকে এক বার সন্ধ্যায় আবছা–আবছা দেখেছিল কাসেদ। ঘটনাক্রমে কাসেদের জীবনে সেই মেয়েটি সন্ধ্যার মতো আবছাই রয়ে গেল। এভাবে উপন্যাসটিতে উভয়রীতির আংশিক বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হয়েছে।

ভাষারীতির ক্ষেত্রে জহির রায়হান চরিত্র ও বিষয় অনুসারে ভাষা ব্যবহার করে নৈপুণ্য ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ উপন্যাসের ভাষা মান বাংলার। গ্রামীণ চরিত্র না থাকায় আঞ্চলিক ভাষার সংযোজন অনুপস্থিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের সহজ সাবলীল বর্ণনাও তাঁর উপন্যাসকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে। উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গি সংলাপধর্মী, ভাষার মাধুর্য কারুশিল্পের মতো স্পষ্ট । বর্ণিত আছে : 'কাসেদ বললো, লড়াই শুধু রাজার সঙ্গে রাজার, এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের আর এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশেরই হয় না। একটি মনের সঙ্গে অন্য একটি মনেরও লড়াই হয়।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৯৭) । অন্যত্র বলেছে : 'সে মনও আমার। আমার নিজের। একজন চায় স্বার্থপরের মত শুধু পেতে । অন্যজন পেতে জানে না,জানে শুধু দিতে। বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই তার আনন্দ।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৯৮)

এছাড়া ঔপন্যাসিক কাহিনীর রূপনির্মাণে ও ঘটনার পারম্পর্য বোঝাতে প্রচুর উপমা, অলংকার ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। এ উপন্যাসের শুরুতে প্রকৃতি নির্ভর চিত্রকল্প অঙ্কিত হয়েছে। যেমন :

'আকাশের রঙ বুঝি বার বার দলায় । কখনো নীল। কখনো হলুদ। কখনো আবার টকটকে লাল। ' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৭)

বিকেলের রোদকে একটি মেয়ে দেহের সঙ্গে তুলনা করে উপমা ব্যবহার করেছেন বেশ কয়েকটি জায়গায়। যথা :

- সেই মেয়েটিকে দেখবে। বিকেলের রঙে যার দেহ রাঙানো। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৭৩)
- দাঁতগুলো চিকচিক করছে বিকেলের রোদে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৮২)
- লাল সূর্যটা হারিয়ে গেছে উঁচু উঁচু দালানের ওপাশে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১০৩)
- শেষ বিকেরের সোনালি আভায় মসৃণ পাখাটি চিকচিক করছে তার। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১০৩)

এছাড়া তাঁর বর্ণনাভঙ্গি কাব্যময় ও হৃদয়গ্রাহী, যেন কোমল-স্নিগ্ধ ঝর্ণাধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে অনন্তের পানে। যেমন : 'পাশের বাড়ির ছাদে মেলে দেয়া কুমারী মেয়ের হাল্কা নীল শাড়িখানা বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে পতপত করে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১০৩)

তাছাড়া তাঁর এ রচনায় প্রচুর লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। এসব অলঙ্কার সংযোজনের মাধ্যমে কাহিনী ও বিষয়কে নিপুণভাবে পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন। লোকসংস্কারগুলি এমন : 'মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নাই।' (জহির ২০১৩ : ৩১)

প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে রয়েছে : 'ধোপার গাধা আর কোম্পানির অফিসের কেরানির মধ্যে পার্থক্য নেই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৯৯)

অথবা, 'চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে সাপে নেউলের সম্পর্ক রয়েছে।'(জহির রায়হান ২০১৩ : ৯৯)

এ উপন্যাসের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য লেখকের দার্শনিক উক্তি। তিনি উপন্যাসে আত্মস্তুতি গাইতে নয়, বরং বর্ণনা ও ঘটনার সঙ্গে মিল রেখে নিজস্ব দর্শন ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন :

- যে গাছে প্রাণ নেই তার গোড়ায় পানি ঢেলে কী হবে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৭৫)
- দুই দেহ, এক মন। মেয়েজাতটাই বোধ হয় এমনি। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৬৩)
- মেয়েরা এমনি হয়। তারা যাকে ভালোবাসে তাকে বড় স্বার্থপরের মত ভালোবাসে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৬৩)

'জাহানারার প্রতি কাসেদের একমুখী প্রেমও তার প্রত্যাখ্যানজনিত কারণে ঈর্ষামূলক প্রতিক্রিয়ায় শিউলির কাছে আত্মনিবেদন এই হচ্ছে শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসের কাহিনী। সাধারণ এই উপকরণকে জহির রায়হান তাঁর জীবনবোধের মৌল আবেগের সঙ্গে অনেকাংশে সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ১৬০)। এছাড়া শিল্পরূপ বিশ্লেষণে 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে বুঝতে সাহিত্য যদি কিছু সাহায্য করে তাহলো লোকজীবন, লোককথা, মিথ ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক এবং উৎপাদনশীল জীবনে এসবের প্রাধান্য ব্যাপক।' (তুষার পণ্ডিত ১৯৯৯: ১৩৮)। এ ক্ষেত্রে 'শেষ বিকেলের মেয়ে'র শিল্পরূপের সফলতা রয়েছে। অনেক গবেষক একে গবেষণায় স্থান দেননি কিংবা উপন্যাস বলতে নারাজ। কেউ কেউ মনে করেন, 'জহির রায়হানের শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাস নয়, বড় গল্প।' (মুনসুর মুসা ১৯৭৪ : ৯০)। 'শেষ বিকেলে মেয়ে'তে নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেয়ে চরিত্রের ভীড়। জাহানারা শিউলী, সালমা, নাহার আর মকবুল সাহেবের মেজো মেয়ে। নায়ক কাসেদ কল্পনা প্রবণ, ভাব জগতের মানুষ, স্বপ্ন দেখতে যত পটু কর্মজগতে তত পশ্চাদপদ। বইটির মেজাজ রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন, একটু কৈশোরিক প্রেমের লক্ষণাক্রান্ত।' (কবির চৌধুরী ২০১১ : ৬০)

মূলত 'শেষ বিকেলের মেয়ে' উপন্যাসে জহির রায়হান তাঁর রোমান্টিক মনের মাধুরী মিশিয়ে জীবনের রং ধরতে চেয়েছেন, উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের স্বপ্ন , কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাসর নির্মাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক সচেতন শিল্প কাহিনীর উপযোগী করে অতি অল্প কথায় রাজনীতিকেও অনুষঙ্গ করেছেন। জীবন সমুদ্রের বালুচরে ঘুরে ঘুরে তিনি নুড়ি কুড়িয়েছেন এবং তা দিয়ে প্রাসাদ গড়তে সচেষ্ট হয়েছেন। হয়তো কোথাও ক্ষয়ে গেছে, হয়তো কোথাও সৌন্দর্যহানী ঘটেছে, তবু নির্দিষ্ট অবয়বে সমাজ কাঠামোর বাস্তব চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছেন। এ

উপন্যাসে তিনি ঘটনার ঘনঘটা সংযোজন করেন নি, বরং কাহিনী কাসেদের বাড়ি, অফিস, মকবুল সাহেবের বাড়ি এবং রিক্সা চড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। চরিত্রগুলিকেও বিস্তৃত করেননি, এতে হয়তো শিউলি, জাহানারা কিংবা সালমার বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে উন্মোচিত হয়নি তবু তাদের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি উপন্যাসে বর্তমান। তিনি হয়তো চেয়েছেন কাসেদের চরিত্রকে আবর্তন করতে। এ কারণেই অন্যান্য চরিত্রর প্রাধান্য কম। কাসেদকে এমনভাবে গড়েছেন যার মধ্যে সরলতা আছে কিন্তু, শঠতা নাই। তার আত্নসম্মান আছে, হৃদয় আছে, আছে মানবিকতা বোধ, অফিসের পরচর্চায় সে কান দেয় নি। কাউকে অসম্মান করেনি বা হিংসা করেনি। মকবুল সাহেবের অসুস্থতা ও অসহায়ত্বে সহানুভূতি জানায়, বড় সাহেবের অশান্তিতে তারও চিন্তা হয়। সালমার বিপদকে দূর করতে চায়, শিউলির চপল মন বোঝার চেষ্টা করে, মায়ের উদ্বিগ্নতা পীড়া দেয়। তবে তার চরিত্রে কিছুটা দুর্বলতা আছে। সে সক্রিয় নয়, নায়কের মত সংগ্রামীও নয়। সুযোগ থাকলেও পেশা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করেনি। কল্পনা করেছে বেশি। কিন্তু তা প্রয়োগে সচেষ্ট হয়নি।ফলে বারবার অন্যের কাছে পরাজিত হয়েছে, ঔপন্যাসিকও একাধিক বার তার উল্লেখ ঘটিয়েছেন। নিম্নমধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হয়েও তার মধ্যে সংগ্রামী মানসিকতা অনুপস্থিত। এসব দিক থেকে চরিত্রটি কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হলেও জহির রায়হান তাঁর হৃদয়ের কোমল পরশ দিয়ে কাসেদ চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। মূলত ও উপন্যাসে জহির রায়হান অতিসাধারণ মানুষের অন্তরের গহীনে লালিত স্বপ্নকে নিখুঁত, মননময় ও যথার্থ গড়নে আঁকতে সক্ষম হয়েছেন। জীবনের গভীর বিশ্লেষণ, অতলান্ত উপলব্ধি, স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার নিদারুণ মর্মঘাতী রূপ তথা জীবনে নানা রঙ্গের ছবি এঁকেছেন। তাছাড়া স্বপ্নময় রঙ্গিন জীবনের অধিকারী শুধু ধনিক শ্রেণি, অর্থনৈতিকভাবে বিড়ম্বিত অস্বচ্ছলদের ভাগ্যে তা জোটে না, তার উপর সুবিধাবাদীরা দুশ্চিন্তার আঁধার মাখিয়ে দেয় সেই বাস্তব সত্যকেও তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’ উপন্যাসে জহির রায়হান বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকরণরীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষাবিন্যাস উপন্যাসে নতুন মাত্রা দান করেছে। দীর্ঘ বর্ণনা নেই বরং সুকৌশলী দক্ষ হাতে পরিচ্ছন্ন ও ক্ষুদ্র সংলাপ রচনা করেছেন। লোকজ শব্দ ও সংস্কারকে অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। সহজ সাধারণ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ব্যক্ত করেছেন। মোটকথা, বলা যায় সুনিপুণ শিল্প অবয়ব না হলেও জহির রায়হানের উপন্যাসের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’ যথেষ্ট সার্থকতার দাবিদার।

তৃষ্ণা

তৃষ্ণা (১৯৬২) জহির রায়হানের নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস। এখানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সমাজ প্রতিবেশের রক্তক্ষরণের নগ্ন চিত্রায়নের স্বার্থক শিল্পরূপ। তবে রাজনৈতির চিত্রের কুপ্রভাবের মর্মঘাতী রূপ বর্ণনার পাশাপাশি মানব মনের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্ত ইচ্ছা, অসীম কামনার বাস্তবিক চেতনাও এখানে সমানভাবে দৃশ্যমান। গল্প কথকের গল্প বলার ছলে দুটি ছেলে মেয়ের পূর্ববর্তী জীবনের নানান টানাপড়েন, মানসিক যন্ত্রণার করুণ ছবি চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয় মধ্যবিত্ত জীবনের অসীম স্বপ্ন, অতৃপ্ত বাসনা ও অপূরণীয় তৃষ্ণা বারবার ধ্বনিত হয়েছে। কার্যত মানব জীবনের তৃষ্ণিত মনের যে অব্যক্ত চঞ্চলতা তারই সাম্যক পরিচয় রয়েছে উপন্যাসটিতে।

'তৃষ্ণা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শওকত। উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র মার্থা গ্রাহাম ও নাচের দলের মেয়ে সেলিনা। তাদের তিন জনের মানসিক তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা বর্ণনার মাধ্যমে লেখক তাঁর পরিণত শিল্পী চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। 'এ উপন্যাসে তিনি সমাজচিত্র নয়, সমাজদ্রোহের শাণিত পরিচয় দিয়েছেন।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৪১)। পূর্ববর্তী উপন্যাস 'শেষ বিকেলের মেয়ে'র মূল উপজীব্য ছিল মানুষের সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর মানসিকতার ক্রুর রূপ। এরপরেই রচিত উপন্যাস 'তৃষ্ণা'তেও লেখক সমাজ জীবনের একই রূপ ব্যক্ত করেছেন তবে তা কিছুটা পরিণত, কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকের। সমাজ মানুষের হৃদয়হীনতার নিষ্ঠুরতাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। ঘুনেধরা সমাজের সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ-রোগীর মতো পচন ধরেছে। সমাজের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম, অমাবিকতা আর নির্দয়তার নির্মম বাস্তবতা বর্ণিত হয়েছে পুরো উপন্যাস জুড়ে। 'জীবনের কর্কশ, কদর্য রং টি তৃষ্ণায় মুখ ব্যাদান করে বের করে দিয়েছেন। এ উপন্যাসের পরিণতি মর্মন্তুদ।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৪১)। উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতার আভাস দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক প্রথমেই মাষ্টার বাড়ির সামনে কুষ্ঠরোগীর মর্মান্তিক অবস্থান বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> সামনে লাল রকটার ওপরে একটা কুষ্ঠ রোগী। কবে এসে ঠাঁই নিয়েছে কেউ জানে না। হাত পায়ের নখগুলো তার ঝরে গেছে অনেক আগে। সারা গায়ে দগদগে ঘা। চোয়াল জোড়া ফুটো হয়ে ভরে গেছে ভেতরে। আর সেই ছিদ্র বয়ে লালাস্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। কাঁধে, বুকে, উরুতে। চারপাশে অসংখ্য মাছির বাসা ভনভন করে উড়ছে। বসছে। আবার উড়ছে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১১১)

কুষ্ঠ রোগীর শারীরিক অবস্থার সঙ্গে লেখক সমাজের তুলনা করেছেন। মানুষের অজান্তেই ধীরে ধীরে সমাজদেহে পচন ধরেছে। আর তার রুগ্ন শরীরের বিমর্ষ ক্ষত ক্রমশ বেরিয়ে পড়েছে লোকসম্মুখে। শওকত, মার্থা, সেলিনা এই সমাজের অধিবাসী। তাদের জীবনেও সমাজের জীবাণু সংক্রমিত হয়ে পচন ধরেছে। তারাও যেন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নয়। নৈতিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র

আপন তৃষ্ণা মেটাতে জীবন স্রোতে এগিয়ে চলেছে। তাইতো উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শওকত বেকার, উপার্জনে অক্ষম হলেও জীবন চালনার কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয় নি। তার ছিলনাই কোন ব্যক্তিত্ববোধ, চাকুরি সম্পর্কে ভালোবাসার মানুষের কাছেও সে মিথ্যা বলেছে। মার্থা তার কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে শওকত বলেছে : 'কাজটা মানে ওটা হচ্ছে তোমার, এক জায়গার জিনিসপত্র আরেক জায়গায় আনা নেয়া করা। মানে ওই- যে কী বলে ফ্লাইং বিজনেস। ও রকমরই অনেকটা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৪৬)

শওকতের এসব কথার আগাগোড়াই মিথ্যা। এটার প্রয়োজন ছিল না। তারপরও সে নিজেকে মিথ্যার কাছে সমার্পণ করেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্রের এমন অনৈতিক আচারণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ঘুনে ধরা সমাজকেই উপস্থাপন করেছেন। সামাজিক অব্যবস্থাপনার আরেকটি দৃশ্য ফুটে উঠেছে মার্থার চরিত্রে। প্রথম জীবনে স্বামী সংসার নিয়ে ভালোই দিন যাপন করে। তবুও সেখানে সে টিকে থাকতে পারে নি। চাটগাঁ ছেড়ে চলে এসেছে রুগ্ন-ক্ষত শহরে, এখানে দেখা হয় শওকতের সঙ্গে, তাকে নিয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখে। আবার নিজের কর্মস্থল স্থায়ী করতে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। দ্রুত সব কিছু পেতে চায়। তাই সে চুরির আশ্রয় নেয় । বাড়িভাড়ার আগাম টাকাও দোকান ভাড়ার টাকা যোগাড় করতে রাতকানা লোকটার ঔষুধের দোকান থেকে ঔষধ চুরি করে বিক্রি করে। চুরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা খায়। জেল খাটতে হয় তাকে। মার্থা সম্পর্কে লেখক বর্ণনা করেছেন :

> রাতকানা লোকটার দোকান থেকে ঔষুধ চুরি করে নিয়ে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে মার্থা। ওকে থানায় আটকে রেখেছে বাসা সার্চ করতে এসেছে পুলিশ। ঘরের মধ্যেও অনেকগুলো চোরাই ঔষুধ পাওয়া গেছে। চৌকির নিচে একটা বাক্সের মধ্যে লুকোনো ছিলো। আর পাওয়া গেছে একটা টিনের কৌটার মধ্যে রাখা নগদ সাতা'শ টাকা। টাকা আর ঔষুধ সব সঙ্গে করে নিয়ে গেছে পুলিশের লোকেরা।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৪৯)

শুধু মার্থ নয় এ উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের অবক্ষয়, বিকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত সময়ে পৃথিবীর সম্ভ্রমের প্রতীক নারী হয়ে ওঠে পণ্য। অন্দরমহল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে রূপজীবিকার পথে। লেখক নারীর এই পণ্য হওয়ার বর্ণনা সুতীক্ষ্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসের নাচিয়ে দলের মেয়ে সেলিনা। ভরা যৌবনে উচ্ছলিত কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ। তামাটে চোখ, গাঢ় বাদামি অধর। শওকতের মতে মার্থার চেয়েও সে বেশি সুন্দরী। তবে তার মধ্যে নারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য- লজ্জা বিষয়টি নাই। সে হিংসাপরায়ণ। রাত্রিবেলা শওকতকে মার্থার ঘরে যেতে দেখে সহ্য করতে পারে না। তাই পরদিন শওকতকে রাত্রসঙ্গী করতে তার দূর্বলতায় আঘাত হানে। আবার নিজের যৌবন সমার্পণ করতে গিয়ে ছলনা করে বলেছে :

> 'ঘুম। বিচিত্র এক ধ্বনি বেরুল মেয়েটির কণ্ঠে। ঘুম আমার আসে না।
>
> কেন?

দরজার খিল এঁটে ঘুমোতে পারিনা বলে। সেলিনা আবার খিলখিল
হেসে উঠলো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৪৩)

অন্যদিকে নারীর এই পণ্য হওয়ার মূল হোতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পুরুষেরাই তাদের মানসিক বাসনা মেটাতে মেয়েদের টেনে-হেচড়ে বের করেছে রাস্তার চৌমোহনায়। নারীর সর্বস্ব উন্মোচন করতে তারা বাধ্য করেছে। ঔপন্যাসিক অতি সচেতনভাবে সেই সব পুরুষ চরিত্রকেও স্থান দিয়েছেন এ উপন্যাসে। এসব চরিত্রের মধ্যে অন্যতম বুড়ো আহমদ হোসেন। সতেরো বছর ধরে সে মেয়েদের দালালি কাজে লিপ্ত। শুধু নিজেই নয় অন্যকেও এ পথে আসার প্ররোচনা দেয়। বেকার শওকতকে সে বলেছে :

> বুঝবে, বুঝবে, বুঝবে না কেন। আবার এক গাল হাসলো বুড়োটা। শোনো, তাহলে আরো খুলে বলি। ওই যে বাড়িগুলোর কথা বল্লাম, ওখানে খাসা খাসা কতগুলো মেয়ে থাকে। আহা এমন উসখুস করছো কেন, পুরোটা শুনে নাও না। তুমি তো আর কিছু করছো না, তোমার কী এলো গেলো। তুমি তো শুধু বকরা ধরে আনবে। নগদানগদি টাকা।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৩৬)

এছাড়া সামাজিক অবক্ষয়ের বিকৃত, কদর্য, কুৎসিত চেহারাও প্রকাশ ঘটেছে ভাড়াবাড়ির ভাড়াটিয়াদের মধ্যে। অতি সচেতন খলিল মিস্ত্রি যদিও বাইরে বের হওয়ার সময় স্ত্রীকে তালা বন্ধ করে রাখে, কিন্তু সেই বউ-ই অন্ধকারে সিঁড়ির নিচে অন্যলোকের কণ্ঠলগ্ন হয়ে শুয়ে থাকে। শওকতের দৃষ্টিতে : 'পকেট থেকে একটা দিয়াশলাই বের করে জ্বালালো সে। আর তার আলোতে যেন ভূত দেখলো শওকত। সিঁড়ির নীচের জড়ো–করে রাখা একগাছা আবর্জনার মাঝখানে জুয়াড়িদের একজন লোক খলিল মিস্ত্রীর বউকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়েছে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১১২)। অথচ একই জায়গায় অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের প্রেম নিয়ে মধ্যরাতে হৈ চৈ বেধে যায়। এ সামজে সে রকম প্রেম নিষিদ্ধ, অপরাধের। লেখকের বর্ণনায় এমন : 'জুয়াড়িদের একজন চিৎকার করে উঠলো। ওসব কিন্তু-টিন্তু বুঝিনে। বাড়িটা একটা বেশ্যাখানা নয়, যে যার যেমন খুশি তাই করবে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১২৬)

জহির রায়হান অবক্ষিত সমাজের নিদারুণ বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন 'তৃষ্ণা' উপন্যাসে। এই সমাজ পাটাতনে সবাই কোন না কোন ভাবে অসহায়। তারা যেখানে বাস করে সেখানে অসংখ্য লোকের ভীড়। বাড়িতে কতলোক ভাড়াটে হিসেবে আছে কেউ বলতে পারে না। কয়টা ঘর রয়েছে তার হিসেব করতে গেলে হয়তো একটা লোক একদিন ধরেও কোন খেই পাবে না। বাড়ির ভাড়াটেদের প্রায় সবাই দিন মুজুর। সমাজের এই নিম্নবিত্ত মানুষ যারা জীবন বঞ্চিত, স্বপ্নতাড়িত, শোষিত, হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য, দরিদ্র এবং বিবেক ববর্জিত। নিত্যনৈমিত্তিক অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও তারা কুকুরের মতো কলহে লিপ্ত হয়। লেখকের ভাষ্য মতে : 'ত্রিকোণ উঠোনের মাঝখানে মহিলারা প্রচণ্ড কলহে মেতে উঠেছে। এ ওর চুল ধরে টানছে। ও এর

পিঠের উপর একটানা কিল-ঘুসি মারছে। দুটো নেড়ি কুত্তা ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে বারবার লাফাচ্ছে আর ঘেউ ঘেউ করছে। '(জহির রায়হান ২০১৩ : ১১২)

প্রাকৃতিক নিয়মে আলোর ওপারে থাকে অন্ধকার, সাদার ওপারে থাকে কালো, ভালোর পরে থাকে মন্দ, তেমনি সমাজে মুখোশধারী ভালো মানুষদের মধ্যেও রয়েছে নানান নগ্নতা, নোংরামী। লেখক সচেতনভাবে সমাজের সেই অন্ধকার গলির কদর্য বিভৎস রূপকে উন্মুক্ত করেছেন এখানে। বৃদ্ধ আহমদ হোসেন বলেন :

> বামুন কায়েথ বলো, আর মোল্লা মৌলভি বলো, সব ব্যাটাকে চিনে রেখেছি। দিনের বেলা কোট-প্যান্ট পরে সাহেব সেজে অফিসে যায়। আর যেই না সন্ধ্যে হলো, তেমনি বাবু মুখে রুমাল গুঁজে চট করে ঢুকে পড়ে গলিতে।...শালার সাহেবের বাচ্চারা ওদের গে গার্ল বলে ডাকে। যেন, নাম পাল্টে দিলেই ধর্ম পাল্টে গেলো আর কী?
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১০৯)

ভদ্রবেশী এই অভদ্র ভণ্ডলোকেরা কেবল শহরেই থাকেনা, তাদের আনাগোনা সবখানে। গ্রামেও তাদের দেখা মেলে। গ্রামের সহজ সরল তরুণীদের হিংস্র থাবায় তারা গ্রাস করে। শওকতের স্মৃতিচারণে সে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে : 'সোনালী ধানের কোলে শুয়ে আছে আয়েশা। ওর সারা মুখে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ। ওর অপুষ্ট স্তনের কোল ঘেঁষে দুটো ক্ষত। রক্তের একজোড়া ফিনকি বোঁটা ছুড়ে গড়িয়ে পড়েছে একগোছা শীষের ওপরে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১২০-২১)

সামাজিক চিত্র বর্ণনার পাশাপাশি তিনি রাজনীতিকেও উপেক্ষা করেন নি। 'তৃষ্ণা' উপন্যাসেও অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ কৌশলে রাজনীতির রক্তক্ষরিত রেখাপাত অঙ্কন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অমানবিক বিড়ম্বনার গভীর পরিণতি পরিলক্ষিত হয় এ উপন্যাসে। ঘটনা বর্ণনার মধ্যে যুদ্ধের আভাস এমন : 'বাইরে তখন জাপানিরা রেখা ফেলছে। ...মাটির গুহা থেকে একে-একে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। তখনো অন্ধকার। আর ধুঁয়ো। মাথায় লোহার টুপি পরা এ-আর-পির লোকগুলো ছুটোছুটি করছে চারপাশে। ওদের হাতে টর্চ, পায়ে বুটজুতো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১২৯-৩০)। তাছাড়া তিনি তীর্যকভাবে ষাটের দশকের স্বৈরাচার শাষিত সমাজের ধ্বসেপড়া বিধস্ত চেহারা অঙ্কন করেছেন। যুদ্ধ মানুষকে নিঃস্ব করে। একের সম্পদ কেড়ে অন্যকে দেয়। শুরু হয় অন্তহীন বিড়ম্বনা। যে যেভাবে পারে লুটে পুটে চেটে তৃপ্ত হতে চায়। তবুও তাদের তৃষ্ণা মেটে না। মার্থার পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে এমনি দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে। মার্থা বলে :

> আমার মায়ের জীবনটা বড়দুঃখে কেটেছে। ভরা যৌবনে, মানে সেই যুদ্ধের শেষের দিকে মা হঠাৎ বাবাকে ছেড়ে দিয়ে এক নিগ্রোকে বিয়ে করে বসলেন।... কি আশ্চর্য। একদিন সকালে নিগ্রোটা তার কাজে বেরিয়ে গেলো আর ফিরলো না।... মা কান্নাকাটি করলেন। গির্জায় গিয়ে কতবার কত নামে যিশুকে ডাকলেন।

কিন্তু কিছুই হলো না। পরে একদিন শুনলাম। সেই নিগ্রোটা তার দেশে, তার ছেলেমেয়ে আর বৌয়ের কাছে ফিরে গেছে।

(জহির ২০১৩ : ১১৪-১১৫)

যুদ্ধ কখনো মূল্যবোধ গড়ে না বরং ধ্বংস করে। জহির রায়হান সেই অবক্ষিত মূল্যবোধের নিকশরূপ অঙ্কন করেছেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বসেপড়া মূল্যবোধের মর্মান্তিক ছবি চিত্রিত হয়েছে বেশ কিছু সাহিত্যে। এর মধ্যে অন্যতম রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষরে' (১৯৭৮)।

'তৃষ্ণা' উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই যুদ্ধের কুপ্রভাবের শিকার। নায়ক শওকত অব্যবস্থাপনার জন্যে বেকার, প্রাণপণ চেষ্টা করেও চাকুরি পায় না। মার্থার অবস্থাও একই, তার স্বপ্ন বিপন্ন হল হৃদয়হীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবিচারে সে বিচ্ছিন্ন হলো মাতা-পিতার কাছ থেকে। দুজনেই বড় হলো কদর্য ও কুষ্ঠরোগগ্রস্থ অসুস্থ পরিবেশে। দুই বিড়ম্বিত যুবক-যুবতী তবু এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে বেঁচে ছিল। একই স্বপ্ন নিয়ে একত্রিত হয়েছিল, ভালোবেসে ছিল একে অন্যকে, স্বপ্ন দেখে ছিল ঘর বাঁধার। ঔপন্যাসিকের বক্তব্য এমন : 'শওকত আর মার্থ একটি পছন্দ মতো ঘর। কিছু আশা। কিছু স্বপ্ন। অনেক ভালোবাসা, আর হয়তো অশেষ দৈন্যেভরা একটুকরো সংসার। তাই হোক।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৪১)

অন্যদিকে নওশের আলী, খলিল মিস্ত্রী, তার বউ, বউমারা কেরানী, মতিন সাহেবের মেয়ে জাহানারা, আজমল আলীর ছেলে হারুন, খালেদ খান, মহসিন মোল্লা প্রমুখ সবাই কোন না কোনভাবে যুদ্ধের কালিমা লেপোন করেছে আপন গায়ে । এমনকি উপন্যাসের খারাপ চরিত্র হিসেবে খ্যাত বুড়ো আহমদও এই যুদ্ধের শিকার। জীবনের অতি অশ্লীল, নগ্ন ও বাস্তবিক কথা খুব সহজে বলে দেন তিনি। তার এই অভিজ্ঞতা জীবন থেকে নেওয়া। বিশ বছর আগে বাদামতলির নিষিদ্ধ এলাকা থেকে খুনের মামলায় পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তার ছেলেকে। তখন থেকেই বুড়ো আরো বেশি বিপথে প্রবেশ করেছে। তার বক্তব্য এমন :

> কোন ব্যাটা আছে এই শহরে, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে আমি ভালো। সব জোচ্চোর, বদমাশ। আমার ছেলেটাকে যেদিন কুড়ি বছর ঠুকে দিলো সেদিন বুঝে ফেলেছি, চিনি ফেলেছি সবাইকে। বাদামতলির নিষিদ্ধ এলাকায় কী একটা খুনের মামলায় জড়িত হয়ে ছেলে তার জেল খেটেছি। তার কথা মনে পড়ায় সহসা কথার বল্গায় লাগাম টানলো বুড়ো। বার্ধ্যকের ছানি পড়া চোখজোড়া ছলছল করছে। অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলো সে। বাদামতলি খারাপ।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৩৫)

'সমাজের বিসদৃশ, বীভৎস, বিক্রিত রূপ বের হয়ে এসেছে বৃদ্ধ-দ্রোহী চরিত্র আহমদ হোসেনের ক্ষুরধার উপহাস ব্যঞ্জক কণ্ঠে। সামাজিক ঘোরতর অবিচারের কথা বলেছেন। বলেছেন যে, অন্যায়ভাবে, বিনা

অপরাধে বিশ বছরের জেল হলো তার ছেলেটির। তার সংসার, স্বপ্ন চুরমান হলো। সেই থেকে সে বেসামাল বেপরোয়া।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৪৭। এখন কোন কথাই তার মুখে আটকায় না। কথায় কথায় ভদ্রলোকের গোপন, কুৎসিত চেহারা উন্মোচন করে। এছাড়া এ উপন্যাসে যুদ্ধের আভাস তাঁর মুখ থেকেই বর্ণিত হয়। পাড়ায় যত লোক মারা যায় তা গণনা করে রাখেন। শওকতের সঙ্গে দেখা হলেই মৃতের সংখ্যা বলে দেন। আসলে মৃতের এই সংখ্যা যুদ্ধে মারা যাওয়া লোকদেরই সংখ্যা। অন্যদিকে যুদ্ধের অবিকৃত, নোংরা, কুৎসিত প্রতিবেশকে অতি দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে এ উপন্যাসে। এখানকার নায়ক নায়িকারা যে সমাজে বসবাস করে, যে অসুস্থ পরিবেশে যারা বড় হয়েছে সেই পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> আসরে জুয়ো যেমনি চলছিলো, তেমনি চলবে। নাচের মহড়া থামবে না।
> মাওলানা সাহেব বারান্দায় বসে এক মনে তছবি পড়ে যাবেন। শুধু উঠোনে বসে থাকা নেড়ি কুত্তা দু'টো উপরের দিকে ঘেউ ঘেউ করবে। আর বাইরের রকে বসা কুষ্ঠ রোগীটার দু'চোয়ালের চির দিয়ে একটানা লাভা ঝরবে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১১৬-১১৭)

এমনি পরচর্চা মুখর, সংকীর্ণ, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, জুয়ার আড্ডা আর অশালীন কর্মকাণ্ডে আস্তাখুড়ে দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে হাফছেড়ে বাঁচার জন্য শওকত ও মার্থা স্বপ্ন দেখেছিল। ওরা এই বাড়ি ছেড়ে ঢাকার বাবু বাজারে একটি বাড়ি ভাড়া করতে চেয়েছিল। পরিকল্পনা করেছিলো মার্থার দেড়শো টাকা বেতনের পঁচাত্তর টাকা দিয়ে ঘর ভাড়া আর বাকি টাকা দিয়ে সংসার চালাবে যতদিন শওকত একটা চাকরি না পায়।

এ সমাজে অদ্ভূত আরেক শ্রেণির লোক আছে। তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে মাওলানা সাহেব। তিনটি বিয়ে করা মাওলানা সমাজের আসল অকর্ম দেখতে পায়না। নারী পুরুষের অবৈধ মেলামেশা, জুয়ার আড্ডা, নিশি রাতে গলির মধ্যে নাচের মহড়া। এগুলি নিয়ে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। অথচ শওকত ও মার্থার পরিচ্ছন্ন মেলামেশাকে নিয়ে সে কটাক্ষ করে। এমনই চরিত্রের ছাপ পাওয়া যায় আইনজ্ঞদের, তারাও অনুসন্ধান করে না শওকত কেন কেরানীকে খুন করলো বা মার্থা কেন ঔষধ চুরি করলো। বরং তাদের দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়াই এদের মোক্ষম কাজ। আর এ সমস্ত চরিত্র বিস্তারের ফলেই সমাজ আরো বেশি দুর্নীতিগ্রস্থ হচ্ছে, আরো বেশি কোলুষিত হচ্ছে। লেখক এই স্বৈরাচার শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত, বৈষম্যমূলক ও স্বার্থের দাঁত বের করা শ্বাপদ সংকুল সমাজের প্রকৃত মূর্তি অতি নিবিড় দৃষ্টি দিয়ে চিত্রিত করেছেন।

প্লট কিংবা ঔপন্যাসিকের মতামতের মতো উপন্যাসে চরিত্রের যথার্থ রূপায়ণ সমান গুরুত্ববাহী। 'তৃষ্ণা' উপন্যাসে জহির রায়হান জীবনের একই বৃত্তে আবর্তিত গুটিকতক মানব-মানবীর আংশিক ঘটনাক্রমকে বিন্যস্ত করেছেন। তাদের অধিকাংশই সমাজের নিম্নতলার মানুষ যাদের কাছে সম্মান নেই, ভালোবাসা মূল্য

নেই, নীতি-নৈতিকতার চর্চা নেই, আদর্শের কোন মানদণ্ড নেই, আছে শুধু বিড়ম্বনা, যন্ত্রণা, জীবন টিকিয়ে রাখার বিরামহীন সংগ্রাম আর তৃষ্ণিত মনের বাসনা পূরণের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা। তারা কেউই সুস্থ সমাজের বাসিন্দা নয়। এ উপন্যাসের নায়ক শওকত বেকার। সমাজের অন্ধি-সন্ধিতে ঘুরে বেড়ায় চাকুরির জন্য। উনিশ বছর ধরে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এখনো জীবনে স্থির হতে পারে নি। সে প্রথম কাজ করেছে খিদিরপুরের জাহাজ ঘাটে, তারপর এক বাঙালি বাবুর আটা কলে। এরপর রেলওয়ে অফিসের ফাইল ক্লার্ক, তারপর ছয়মাস এক নামজাদা রেস্তোরায় কাউন্টার ম্যান পদে, পরে এক মলম কোম্পানির দালালি, এরপর বছর দু'য়েক জনৈক সূতো ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবার দেখাশোনা, আগাখানী আহমদ ভাইয়ের আধুনিক বেকারিতে, আধা সরকারী ফার্মে টাইম ক্লার্কের পদে চাকুরি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানেও টিকল না। বেতন বাড়ানো নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হওয়ার সাত দিনের নোটিশে তাকে অফিস ছাড়তে হয়ে ছিল। জীবিকা খোঁজের ভারে নুইয়ে পড়া এই নায়কের দৈহিক গড়নের মধ্য দিয়ে লেখক তার জীবনের অনেক অজানা অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। লেখকের বর্ণনায় :

> লম্বা দেহ। ছিপছিপে শরীর দূর থেকে দেখলে মনে হয়, বাতাসের ভার সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু কাছে এসে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শুকনো শরীরের মাংশপেশীগুলো অত্যন্ত সবল এবং সজীব। ময়লা রঙের চামড়ার গায়ে অসংখ্য লোমের অরণ্য!... চোখ জোড়া বড় বড়। মণির রঙ বাদামি। কিন্তু তার মধ্যে কোন মাধুর্য নেই। আছে এক তীক্ষ্ম তীব্র জ্বালা।... সহসা দেখলে মনে হয়। সারা মুখে কোথাও কোন লাবণ্য নেই। কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করলে ধীরে ধীরে একটা অব্যক্ত সৌন্দর্য ধরা পড়ে। যার সঙ্গে আর কারো তুলনা করা যেতে পারে না। মাঝারি নাক, মাংসল, আর ঠিক নাকের মাঝখানটায় একটা দাগ। চওড়া কপাল বয়সের সঙ্গে তাল রেখে সামনের অনেকখানি চুল ঝরে পড়ায় সেটাকে আরো প্রশস্ত দেখায়। মুখের গড়নটা ডিম্বাকৃতি। পুরু ঠোঁট জামের মতো কালো। তেমনি মসৃণ আর তেলতেলে। যখন ও হাসে, তখন মুক্তোর তো দাঁতগুলো ঝলমল করে ওঠে। চিবুকের হাড়জোড়া সুস্পষ্ঠভাবে উঁচু আর তার নিচের অংশটুকু হঠাৎ যেন একটা খাদের মধ্যে নেমে গেছে। খাদের শেষ প্রান্তে একটা বড় তিল। মাথাভরা একরাশ ঘন চুল। অমসৃণ এবং অনাদৃত।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১০৯-১১০)

তবে তার তৃষ্ণার্ত স্বপ্ন ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থার কারণে হালে পানি পায়নি। সে সত্যের পথ ছেড়ে মিথ্যাকে আঁকড়েছে। শেষ পর্যন্ত জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বউমারা কেরাণীকে খুন করে নাচের মেয়ে সেলিনাকে নিয়ে পালিয়েছে। এখানেও সে ভুল পথে পা দিয়েছে। মূলত শওকত যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজ মানুষকে আশ্রয় দেয় না, কেবলই নিরাশ্রিত করে। ভুল পথে পরিচালনা করে এবং ধীরে ধীরে একটি জীবনকে ধ্বংসের পথে ধাবিত করে। শওকত সেই সমাজের নির্মমতার শিকার। তার স্বপ্ন বা মানসিক তৃষ্ণা কোন দিন পূরণ হলো না বরং নিজের জীবনকেই শেষ পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞে পতিত করলো।

এ উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র তথা নায়িকা মার্থা গ্রাহাম। টানা-টানা একজোড়া চোখ, হাল্কা ছিমছাম দেহ, গায়ের রঙটা কালো তেল তেলে। দেখলে মনে হয় না তার বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে। সেও যুদ্ধ বিধ্বস্ত সমাজের শিকার যুদ্ধের সময়ে তার মা বাবাকে ছেড়ে এক নিগ্রোকে বিয়ে করেছে। একদিন সেই নিগ্রোও তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন মা পাগল প্রায় হয়ে যায়। মার্থা এমন অস্বস্তিকর পরিবেশে মানুষ হওয়ায় জীবন নিয়ে সে দিশাহারা। একই ঘটনার পুরাবৃত্তি হয় তার জীবনে। প্রথম তার সঙ্গে বিয়ে হয় আক্সন ওয়ালার ছেলে পিটার গোমেসের সঙ্গে। ভিক্টোরিয়া পার্কের গির্জায় অনেক আত্মীয় পরিজন পরিবেষ্ঠিত হয়ে পিটারের হাতে সে আংটি পরায়। ঢাকা ছেড়ে তারা চাটগাঁয়ে চলে যায়। ভালোই সংসার অতিবাহিত করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্থা তাকে ছেড়ে দিয়ে খালেদ খানের সঙ্গে পালিয়ে যায়। তবে তাদের মধ্যে বিয়ে হয়নি। একদিন খালেদও মার্থাকে ছেড়ে চলে যায়। তখন এই বস্তিতে একটি ঘরভাড়া করে। রাতকানা লোকটার ঔষুধের দোকানে চাকরি নিয়েছে দুই বছর হলো। প্রথম জীবনে ভুল করলেও লেখক তার চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্ব স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক রাতে শওকত যখন তার ঘরে গিয়ে পৌরুষত্বের দাম্ভিকতা দেখাতে চেয়েছিল তখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। অন্যের কাছে নিজের সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে যেতে দেয় নি। পরবর্তীতে শওকতকে মার্থা বলেছে :

> যে জিনিসটা চাইলেই পেতে, তাকে এমন চোরের মতো পেতে চাও কেন? জানো, কাল রাতে আমার মনে হয়েছিলো তুমিও আর পাঁচটা লোকের মতো। নিতান্ত সাধারণ। তোমার চোখজোড়া কী বিশ্রী লাগছিলো, মনে হচ্ছিলো একটা মাতাল গুণ্ডা ছোটলোক। সত্যি, তোমার ওপরে হঠাৎ ভীষণ ঘেন্না এসে গিয়েছিলো আমার। আমি সহ্য করতে পারিনি, তাই কেঁদেছিলাম।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৩৯)

এ চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য আশাবাদী মানসিকতা। জীবনে বারবার ধাক্কা খেয়েও সে আশা ছাড়েনি। তার জীবন তৃষা শেষ হয়নি। সমাজের বদ্ধ নোংরা পরিবেশে থেকেও বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাইতো যায় সাতশো টাকার জোগাড়ের সামর্থ নাই সে তিন হাজার টাকার দোকান কেনার স্বপ্ন দেখে। মার্থার উক্তি :

> হোক পাগলামো। তবু সুন্দর। একবার চিন্তা করে দ্যাখো না। দোকানটা পেলে আর কোনো ঝামেলাই থাকবে না আমাদের। আমি কাউন্টারে বসে দোকান চালাবো। তুমি বাইরে থেকে জিনিসপত্র কিনে এনে দেবে। হিসেবটা দেখবে। কী চমৎকার হবে তাই না?
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৪৩)

কিন্তু সে স্বপ্ন পূরণ হল না। জীবন প্রতিষ্ঠার তীব্র বাসনায় হিতাহিত ভুলে গিয়েছিল। সেকারণে রাতকানা লোকের ঔষুধের দোকান থেকে ঔষুধ চুরি করে বিক্রির সময় ধরা পড়ে। এদিকে তার এতদিনের সঞ্চয়

একশত পঁচিশ টাকা সহ চুরি করা ঔষুধ পুলিশ বাড়ি তল্লাসি করে পায় ও তাকে ধরে নিয়ে জেলে পুরে রাখে। এভাবেই সে তার জীবন তৃষা পূরণে পরাজিত হয়। পরাজিত হয়, তার স্বপ্নগুলো।

কিন্তু শওকত ও মার্থা তাদের স্বপ্নকে অলৌকিক কোন উপায়ে, পীরের দর্গায় ধর্না দিয়ে, অসৎ পথে, তাবিজ-কবজ-কেরামতির জোরে বাস্তবায়ন করতে চায়নি। পরিশ্রম করে, দরকার হলে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দাঁড়াতে চেয়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল, ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। ওদের সৎচিন্তা, সৎপথের সংগ্রামও মার খেয়ে গেলে। মার খেল অপশক্তির কাছে, সামাজিক অপশক্তি। শওকত ও মার্থার সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের কথোপোকথন এমন :

> আর যাদের বাপ-মা বড়লোক ছিলো না। তারা? মার্থার দৃষ্টি শওকতের মুখের দিকে।
>
> ওরা নিজেরা খেটে রোজগার করে।
>
> কি দিয়ে?
>
> বিদ্যা বুদ্ধি আর শ্রম দিয়ে।
>
> আমরাও তাই করবো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো মার্থা। ওর চোখে মুখে আনন্দের দ্যুতি। যেন এ-মুহূর্তে তিন হাজার টাকা হাতের মুঠোয় মধ্যে পেয়ে গেছে সে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৪৪)

এ উপন্যাসের আর একটি চরিত্র বুড়ো আহমদ হোসেন। বিশ বছর একমাত্র অন্ধের যষ্ঠির বিনা কারণে বাদামতলী ঘাটের নিষিদ্ধ পল্লী থেকে খুনের মামলায় জেল হওয়ায় সে পাগল প্রায়। কোন কথাই আজ আর তার মুখে আটকায় না। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেনি, বিকিয়ে দিয়েছে, অন্ধকার জগতে। সতেরো বছর ধরে মেয়েদের দালালি করছে। শুনতে অতি বিশ্রী, অশ্লীল মনে হলেও লেখক তার মুখ থেকে সমাজের অন্ধকার জগতের কুৎসিত চিত্র অতি স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তার উক্তিতেই মানুষের অদম্য তৃষ্ণার কথা বারবার ধ্বনিত হয়েছে যার কোন অন্ত নাই। একটা শেষ হলে অন্য একটি চাহিদার সাধ জাগে যা পূরণের সাধ্য হয়তো নেই। তবুও তৃষ্ণার কোন সমাপ্তি নেই। আহমদ হোসেন বলেছেন : 'বাদামতলীর ঘাট বলো, ছক্কু মিয়ার চা-খানা কিম্বা খান সাহেবের কাফে হংকং বলো আর তোমাদের ওই বিলেতি ঢঙের জাত দেশি ক্লাব সব ব্যাটার ধর্ম এক বুঝলে। সবাই এক রোগে ভুগছে এক ক্ষুধায় জ্বলছে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১১১)

বিপর্যস্ত এই সমাজে বাস করে মেকি সমাজ ব্যবস্থা তার কাছে অসহ্য মনে হয়। ধসে পড়া সমাজের অন্ত্রে অন্ত্রে জীবাণু ঢুকে যাওয়ায় কোন ক্ষেত্রেই যেন তার আস্থা ঠাঁই পায় না। লেখক সব বিষয়ে তার অনাস্থা দেখাতে বলেছেন :

> আমার কোন জাত নেই। আমি না হিন্দু, না মুসলমান, না ইহুদি, না খ্রীস্টান। আমার জাত তুলে কেউ ডেকেছো কি এক ঘুষিতে নাক ভেঙে দেবো বলে দিলাম।..আমি কিচ্ছু জানি না। না জাত। না ধর্ম। না তোমাদের আইনকানুন। এর সবটুকুই ফাঁকি। চোখে ধুলো মেরে মানুষ ঠকানোর কারসাজি।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১০৮)

এ শুধু বুড়োর কথা নয় যেন লেখক তার মনে কথাকেই উক্ত চরিত্রের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। বুড়োর এই অনাস্থা থেকেই তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। বয়স্ক লোক হয়েও সে আজ আর পাপ কাজ করতে ভয় পায় না। শুধু নিজেই করে না অন্যকেও করতে উৎসাহিত করে। শওকতকেও তার দলে ভেড়াতে চায় এই যুক্তি দেখিয়ে :

> যে–শালারা এসব কাজ করে বেড়ায় তারা লেখাপড়ায় তোমার চাইতে কম না, অনেক বেশি। নিজেকে কী এমন কেউকেটা ভাবো যে কাজটা নিতে লজ্জা করছে? আর ওই ছুঁড়িগুলো, ওরাও তোমার ওই নালা-খন্দ থেকে কুড়িয়ে আনা নয়। সব ভদ্র ঘরের মেয়ে। স্কুলে-কলেজে পড়ে। ঘর-সংসার করে। ইচ্ছে করলে কোনোদিন তুমি নিজেও গিয়ে দু-এক রাত শুয়ে আসতে পারো তাদের সঙ্গে। তোমার কী? টাকা রোজগার হলেই হলো। ওরাও তো টাকার জন্যেই করছে এসব।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৩৬)

'তৃষ্ণা' উপন্যাসের আর একটি চরিত্র খলিল মিস্ত্রী। সেও স্বভাবিক নয়। সব বিষয়ে অতি সাবধানী। রোজ সকালে কাজে বেরিয়ে যাবার সময় বউকে তালা বন্দী করে রাখে। রাতে বাইরে থেকে আসার সময় ঠোঙায় করে সন্দেশ নিয়ে আসে বউয়ের জন্য। তালা খুলে ঘরে ঢুকে বউকে অনেক আদর করে। কাছে বসিয়ে সন্দেশ খাওয়ায়। আবার সময় পেলে জুয়াড়িদের সঙ্গে তাস খেলায় মেতে ওঠে। বুড়ো আহমদ হোসেন তার সম্পর্কে বলে: 'এটাও একটা রোগ, বুঝলে? এক রকমের ক্ষুধা। একজনকে অনন্তকাল ধরে একান্ত আপন করে, পাওয়ার অশান্ত ক্ষুধা। ঈর্ষা থেকে এর জন্ম। ঈর্ষায় এর মৃত্যু। এ ব্যাটারা কবিতা পড়েনা বলেই এদের এই অধঃগতি।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১১৬)

অন্যদিকে খলিলের বউ যাকে তার স্বামী এত ভালোবাসে, এত আবদ্ধ রাখতে চায় সে তার অজান্তে অন্য পুরুষের সঙ্গে ফুর্তি করে, অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধ্য সম্পর্কে লিপ্ত হয়। স্বামীর কাছ থেকে পরম শান্তি পাওয়ার পরও তার তৃষ্ণা মেটেনা, সে জন্য বিপথে পা বাড়ায়।

বউ মারা কেরানিও অশান্ত পরিবেশের কুলাঙ্গার সন্তান। প্রতিদিন সে রাতে বাড়িতে আসে দেশি মদ খেয়ে পা টলমল করে। পরনের পাঞ্জাবিতে পানের পিক থাকে আর ঘরে ঢুকে রুগ্ন স্ত্রীকে মারধর করে। এভাবেই তাদের উদ্দেশ্যহীন জীবন চলে যায়। প্রতিদিন একটি মেয়ের উপর নির্যাতন করে এসে ক্লান্ত হয় না। পরদিন আরো উদ্দম বেগে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এটিও এক ধরনের তৃষ্ণা। আর তার রুগ্ন স্ত্রীটি নারী

নির্যাতনের শিকার। সেও তার সত্তার কথা ভুলে গিয়ে পড়ে পড়ে মার খায় কিন্তু কেরানিকে ছেড়ে যায় না। তার তৃষ্ণার্ত মন এত নির্যাতনের পরও এ সংসারে পড়ে থাকে।

এ উপন্যাসের আর একটি চরিত্র নাচের মেয়ে সেলিনা। হলুদ রঙের দেহ, যৌবনবতী। বাদামী রঙের গাঢ় অধর। এ বাড়িতেই তার নাচের আসর হয়। সে শওকতকে লক্ষ্য করতো। চোখ রাখতো কখন কোথায় যায়। ভয় দেখাতো মার্থার ব্যাপারে। আবার ভেতরে ভেতরে তৃষ্ণিত হয়েছিল তার প্রতি। আর যখন শওকত দরজা ভেঙ্গে কেরানীর ঘরে ঢুকে টেবিলে পড়ে থাকা ধারালো দা দিয়ে তাকে কুপিয়ে হত্যা করে দিশেহারা তখন তার হাত ধরে সেলিনা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। শহর ছেড়ে গ্রামে। সেখানেও তাদের রক্ষা হল না আইনের হাত থেকে।

উপন্যাসের একটি চরিত্র মাওলানা সাহেব। তিনটি বিয়ে করেছে সে। বাড়ির মধ্যে নানা রকম অপকর্ম, খলিলের স্ত্রী অন্যের সঙ্গে থাকা, বাড়িতে নাচের আসর বসা, বৌ-মারা কেরানির বউয়ের উপর নির্যাতন কিছুই তার চোখে যায় না। অথচ শওকত ও মার্থার পরিচ্ছন্ন মেলামেশাকে কটাক্ষ করে। তেমনি আঠারো জোড়া আইনের পা ধারী ভূতেরাও এসব কার্যকলাপ চোখে দেখে না। কিন্তু যারা দুমুঠো অন্যের জন্য একটু প্রশস্তির জন্য সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ঝরায় তাদের কোন কাজে ত্রুটি পেলে তাদের চারপাশ বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ায়, চোখ রাঙানি দেখায়, নানা ভাবে হেনস্ত করে।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রয়েছে– চায়ের দোকানদার নওশের আলী, মার্থার মা, নিগ্রো লোকটি, পিটার গোমেস, বউমারা কেরানী, তার রুগ্ন বউটি, মতিন সাহেবের মেয়ে জাহানারা, আজমল আলীর ছেলে হারুন, বিশ্বাস ঘাতক খালিদ খান, মহসিন মোল্লা, তার স্ত্রী আয়েশা, বাড়িওয়ালা, রাতকানা লোকটি, জুয়াড়ি দল। গল্পের প্রয়োজনেই সংযোজিত হয়েছে। তাদের সবাই কোন না কোনভাবে তৃষ্ণাতপ্ত। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে যায় অতৃপ্ত বাসনা পূরণের জন্য তবু ক্লান্তি নেয়, তৃষ্ণার অবকাশ নাই।

এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রকরণ কৌশলেও অভিনব। গল্পের শেষ থেকেই উপন্যাস শুরু করেছেন। অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য দিয়ে তিনি যেমন জীবনে সুগভীর অভিব্যঞ্জনা, বাস্তবিক জ্ঞান পরিধি বিধৃত করেছেন তেমনি সুতীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সামাজিক হৃদয়হীনতা, পাশবিক নির্যাতন, অবক্ষয় আর অন্ধকারের কদর্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। মূলত 'এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জহির রায়হান অমানবিক, অসামাজিক, পাশবিতার বিরুদ্ধে কঠিন প্রত্যয়ে দাঁড়িয়েছেন।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০০৮ : ২০৮)। সমাজের কঠিন বাস্তবতাকে চমৎকার ভাষাভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের সুষমবিন্যাসের মাধ্যমে গল্পের বর্ণনা পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি এমন :

সহসা গাছের ডালে বুনো পাখির পাখা ঝাঁপটানোর শব্দ শোনা গেলো। মটরশুটির ক্ষেত থেকে একটা সাদা ধবধবে খরগোশের বাচ্চা ছুটে পালিয়ে গেলো কাছের অরণ্যের দিকে।

খড়ের কোলে জেগে উঠলো অনেকগুলো পায়ে ঐক্যতান। সমতলে এগিয়ে এলো ওরা। যেখানে ছেলেটি আর মেয়েটি এই পৃথিবীর অনেক চড়াই উৎরাই আর অসংখ্য পথ মাড়িয়ে এসে অবশেষে এই সিগ্ধ সকালের সোনা-রোদে পরস্পরের কাছে অঙ্গীকার করে ছিলো।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ১০৭)

উপন্যাস বর্ণনায় অসাধারণ চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, যার বিচ্ছুরণ এমন :

'তখনো সারা গাঁয়ে নবান্নের উৎসব। চাষী-বউরা, রসের সিন্নি রেঁধে মসজিদে পাঠাচ্ছে। বাড়ি বাড়ি নতুন গুড়ের পিঠে তৈরি করছে ওরা। রাতভর পুঁথি পড়া আর কবি গানের আসর।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১২০)

বর্ণনাভঙ্গিতে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে মাঝে মাঝে আবার তিনি প্রতীকেরও ব্যবহার দেখিয়েছেন। যথা : 'সারা বাড়িতে গোরস্থানের নীরবতা আর কবরের মতো অন্ধকার।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৩০)

আবার কাহিনীর বক্তব্যকে সুনিপুণভাবে উপস্থাপনার জন্য বহু উপমা, উৎপেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে। এ উপন্যাসে বর্ণিত উপমাগুলি এমন :

- পুরু ঠোঁট জামের মতো কালো। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১১০)
- অন্ধকারে একটা দীর্ঘ ছায়ার মতো দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে মার্থা। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৩০)
- কাঁচা হলুদের মতো যার গায়ের রঙ। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১২৭)
- সূর্যাটি আগুনের মতো জ্বলছে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫০)

আবার বক্তব্যকে রসালো শ্রুতিমধুর করতে কখনো কখনো প্রবাদ প্রবচনও ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত প্রবাদগুলি এমন :

- আমিতো কাউকে নিয়ে মাথা ঘামাইনে। কারো পাকা ধানে মই দেইনে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১১০)
- ভয়ের রাক্ষস তাড়া করছে ওকে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৪০)

নামকরণেও লেখক দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন। এ উপন্যাসটির নাম 'তৃষ্ণা' যার অর্থ প্রবল আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা। লেখক প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে তাদের মানসিক শারীরিক কামনা বাসনা বা ইচ্ছার কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষ সর্বদা টিকে থাকে স্বপ্ন পূরণের জন্য। জীবনের একটি চাহিদা পূরণের সাথে সাথে অন্য চাহিদার জন্ম নেয়। সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কিন্তু ইচ্ছার শেষ হয় না। লেখক শওকতের উক্তিতে মার্থা সম্পর্কে বলেছেন: 'আশ্চর্য! কী লাগামহীন স্বপ্ন দেখতে পারে মানুষ। দু-মাসের আগাম ভাড়া দেড়শ টাকা হাতে নেই। তিন হাজার টাকা দিয়ে দোকান কেনার জন্যে উতলা হয়ে পড়েছে মার্থা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৪৩)

এভাবে লেখক এ উপন্যাসে মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করেছেন। মানুষ একটি স্বপ্নের পর অন্য স্বপ্নের অট্টালিকা গড়ে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে। লেখক সেই দার্শনিক চেতনা থেকেই এ উপন্যাসের নামকরণ করেছেন। এদিক থেকে উপন্যাসটির শিরোনাম যথার্থ ও বর্ণনা উপযোগী হয়েছে।

জহির রায়হান বাস্তবতার কঠিন ভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবনের কথা বলতেই অভ্যস্ত। সেইসূত্র ধরে 'তৃষ্ণা' নামক উপন্যাসে জীবনের ক্ষয়ে যাওয়া ধ্বংস প্রাচীরের বর্ণনা দিয়েছেন। স্বাভাবিক চোখে হয়তো সবসময় জীবনের কদর্য রূপটি আমরা দেখতে পায় না। কিন্তু সাদার উল্টা পিঠে যেমন কালো থাকে তেমনি শিল্প সাহিত্যকরাও তাঁদের তৃতীয় অনুসন্ধানী চোখ দিয়ে জীবনের ভালমন্দ উভয় রূপকে বিধৃত করেন শিল্পকর্মে। জহির রায়হান স্বাভাবিক, সুন্দর জীবন বর্ণনাকে উপেক্ষা করে তার বিকৃত, অস্বাভাবিক, অনুদার বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে। এখানকার সমাজ স্বাভাবিক সমাজ নয়। কুষ্ঠো রোগীর মতো বিকলঙ্গ সমাজ, যেখানে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর মানুষের ঝগড়ার মধ্যে তফাত নেই। যেখানে পরিচ্ছন্ন হয়ে বসবাসে কোন সার্থকতা নেই, আইনের যথার্থ প্রয়োগ নেই, আছে শুধু স্বার্থপরতা, পরশ্রীকতরতা, পরচর্চা, অনৈতিক চলাফেরা, অবৈধ সম্পর্ক, জুয়ার আড্ডা, হৃদয়হীনতা বা নিষ্ঠুরতা। এ সমাজে ভাল মানুষের ঠাঁই নেই। যারা আসে তারাও বিষাক্ত জীবাণুর সংক্রমণে পচে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। সেখান থেকে তারা আর স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। যেমনটি হয়েছে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা শওকত আর মার্থার ক্ষেত্রে। তারা একটি সুন্দর সকালের স্বপ্ন দেখেছিল, একটি ছোট্ট সংসারের আশা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের স্বপ্ন হালে পানি পেল না। চুরি করে একজন গেল জেলে, আরেক জন খুনের দায়ে পলাতক হলো। এসব ঘটনার সারমর্মে ঔপন্যাসিক ইঙ্গিত করেছেন রাজনীতিকে। রাজনীতি সচেতন শিল্পী কাহিনীর উপযোগী করে অতি অল্প কথায় রাজনীতিকেও অনুষঙ্গ করেছিলেন। আর তিনি সেখানে যে সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন সেটি যুদ্ধ প্রসূত ফসল।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় এবং ষাটের দশকে এদেশীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁকে শঙ্কিত করেছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তাড়না থেকেই 'তৃষ্ণা' উপন্যাসে শাণিত লেখনীর মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্প সৌন্দর্যের মাধ্যমে।

উপন্যাসের ঘটনাকে বেশি বিস্তৃত করেন নি। নওশের আলীর চায়ের দোকান, বস্তি বাড়ি, রাতকানা লোকের ঔষুধের দোকান, রাস্তা এমন কয়েকটি জায়গায় ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে। লেখক এই স্বল্প পরিসরেই তার বক্তব্যের গূঢ়ার্থ বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। তবে বর্ণনার মধ্যে গভীরতা খুব কম। নায়ক নায়িকার এত সংগ্রামকে তিনি যেন অতি স্বাভাবিক ভাবেই বলে গিয়েছে। তাদের কষ্ট বা সংগ্রামের নির্মম চিত্র ও অনুভূতির যথার্থ প্রয়োগ অনুপস্থিত। এছাড়া কাহিনীর গভীরতা আনতে বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত করতে পারতেন। কিন্তু লেখক সেটি এঁড়িয়ে গিয়েছেন। তবে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যদিয়েই আমরা তৎকালীন সমাজের একটি সাম্যক ধারণা লাভ করি। মূলত এ উপন্যাসে লেখক অতি

সাধারণ বর্ণনা ভঙ্গীতে মানব জীবনের অসুস্থ, অবক্ষয়িত, অবিচ্ছিন্ন দিকটি বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে বের হওয়ার আশাবাদী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন বুড়ো রাতকে বিদায় দিয়ে একটি সুন্দর সকালের। সেখানে বৃষ্টি সব আবর্জনা ধুয়ে মুছে ছাপ করে আলো আর স্নিগ্ধ সকালের সোনারোদে সমাজের মানুষ স্নান করবে, আবার যেখানে নিশ্চিন্তে বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে পারবে।

উপর্যুপরি বর্ণনা শেষে বলা যায়, 'তৃষ্ণা' উপন্যাসে জহির রায়হান বাহ্যিক, রূপায়বয়বের চেয়ে সমাজবাটিতে বসবাসকারী মানুষের অভ্যন্তরীণ বিমূঢ় রূপটিকেই চিত্রিত করেছেন। তাঁর প্রাঞ্জল, সরল, স্বাভাবিক ভাষা উপন্যাসটিতে নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। সহজ, সাবলীল ও ক্ষুদ্র বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ উপস্থাপন করেছেন। মোটকথা, জহির রায়হান 'তৃষ্ণা' উপন্যাসে মানব জীবনের নানান টানাপড়েন, যন্ত্রণা, অসীম স্বপ্ন, অতৃপ্ত বাসনা ও অপূরণীয় তৃষ্ণার সুনিপুণ শিল্পাবয়ব অঙ্কন করেছেন যা অতি গভীর বিশ্লেষণ না হলেও পাঠকসমাজে বোধগম্য ও সমাদৃত।

হাজার বছর ধরে

জহির রায়হানের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে'। ১৯৬৪ সালে সন্ধানী প্রকাশনী গ্রন্থটি প্রকাশ করে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-দারিদ্র, সংস্কার-সংকীর্ণতা, প্রেম, মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রভূমি উপন্যাসটি। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল তথা কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের মাঝামাঝি একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। মূলত আঞ্চলিক পটপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে লেখক দেখিয়েছেন বৈচিত্রহীন নিস্তরঙ্গিত বাংলার পল্লীসমাজের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখে পরিপূর্ণ প্রাত্যহিক জীবনের গতিশীল রূপ। সেকারণে উপন্যাসের চরিত্রগুলি একটি নির্দিষ্ট স্থান বা কালের না হয়ে আবহমান গ্রাম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছে। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিল্পী জহির রায়হান এখানে গ্রাম জীবনের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার বর্ননা করতে গিয়ে মূলত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থ বেদনার গাঢ় নীল রঙ প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সময়ের নির্দিষ্ট গতির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বরং চলমান গতিচ্ছবিকেই তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। শুরুতেই তিনি ইতিহাসচারী হয়ে বলেছেন :

> মস্ত বড় অজগরের মতো সড়কটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে।
>
> মোঘলাই সড়ক।
>
> লোকে বলে, মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে শাহ সুজা যখন আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন যাবার পথে কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে তৈরি করে গিয়েছিলো এই সড়ক।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৫)

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সাহিত্যের অধিকাংশই গ্রামকেন্দ্রিক। উদাহরণস্বরূপ উপন্যাসের গোড়াপত্তনকারী প্যাঁরিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭) গ্রামভিত্তিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) গ্রামকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসগুলি গ্রাম ও শহরের সংমিশ্রণে রচিত। অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'পল্লী সমাজ' (১৯১৬), 'দেনা পাওনা' (১৯২৩), প্রভৃতিতে গ্রামীণ জীবনই দৃশ্যায়িত। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'গণ দেবতা' (১৯৪২), অদ্বৈত্বমল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), সৈয়দ ওয়ালীউল্লার 'লালসালু' (১৯৪৮), আবু ইসহাকের 'সুর্য দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫), শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সারেং বৌ' (১৯৬২), প্রভৃতি গ্রাম বাংলার এক একটি দৃশ্য চিত্রণ। অন্যদিকে জহির রায়হানেরও একমাত্র গ্রামভিত্তিক উপন্যাস 'হাজার বছর ধরে'। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলতে এটিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে।

গ্রামবাংলার বিস্তৃত বাস্তবতায় মর্মান্তিক চিত্র ফুঠে উঠেছে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে। তাঁর অন্যান্য সার্থক উপন্যাসের মতো এখানেও তিনি পরিশীলিত, মননশীল চিন্তন ব্যবহার করেছেন, পরিমিত আবেগে সিক্ত করে আন্তকিতার ছোঁয়া লাগিয়ে হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষতা প্রকাশ করেছেন।

গ্রামীণ লোক-গাথা, পুঁথি পড়ার আসর, বিয়ের কথাবার্তা পাকা করার বিশেষ দৃশ্য, বিয়ের গান, ভূতে পাওয়া বা ভূত ছাড়ানোর কাহিনী, ঢেঁকিতে ধান ভানার বর্ণনা, রাত জেগে চুরি করে পরের পুকুরে মাছ ধরার ইতিবৃত্ত, গ্রামে কলেরা রোগের আক্রমণ, সেই সঙ্গে কুসংস্কার ভরা গাল-গল্প প্রভৃতি কাহিনী অত্যন্ত সহানুভূতি ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক এই ছোট গ্রন্থটিতে। সমস্ত উপন্যাসটি যেন একটি গীতময় কাব্য হয়ে উঠেছে। ঘটনার দিক থেকে মন্তু ও টুনির পরকীয়া প্রেম অবশ্য এক তরফা, বুড়ো মকবুলের তরুণী স্ত্রী টুনির দিক থেকে, পরবর্তীতে মন্তু ও আম্বিয়ার সহজ সলাজ প্রেমানুভূতির উন্মেষ, বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার উপখ্যানের মধ্য দিয়েই লেখক হাজার বছরের পুরানো বাংলা ছবির অবিকল চিত্র প্রকাশ করেছেন। যদিও ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষবিন্দু ছিল টুনি আর মন্তু তথাপি, তিনি সমাজের সার্বিক চিত্র ফুটিয়ে তুলতে বেশ কিছু পরিবারের নিত্যদিনের জাপিত জীবন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে এনেছেন। এক্ষেত্রে দুইটি বাড়ির উল্লেখ রয়েছে- শিকদার বাড়ি ও মাঝি বাড়ি। এদের মধ্যে শিকদার বাড়ির প্রধান পরিবার হল বুড়ো মকবুলের। সংসারে তার তিন বউ– আমেনা, ফাতেমা ও টুনী এবং একমাত্র মেয়ে হীরন। বড় বউ আমেনার বয়স ত্রিশের কোঠায়, কালো মোটা আর বেঁটে। ঘন ঘন কথা বলে এবং কথা বলার সময় পোকায় খাওয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ছিটিয়ে সামনের লোকদের ভিজিয়ে দেয়। মেজোবউ ফাতেমা, রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। বছরে তিন মাস পেটের অসুখে ভোগে। ছ-মাস বাপের বাড়ি কাটায়। বয়সের হিসেবটা সে নিজেও জানেনা। আর সবার ছোট টুনি তাঁর সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য এমন : 'গায়ের রঙ কালো। ছিপছিপে দেহ। আয়ত চোখ। বয়স তার তেরো-চৌদ্দের মাঝামাঝি। সংসার কাকে বলে সে বোঝে না। সমবয়সী কারো সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু ভুলে গিয়ে মনের সুখে গল্প জুড়ে দেয়। আর হাসে। হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৮)

বুড়ো মকবুলের পরিবারের আরেক সদস্য তার বড় বউয়ের সন্তান দশ কি এগারো বছরের হীরন। এখন থেকেই বাবা তার বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। প্রতিবেশীদের তুলনায় একটু অবস্থাপন্ন তিনি। তবে তিন বউকে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো জমিজমা নেই তার। তাই বউদের আয় দিয়েই সংসার চলে। দুই বউকে ঢেঁকির উপর তুলে রাত জেগে ধান ভানে। তাছাড়া মকবুল লাঙ্গলের গরু ও স্ত্রীদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য করেনা। স্ত্রীদেরকে দিয়ে লাঙ্গল চাষের কাজও করাতে চায় যদিও লোক নিন্দার ভয়ে করেনি তবে জমিতে মাটি কুপিয়ে ফসল ফলাতে তার স্ত্রীদের ব্যবহার করে। বর্ণিত আছে :

> ফসলের দিন সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায়, তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও। বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির উপরে যে ছোট জমিটা রয়েছে তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয়। মকবুল নিজেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মাটি কুপিয়ে কুমড়ো আর শিমের গাছ লাগায়।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৮)

মকবুলদের বাড়ির নাম শিকদার বাড়ি। এই বাড়িতে মোট আটটি পরিবার বাস করে। মকবুল সাহেব এ বাড়ির বড় কর্তা। সবাই তার আদেশ উপদেশ মেনে চলে।

মকবুল সাহেবের পরের ঘরটি ফকিরের মার। তার এক মাত্র ছেলে অনেক ছোট থাকতেই মারা গেছে। স্বামীও বেঁচে নাই। স্বামী আর ছেলের মৃত্যু শোক নিয়ে তার পথ চলা। সবার বিপদে এগিয়ে আসে সে। এমনকি কারো দুঃখে তার চোখ থেকে আগে পানি পড়ে। লেখক অনেক আবেগময় করে চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন।

ফকিরের মার পাশের ঘরটি আবুলের । পেশায় সে কৃষক। তারও তিনটি বউ। আয়েশা, হালিমা ও সালেহা। একটি স্ত্রীও বেশি দিন টেকে নি তার সংসাওে; আবুল কারণে অকারণে স্ত্রীদের প্রচণ্ড প্রহর করে। লেখক বর্ণনা করেছেন : 'বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। পান-বিড়ির মতো এও যেন একটা নেশা হয়ে গেছে ওর। মেরে মেরে এর আগে দু-একটা বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৬৩)

আবুলের পরের ঘরটা রশিদের। স্ত্রী সালেহাকে নিয়ে তার ছোট সংসার। পেশায় সেও কৃষক। বুড়ো মকবুলের চাচাতো ভাই মন্তু। তার কোন জমিজমা নেই। পরের জমিতে খেটে রোজগার করে। লাঙল চষে। ধান বোনে আবার সে ধান পাকলে কেটে এনে মালিকের গোলা ভর্তি করে। তারপর ধানের মরশুম শেষ হয়ে গেলে কলাই, মুগ, তিল, সরিষার ক্ষেতে কাজ করে। মাঝে মাঝে লাকড়ি কাটার চুক্তি নেয়। এছাড়াও কিছু কাল মাঝি বাড়ির নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখের সঙ্গে নৌকায় গিয়েছিল সে। এভাবে তার জীবনতরী চলতে থাকে। তার সম্পর্কে লেখক বর্ণনা করেছেন :

> একা মানুষ। বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই। বাবাকে হারিয়েছেও জন্মের মাসখানেক আগে। মাকে দশ বছর বয়সে। লোকে বলে, মন্তু নাকি বড় একগুঁয়ে আর বদমেজাজি স্বভাবটা ঠিক জানোয়ারের মতো।
> টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ নাকি ও জন্মে আর দেখিনি সে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৮)

পশ্চিম পার্শ্বের দক্ষিণের ঘরটা মনুর। তার পার্শ্বেরটা সুরত আলীর। তারা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে জমিতে, রাতে খাবার শেষে সুরত আলী বসে সুর করে পুঁথি পড়ে আর বাড়ির সবাই নীরব হয়ে শোনে। শিকদার বাড়ির আরেক পরিবার হল গণু মোল্লার পরিবার। গণু মোল্লা নির্ভেজাল লোক। কারো সাথে পাঁচে থাকেনা। জমিজমা নাই। চাষবাসের প্রশ্ন ওঠেনা। সারাদিন খোদার এবাদত করে। যেখানে যায় তসবির ছড়টা হাতে থাকে তার। পেশায় সে কবিরাজ। তাবিজ বিক্রি করে টাকা উপার্জন করে।

এমন আটটি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠেছে শিকদার বাড়ি। যার গোড়া পত্তন আশি কি খুব জোর নব্বই বছর হবে। তেরশত সনের বন্যায় বুড়ো কাশেম শিকদার কুলাউড়া থেকে ভাসতে ভাসতে পরীর দীঘির পাড়ে এসে ঠাঁই নেয়। আর এই দীঘির পাড়েই তাদের আবাস গড়ে ওঠে। এভাবেই শিকদার বাড়ির উত্থান হয়।

এ উপন্যাসে আরো একটি বাড়ির উল্লেখ রয়েছে মাঝি বাড়ি নন্তু শেখ, করিম শেখ ও আম্বিয়াদের বাড়ি। ওলার প্রাদুর্ভাবে এ বাড়ির অধিকাংশ লোক মারা যায়। ঔপন্যাসিক এসব পরিবারের মধ্যে দিয়ে বাংলার সাধারণ সরল, দরিদ্র, অসচ্ছল গ্রামীণ মানুষদের জীবন ফুটিয়ে তুলেছেন।

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটিতে বির্জলা হাজার বছরের বাংলাদেশের গ্রাম জীবন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এখানে লেশমাত্র তত্ত্ব বা মতবাদের জটিল জালের বিস্তার নাই, বরং সমাজ বাস্তবতার সহজ সরল, সরস, অনায়াস, দরদী হৃদয়ের আবেগ দিয়ে বসনীরূপ দান করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি বাংলার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন। উপন্যাসটি শুরুই করেছেন ঐতিহাসিক কংবদন্তী দিয়ে। বর্ণিত আছে :

> মস্ত বড় অজগরের মতো সড়কটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে।
>
> মোঘলাই সড়ক।
>
> লোকে বলে, মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে শাহ সুজা যখন আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন যাবার পথে কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে তৈরি করে গিয়েছিলো এই সড়ক।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৫)

উপন্যাসটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে পরীর দিঘির পাড় ঘেষে গড়ে ওঠা দুইটি একান্নবর্তী পরিবারকে ঘিরে যারা পরবর্তীতে মোট নয়টি পরিবারে বিভক্ত হয় ।এ উপন্যাসের সকলেই নিম্নবিত্ত শ্রেণির। চাষাবাদই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। নারী পুরুষ সকলে মিলে উপার্জন করতো। বৈরি প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর্থিক অস্বচ্ছলতা আর পারস্পরিক আনন্দ কলহ বিবাদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে তাদের জীবন সংগ্রাম। পারস্পরিক মনোমালিন্য সত্ত্বেও বাড়ির সম্মানের প্রশ্নে তারা এক আত্মা এক প্রাণ। লেখক যে গ্রামীণ কাঠামো বর্ণনা করছেন সেখানে শোষণ আছে, জোতদার আছে, জমিদার আছে, নিষ্ঠুরতা আছে আর ঐতিহ্যের মধ্যে সজীব হয়ে রয়েছে কেচ্ছা-কাহিনী, পুঁথিপাঠ হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ, প্রেম-বিরহ, লোভ-সরলতা-কূটিলতা, জন্ম মৃত্যু, রোগ-শোক, আনন্দ-বিরহ উৎসব প্রভৃতি। এই জীবনযাত্রা আবর্তিত হয়েছে পরীর দিঘির পাড় ঘেষে। কিংবদন্তী আছে এ দিঘি এক সময় ছিল না আকাশ থেকে পরী এসে একটি দিঘি খনন করে। তবে দিঘির জন্মকথা জানা গেলেও গ্রামটির জন্মকথা জানা যায়নি। এই দিঘির পাড়েই গড়ে উঠেছে শিকদার বাড়ি। অন্যদিকে শিকদার বাড়ির এক বাসিন্দা সুরত আলী। খুব সুন্দর করে পুঁথি পড়ে। জোছনা রাতে খোলা উঠানে বসে সুর করে গাজী কালু চম্পাবতী, ভেলুয়া সুন্দরী ও কমলা বিবির পুঁথি পড়ে। 'এই সব কেচ্ছা কাহিনী আবহমান বাংলার লোক ঐতিহ্যের মানসে জন্ম নিয়েছে লোক পরম্পরা। গ্রাম বাংলার আবহমান ঐতিহ্যের গভীরে কাঁদা মাটির মত, আলো-বাতাসের মত লেপ্টে আছে যে সুখ-দুঃখ, শোক, বিরহ, রোগ-শোক, বিচ্ছেদ বেদনা তাকেই জহির রায়হান দক্ষ শিল্পীর তুলিতে তুলে ধরেছেন।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৪৯)

এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ পেশায় কৃষক। যাদের জমি আছে তারা নিজ জমিতে ফসল ফলায় আর যাদের জমি নেই তারা অন্যের জমিতে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে মালিকের গোলা ভরে। আবার অনেকে ফসলের মৌসুমের পর নৌকায় কাজ নেয়। কেউবা নিজের নৌকা নিয়েই গঞ্জে যায়। আবার কেউ কৃষি কাজ বাদ দিয়ে কবিরাজি পেশা বেছে নেয়। এভাবে তিনি গ্রামীণ নানা পেশার উল্লেখ করেছেন। এখানে শুধুমাত্র পুরুষেরাই উপার্জন করে তা নয় অনেক নারীও সংসার চালানোর জন্য কাজ করে। মকবুল তার তিন স্ত্রীকে দিয়ে উপার্জন করিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীদের নিয়ে জমিতে ফসল ফলিয়েছে। আবার বাড়িতে নানা হাতের কাজের জিনিস তৈরি করে উপার্জন করিয়েছে। তাদের সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে :

> বড় দুই বউ দিব্যি আয় করে। বাজার থেকে পাতা কিনে এনে দিয়েই খালাস মকবুল। দুই বউ মিলে একদিনে তিন-চারটে চাটাই বুনে শেষ করে। মাঝে মাঝে টুনিও বসে পড়ে ওদের সঙ্গে। কাজ করে। চাটাইগুলো বাজারে বিক্রি করে লাভের অংশ দিয়ে পেঁয়াজ লঙ্কা আর পান সুপুরি কেনে মকবুল।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৮)

'শ্রমনির্ভর এ সমাজের পরিবারে নারীকে যে পরিণত করা হয় ভারবাহী পশুতে তারই এক মর্মন্তুদ চিত্র মূর্ত হয়েছে এ উপন্যাসে।' (ছন্দশী পাল ২০০৯ : ১১২)। শুধু তাই নয় পুরুষের আধিপত্যে নারীর বিপন্ন অস্তিত্ব, অসহায়তা ও মূল্যহীন দিকটিও ফুটে উঠেছে এখানে। কথায় কথায় ধমক খেতে হয় এখানকার নারীদের। এমনকি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় অধিকাংশ নারী। বউ মারার মতো পাশবিক অমানবিক দিকটিও ফুটে উঠেছে এখানে। স্ত্রী মারার মতো জঘন্য কাজ করেও পুরুষদের কোন অনুসূচনা নাই। বরং এটিকে তাদের কৃতিত্ব মনে হয়। আবুলের কথায় আমরা সেই মানসিকতাই দেখতে পাই : 'আইজ আর ছাড়ি নাই ভাবী। যতক্ষণ পারছি মারছি। মারাছি ঠিক করছি, না মারলে আস্কারা পাইয়া যাইতো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৬৫-৬৬)

গ্রামীণ পরিবারে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল যার বর্ণনাও লক্ষ্য করা যায়। আমরা দেখেছি কাশেম শিকদার দুই বিয়ে করেছে। আবার মকবুল একই সঙ্গে তিন স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করেছে। তাছাড়া আবুলও তিনটি বিয়ে করেছিল।

শুধু বহু বিবাহ নয় সে সময় বাল্যবিবাহ ও পণপথার প্রচলন ছিল যার উল্লেখ রয়েছে এ উপন্যাসে। মকবুলের পঞ্চাশের কোঠায় বয়স হওয়ার পরেও মাত্র তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের টুনিকে বিয়ে করে। আবার দেলমোহর হিসেবে প্রত্যেক স্ত্রীকে পুরো চার টাকা দিয়েছিল। অন্যদিকে তার কন্যা হীরনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় মাত্র এগারো বছর বয়সে বিয়ে ঠিক করে। এছাড়া বিয়ের সময় পণ দেওয়া নেওয়া নিয়ে তর্ক বাধে। বর্ণিত আছে : 'মাঝরাত পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর সোয়া এগারো টাকায় মিটমাট হলো সব। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে মেহমানরা বিদায় নিয়ে গেলো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৮১)

তৎকালীন সময়ে নারীদের অবস্থান যে সমাজের তলানীতে তার প্রমাণ মেলে বৃদ্ধ বয়সে আমেনা ও ফাতেমাকে তালাক দেওয়ার মাধ্যমে। তিন স্ত্রী থাকার পরও আরেক বিয়ে করায় বাধা দিলে তাদেরই সংসার ত্যাগ করতে হয়। লেখক নারীর অবমাননাকর দৃশ্য বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'পরদিন বিকেলে খবর পেয়ে আমেনা আর ফাতেমার বাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে গেলো ওদের। যাবার সময় করুণ বিলাপে পুরো গ্রামটিকে সচকিত করে গেলো। এতদিনের গড়ে তোলা সংসার এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২১২)

এ সমাজে নারীর চাওয়ার কোন মূল্য নাই, তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন নাই। তাদের অনুভূতি যেন ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে শিকদার বাড়ির পাশে মাঝি বাড়ির মেয়ে আম্বিয়ার গানে : 'স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুধের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেলো বইলারে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৭)। সমাজ-সংসারের অন্তরালে বন্দী নারীর অচরিতার্থ ব্যর্থ যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের বেদনাকরুণ অসহায় আর্তনাদ ফুটে উঠেছে এখানে।

গ্রামীণ অন্ধকার সমাজে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এ উপন্যাসেও আমরা তেমন কুসংস্কারের উল্লেখ দেখি। উপন্যাসের প্রথমেই পরীর দিঘি নিয়ে প্রচলন রয়েছে যে, আকাশ থেকে পরীরা নেমে একরাতেই দিঘি খনন করেছে। তাছাড়া মজু ব্যাপারীর মেয়ে গাছে উঠলে তাকে সবাই ভূতে পেয়েছে বলে আখ্যা দিয়েছে। ভূত তাড়ানোর জন্য আবার কবিরাজের কাছে গিয়েছে। কলেরা একটি ছোঁয়াচে রোগ। তখনকার সময়ে নিরাময়ের ঔষধ তৈরি না হওয়ায় একজনের কাছ থেকে অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো এবং অনেক লোক মারা যেত। সেটিকে নিয়ে গ্রামের লোকেরা কুসংস্কারপূর্ণ কথা তৈরি করেছে মাঝি বাড়ি এই রোগের প্রাদুর্ভাব হলে ফকিরের মা বলেছে : 'বড় খারাপ দিনকাল আইছে বাপু। যেই বাড়িডার দিকে একবার নজর পড়ে সেই বাড়িডারে এক্কেবারে শেষ কইরা ছাড়ে ওলাবিবি। বড় খারাপ দিনকাল আইছে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৯৯)

এছাড়া শ্রেণিচেতনার আভাসও রয়েছে কোথাও কোথাও। খাজনার টাকা না জোটাতে পেরে সুরত আলী তার জমি বিক্রি করে দিয়েছেন বড় মিয়ার কাছে। এখন পরের জমিতে তথা (এক কালে নিজের ছিল) খাটতে

গিয়ে তার বুকটা ব্যথায় টন টন করে। তার দুঃখ প্রকাশ করেছে মন্তুর সামনে :

> খোদার ইচ্ছা অইলো, জমিগুলান আমার থাইকা কাইড়া নিলো। খোদার ইচ্ছা অইলো জমিগুলো বড় মিয়ারে দিয়া দিলো। জমির লাইগা যার একটুও মায়া দয়া নাই তারেই দিলো খোদা দুনিয়ার সকল জমি। এইডা কেমন তরো ইনসাফ, অইলো মন্তু মিয়া? ইনসাফ ইনসাফ করো মিয়া। এইডা কেমন তরো ইনসাফ অইলো অ্যাঁ?
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২০৫)

কিন্তু শ্রেণি সংগ্রামের কোন প্রতিবাদ এখানে উল্লেখ নেই। কারণ বিদ্রোহী মনোভাব এই গ্রন্থের মূলসুর নয়।

কিংবা গ্রামীণ সহজ সরল মানুষের সব কিছু মেনে নেওয়ার বৈশিষ্টই প্রত্যক্ষিত হয়। মূলত লেখক গ্রাম বাঙলার চিরন্তন রূপকে তুলে ধরেছেন, যেখানে মানুষ আপোষকামী পরিচিতি গণ্ডিতে আবদ্ধ, সকল অপ্রাপ্তি, গঞ্জণা সহ্য করে নিস্তরঙ্গ চিত্তে জীবন অতিবাহিত করে।

গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-সুখ, সংস্কার-সংকীর্ণতা বর্ণনা করলেও ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্যবিন্দু ছিল টুনি এবং মন্তুর প্রেম। এদের মধ্যে মন্তু পিতৃ-মাতৃহীন-ভূমিহীন-শ্রমজীবী যুবক আর টুনি অজপাড়াগাঁয়ের দরিদ্র পিতামাতার ঘরের রূপযৌবন ভরা যুবতী। চোখ ভরা তার অফুরন্ত স্বপ্ন। নদীর ছোট ছোট ঢউয়ের মতো উচ্ছলিত হওয়াই তার স্বভাব। মন্তুর সঙ্গে টুনির সম্পর্কটি, প্রেমেরই বলা যায়। তাদের নৈশবিহার, শাপলা তোলা, মাছ ধরা, খেজুরের রস চুরি করা সবই নৈশ অভিসারের শামিল। ঔপন্যাসিক তাদের নৈশ অভিসারের বর্ণনা দিয়েই উপন্যাসটি শুরু করেছেন :

> কিন্তু এমনও অনেকে এখানে শাপলা তুলতে আসে। বাজারে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করা যাদের ইচ্ছে নয়।
> মন্তু আর টুনি ওদেরই দলে।
> ওরা আসে ধল প্রহরের আগে, যখন পুব আকাশে শুকতারা ওঠে। তারা ঈষৎ আলোয় পথ চিনে নিয়ে চুপিচুপি আসে ওরা। রাতের শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে ধীরে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৫)

'কাউকে না জানিয়ে, গোপনে, জোছনা রাতে ধানক্ষেত্রে যেয়ে শাপলা তোলা, পরের পুকুরে মাছ ধরা কিংবা গভীর রাতে বাপের বাড়িতে খেজুরের রস পাড়া, এসব উচ্ছল, প্রাণবন্ত মেলামেশার মধ্যে গ্রামীণ দুটি কিশোর কিশোরীর নিটোল প্রেমের ছবি ফুটে উঠেছে।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৫১)। তাদের এই কাছে আসা আরও গভীর হয় মন্তু যখন টুনিকে বাপের বাড়ি আনতে গিয়েছিল। সম্পর্কে তারা দেবর-ভাবি। তবে টুনির বাপের বাড়ি থেকে আসার সময় যখন শান্তির হাটে এসে থেমে ছিল, তখন অনেকে তাদেরকে স্বামী স্ত্রী ভাবতে থাকে। হয়তো তাদের বাসনাও এমন ছিল। তাই লোকে ভুল ভাবলেও তারা শুধ্রিয়ে দেয়নি। এসময় তারা আরও ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের গাঢ় সম্পর্কের বর্ণনায় লেখকের উক্তি :

> নিচে নামতে গিয়ে অন্ধকারে মন্তুর ফতুয়াটার একটি কোন শক্ত করে ধরে রেখেছে টুনি। একটু অসতর্ক হতে পা পিছলে যাচ্ছিলো সে। মন্তু ধরে ফেললো। মাথার আঁচলটা কাঁধের ওপরে গড়িয়ে পড়লো। একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করলো টুনি।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৯০)

সমাজের চোখে সম্পর্কটি পরকীয়া মনে হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য। বৃদ্ধ মকবুলের এমন তরুণী বউ হওয়ায় তাদের কোন সংসারিক সম্পর্ক ছিল না। তাই সংসার বঞ্চিত ভালোবাসার কাঙ্গাল টুনি সরল অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব দুর্নিবার পিপাসায় তৃষ্ণিত হয়ে মন্তুকে হৃদয়ের মধ্যে জাপটে ধরেছে। মন্তুকে হাত ছাড়া হওয়ার ভয়ে সঙ্কিত হয়েছে। তাইতো যাত্রা পালায় মেয়েদের নৃত্য দেখে মন্তু যখন আনন্দ পাচ্ছিল তখন সে রাগ করে মন্তুকে পালা থেকে

বের করে নিয়ে আসে। আবার মন্তু ভাই মরা আম্বিয়ার খবর নিতে গেলে টুনি কষ্ট পেয়েছে। হীরনের বিয়ের সময় সালেহা আম্বিয়া ও মন্তুকে নিয়ে রসিকতা করলে টুনি তাকে চুলের গোছা ধরে টেনে মাটিতে ফেলে এলোপাতাড়ি কিলঘুসি মেরে দৌড় দিয়েছে। এমন কি মন্তুকে না পাওয়ার ভয়ে সে বৃদ্ধ মকবুলকে কুপরামর্শ দিয়েছে। বর্ণিত আছে : 'চারপাশে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে কথাটা বললো টুনি। মকবুল বড় বোকা। নইলে এমন সুযোগটা কেন হেল্লায়-হারাচ্ছে সে। একটা বসতবাড়ি। একটা ক্ষেত। আর একটা নৌকো। ইচ্ছে করলে ওগুলোর মালিক সেও হতে পারে। সে কেন বিয়ে করে না আম্বিয়াকে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২০৮)

অন্যদিকে প্রথম অবস্থায় মন্তু তার মনের অবস্থা বুঝতে না পারলেও একসময় টুনিই তার জীবনময় ভরে ওঠে। তাকেই সে জীবনসঙ্গী করতে চায়। বর্ণিত আছে : 'এমনি একা জীবন আর কতদিন কাটাবে মন্তু। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবতে গেলে ইদানীং টুনি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের কথা ভাবতে পারে না সে। শান্তির হাটের সেই রাত্রির পর থেকে টুনি তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসে আছে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২০৪)

গোটা উপন্যাসের মধ্যে টুনি চরিত্রই পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখে। তার হৃদয়ের আলো-আঁধারির খেলা, মন্তুর প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ, আকস্মিক দিক পরিবর্তন অনেক সময়েই 'পদ্মা নদীর মাঝি'র কপিলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত, 'টুনি মন্তুর শান্তির হাটে অভিসার কপিলা-কুবেরের অনুরূপ।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ৪৪)

যদিও বাস্তবতা ভিন্নরূপ ধারণ করেছিল। বাস্তবতা তাদেরকে একত্রিত হতে দেয় নি, মন্তুকে বিয়ে করতে হয় আম্বিয়াকেই। কারণ টুনির নিষ্পাপ ছেলে মানুষি আনন্দে ভরা দিনগুলি হঠাৎ ভিন্ন পথে মোড় নেয়। মকবুলের আম্বিয়াকে বিয়ের প্রস্তাবে সমগ্র বাড়ি তার বিপক্ষে চলে যায়। ক্রোধে এক সময় আবুল বসার পিঁড়ি ছুঁড়ে মারে মকবুলের কপালে। রক্তাক্ত হয় সে। তারপর অসুস্থ হয়ে মারাই যায়। মকবুলের মৃত্যুর পর টুনির মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে। হঠাৎ করেই তার সকল উচ্ছলতা উবে যায়, স্বপ্নগুলি কাঁচের মতো ভেঙ্গে যায়। যেন ধপ করে বুড়ি হয়ে ওঠে সে। শান্তির হাটে এসে মন্তু যখন টুনিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় তখন সে প্রস্তাব প্রত্যাক্ষাণ করে। বর্ণিত আছে : 'টুনির চোখের কোণে তখনও দু'ফোটা জল চিকচিক করছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়ালো সে। আর অতি চাপা সুরে ফিসফিস করে বললো, না তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২১৯)

পরিবার প্রধান বুড়ো মকবুলের মৃত্যুর পর টুনির মনোজগতে অদ্ভূত পরিবর্তন আসে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে সে আর অস্বীকার করতে পারে না। মন্তুর প্রতি সমস্ত অধিকারবোধ ছিন্ন করে বুকভরা যন্ত্রণা আর দীর্ঘশ্বাস চেপে সে চলে যায় বাপের বাড়ি। টুনির অন্তর্জগতের টানাপোড়েনের চিত্রল উপস্থাপনে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় মেলে। এমন ঘটনার ব্যঞ্জনাই যেন উপন্যাসের স্বার্থকতা পরিপূর্ণ হয়েছে।

বুড়ো মকবুল শহুরে নাগরিক জীবনের কুটিল মানুষ নয়। কোন পরিকল্পনা বা সূক্ষ্ম চেতনার সন্নিবেশ নেয় তার মধ্যে। চরিত্রটি যেন হাজার বছর ধরে প্রবাহমান অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য ধারা লালিত অবিকল সজীব জীবন্ত কর্মচঞ্চল মানুষ, যার মধ্যে নেই রাজনৈতিক জটিলতা, নেই শ্রেণিতত্ত্বের উত্তাপ মাখা মানসিকতা। বাংলা সাহিত্যে এমন অকৃত্রিম চরিত্রের দেখা খুবই কম মেলে। শুধু মকবুল নয় মন্তু, আবুল, সুরত আলী, নন্তু শেখ করিম শেখ প্রতিটি চরিত্রই অত্যন্ত সারল্যে গড়া মাটির মানুষ, যারা কোন জটিলতা জানে না, জানে না কুটিল বুদ্ধি দিয়ে অন্যকে ঠকাতে বরং সারা জীবন দু'বেলা অন্ন জোটাতেই ব্যস্ত তারা। তারা অন্যের সুখে সুখ পায় আর অন্যের দুঃখে কষ্ট পায়। এমন হার্দিক সম্পর্কের বড়ই অভাব নগরের সভ্যতায়।

গ্রামীণ উপন্যাসগুলির অধিকাংশতেই দেখা যায় হয় সেখানে কবিত্বমণ্ডিত স্বর্গীয় রূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে নয়তো কেবলই দুঃখের পাঁচালী বয়ান করা হয়েছে। জহির রায়হানের উপন্যাস তেমনটি নয়। তিনি এখানে তাঁর স্বকালের বাস্তব তথ্য অবগত হয়ে গ্রাম বাংলার বিস্তৃত জীবন যাত্রা উন্মোচন করেছেন। 'যেন প্রথা জীর্ণ নিস্তরঙ্গ অবকাঠামোর মধ্যে অবরুদ্ধ পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবন বাস্তবতার স্বরূপ সত্য উন্মোচিত হয়েছে জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে।' (ছন্দশ্রী পাল ২০০৯ : ১১২)। গ্রামীণ সৌন্দর্য তুলে আনতে তিনি যেন তাঁর সৃজনশীলতার অবারিত দুয়ার খুলে দিয়েছেন : 'মাঝে মাঝে ধানক্ষেত সরে গেছে দু-ধারে শুধু অফুরন্ত জলাভূমি। অথৈ পানি। শেওলা আর বাদাবন ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুলিয়ে নাচে অগুনাতি শাপলা ফুল।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৫)

শুধু গ্রামের প্রকৃতির বর্ণনা নয় গ্রামে বসবাসরত মানুষের জীবন যাত্রার বিশ্বস্ত বর্ণনা দিতে তিনি গ্রামীণ ঘরবাড়ির বৈশিষ্ট্য ও ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের সংগ্রামী জীবনের চিত্র যেন এই সব ঘরের দৃশ্যে ফুটে ওঠে। বর্ণিত আছে :

> সামনে নুয়ে-পড়া ছোট ঘরগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো। বাঁশের তৈরি বেড়ার ভাঙা অংশগুলো তালপাতা দিয়ে মাড়ানো। চালার স্থানে স্থানে খড়কুটো উঠে ফুটো হয়ে গেছে। দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এসে একবার করে সেই ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে যায় ঘরের ভেতরে।
>
> আম, কাঁঠাল, পাটিপাতা তার বেতের বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ। মাঝে মাঝে ছোট-বড় অনেকগুলো সুপুরি আর নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে অনেক আগে। দু-একটা খেজুর গাছও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। ছোট পুকুর।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৭)

গ্রামীণ জীবনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল উত্তরাধিকার সূত্রতা। এ উপন্যাসেও আমরা তেমন বৈশিষ্ট্য দেখতে পায়। দিন যায় সময় বদলায় একের ক্ষমতা অন্যের হাতে বর্তায়। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মকবুলের মৃত্যুর পর তার স্থান শূন্য ছিল না। তার স্থান নিয়ে নেয় মন্তু। শিকদার বাড়িতে মন্তুই কর্তা হয়। পূর্বে মন্তু, সুরত আলী, গনুমোল্লা, আবুল সবাই যেমন মেনে চলতো মকবুলকে এখন মন্তুকেও তেমন মেনে চলে পরবর্তী প্রজন্ম। বর্ণিত আছে : 'এখন সে বাড়ির কর্তা। সবার বড়ো। যে-কোনা কাজে সবাই এসে পরামর্শ নেয় ওর।... মন্তুকে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই পথ

ছেড়ে আসরের মাঝখানে বসালো ওকে। এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে এনে ওর হাতে দিয়ে গেলো আম্বিয়া।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২০)

অন্যদিকে বড় হয়েছে সুরত আলীর ছেলে। 'বাপের মতই উঠানে বসে সুর করে, রাত জেগে পুঁথি পড়ে। সকলে গোল হয়ে বসে তা শোনে। গ্রাম বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য যেনো অফুরন্ত।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৫২)। 'এই প্রবাহমান মানবজীবনই হাজার বছর ধরে উপন্যাসের মূল সুর।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০০৮ : ২২২)

গ্রামীণ জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পারিবারিক বন্ধন। নাগরিক জীবনে সেটির বড়ই অভাব। বর্তমানে শুধু শহর নয় গ্রামেও ক্ষমতার দখলে উগ্র হয়ে পড়েছে সবাই। তবে অতীতে এমন ছিল না। তখন পারিবারিক ভীত ছিল মজবুত। তাদের মধ্য ছিল মন্য করার মানসিকতা। সে দিকটি এ উপন্যাসে চোখে পড়ে। সবাই যার যার সংসারের উন্নতিতে শ্রম দিলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সবাই একত্রিত হয় এবং গ্রামের বড়দের কথা মান্য করে। অন্য সময় তাদের মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য কিংবা মতের বিরোধ থাকলেও এ সময় তারা সবাই একত্রিত হয়ে বড়দের পথ অনুসরণ করে। বর্ণিত রয়েছে :

> গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সকলকে জিজ্ঞেস না করে বাড়ির কেউ কোনদিন কোনো কাজ কারবার করে না। সুরত আলীর সঙ্গে হয়তো রশীদের মনোমালিন্য আছে।... কিন্তু বাড়ির মানসম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোনো কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। তখন সবাই এক। একসঙ্গে বসে পরামর্শ করবে ওরা।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৭৬)

গ্রামের নানা আচার বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ রয়েছে এ উপন্যাসে। বিয়ে গ্রামীণ ঐতিহ্যের অন্যতম একটি আনন্দ উৎসব। রাত জেগে ছেলে বুড়োরা হৈ হুল্লা করে, গান গায়, নৃত্য করে। এছাড়া ঢেকিতে ধান ভানা, পিঠা বানানো, নানা রকম খাবার তৈরি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে সবাই। এছাড়া গ্রামীণ মানুষের বিনোদনের আরেকটি উপকরণ হিসেবে উল্লেখ আছে সার্কাসের। মন্তু আর টুলি শান্তির হাটে গিয়ে সার্কাস দেখেছিল। সার্কসের বর্ণনা এসেছে এভাবে :

> কিছুক্ষণের মধ্যে সার্কাস শুরু হয়ে গেলো।
>
> প্রথমে একটা মেয়ে দুটো লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা একখানা দড়ির ওপর দিয়ে নির্বিকারভাবে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে হেঁটে চলে গেলো।
>
> তারপর এলো বিকটাকার লোক। হাতের মুঠের ওপরে তিনটে মানুষকে তুলে নিয়ে চরকির মতো ঘোরাতে লাগলে সে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৮৯)

এভাবে ঔপন্যাসিক গ্রামীণ সমাজ সংসারের নানা কর্মকাণ্ডের বিস্তর বর্ণনার মাধ্যমে কালে কালে আবর্তিত গ্রাম বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের অকাট্য চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন অতি আবেগ মিশ্রিত করে, অতি বিশ্বস্তভাবে।

ঘটনা আবর্তনের পাশাপাশি জহির রায়হান উপন্যাসের কাঠামো বিন্যাসেও ছিলেন যত্নশীল। তাঁর লেখার ঢং তাঁর একান্ত নিজের। সমকালীন সাহিত্যিকদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে নিজেস্ব স্টাইলেই সাহিত্যচর্চা করতেন। 'এক্ষেত্রে অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও নিজেস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস পড়লে মনেও হয় না এটা পরিকল্পিত কোনো কাহিনী, বরং তা এক নৈর্ব্যাক্তিক ঘটনাচিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশিত হয়, যা শিল্পকে মহিমান্বিত করে তোলে। বরাবরই জহির রায়হান এসব বিষয়ে পরীক্ষা প্রিয় শিল্পী।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০০৮ : ২২৩)

ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় জহির রায়হান সবসময় মানবাংলা ব্যবহার করতেন। এ উপন্যাসেও ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর ভাষা বর্ণনার ভঙ্গিমা এমন :

> ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগলো। চাঁদ হেলে পড়লো পশ্চিমে। উঠোনের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। পরীর দীঘির পাড়ে একটা রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেলো। সুরত আলীর ছেলেটা তখনো একটানা পুঁথি পড়ে গেলো।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২০)

শুধু ঘটনা বর্ণনা নয় বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন ও তাঁর নিজেস্ব ভাষা বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। মন্তু ও টুনির রাত জেগে শাপলা কিংবা মাছ ধরার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এমন :

> টুনি দোর গোড়া থেকে বলে, বাহ, বারে।
>
> মন্তু মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। বলে, ক্যান কী অইছে?
>
> টুনি ফিসফিসিয়ে বলে আজ যাইবা না?
>
> মন্তু অবাক হয়, কই যামু?
>
> টুনি মুখ কালো করে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, তারপরে বলে, ক্যান, ভুইলা গেছ বুঝি।
>
> মন্তুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়। দেয়ালে ঝোলানো মাছ ধরার জালটার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে, অ-মাছ ধরতে?
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৬১)

এ উপন্যাসে উপমা আর প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে বাক্যের পরতে পরতে। ঔপন্যাসিক গ্রামীণ জীবন বর্ণনার সাথে সাথে বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করেছেন এভাবে :

- দীঘির পাড়ে উঁচু ঢিপির মতো তার কবরটা আজো চোখে পড়ে সবার আগে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৬০)
- পাথরের চেয়েও শক্ত। (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৯৮)

- ...বুকফাঁটা আর্তনাদ করে উঠোনের মাঝখানে ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পাতে লাগলো টুনি। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২১৬)

জহির রায়হান তাঁর এ উপন্যাসে মানুষের জীবনও আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বার বার প্রকৃতির দিকে ফিরে গিয়েছেন। তিনি এ উপন্যাসে প্রচুর চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। যেমন :

> নদীর স্রোত নৌকোর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে যেন বহু দিনের এই স্নেহের টানকে চিরন্তন করে ধরে রাখার জন্য প্রাণহীন কাঠের টুকরোগুলোকে গভীর আবেগে বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইছে ওরা।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৯১)

অথবা,

> কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের শুরু। ঘরে ঘরে ধান উঠেছে। অনেক রাত পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম থাকে না। কাজ আর কাজ। সারাদিন ধান কেটে এনে পালা দিয়ে রাখে। রাতে গরু দিয়ে মাড়ায়। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২১৯)

এভাবে ঔপন্যাসিক জহির রায়হান তাঁর অন্যান্য কথাসাহিত্যের মতো 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাকে শিল্প মণ্ডিত করে অপূর্বতা দান করেছেন। তিনি ছিলেন পোড়-খাওয়া জীবন তরীর দক্ষ মাঝি। মরু ঝড় বারবার তাঁর জীবনকে ওলোট-পালোট করলেও ঠিকই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর জীবনের সেই অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলেছেন সাহিত্যকর্মে, অবশ্য ইতিবাচকভাবে। আমরা এ উপন্যাসে তেমন দেখতে পায়। উপন্যাসটি সম্পর্কে মনসুর মুসা বলেছেন : 'হাজার বছর ধরে সবচেয়ে বড় সার্থকতা হচ্ছে হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের যে জীবনরূপ সাহিত্যে অনাদৃত হয়ে গেছে, তার রূপায়ণে। লেখক গভীর মমতায় এ জীবনকে উপলব্ধি করেছেন এবং তার অবিকৃত রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০০৮ : ২২৫)। অন্য এক সমালোচক বলেছেন, 'উপন্যাসটির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ সুর ও গীতি-কবিতার আমেজ মিশে আছে। মন্তু ও টুনির পরকীয়া প্রেম, অবশ্য প্রধানত: বুড়ো মকবুলের তরুণী বউ টুনির দিক থেকেই, এবং শেষের দিকে মন্তু ও আম্বিয়ার সহজ সলাজ প্রেমানুভূতির উন্মেষ ও বিয়ের উপাখ্যানকে অবলম্বন করেই এই গ্রন্থে হাজার বছরের পুরানো গ্রাম বাংলার ছবি পরিবেশিত হয়েছে।' (কবির চৌধুরী ২০০১ : ৬১)। আরও এক সমালোচক বলেছেন : 'জাতিশোষণ, শ্রেণী শোষণ আর ধর্মশোষণ নাগরিক জীবনকে যেমন বিপর্যস্ত করেছে তেমনি আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনহীনতা বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। প্রথাজীর্ণ বৈচিত্র্যহীন অবকাঠামোর মধ্যে। জীবন ঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী জহির রায়হান সমাজ জীবনের এই স্বরূপ সত্যকে শিল্পীত করেছেন হাজার বছর ধরে উপন্যাসে।' (সুরভী দাস ২০০২ : ৫৪)

মূলত ঔপন্যাসিক নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে চিরন্তন জীবনানুভূতিকে অনুসন্ধান করেছেন এ উপন্যাসে। এক্ষেত্রে কাহিনীর বিস্তার খুব গভীরে যায়নি। খালি চোখে ভাসা ভাসা দেখার মতোই ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের অন্তর্জগতের বিচিত্র ভাবনা অনুপস্থিত। শুধুমাত্র টুনির মনস্তত্ত্ব কিছুটা বিস্তার লাভ করেছে। অন্য কোন চরিত্রের মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যন্ত্রণার সাম্যক চিত্র আমরা পায়নি। বরং তাদেরকে দেখানো হয়েছে দৈনন্দিন কাজে লিপ্ত থেকে দুমুঠো অন্ন কিভাবে

জাগাড় করা যায়, কিভাবে সন্ধ্যা কালে পুঁথির গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া যায়। কিন্তু এটাই জীবনের শেষ কথা নয়। জীবন উপলব্ধিতে মানুষের অন্তর্জগৎ উন্মোচিত হওয়া আবশ্যক তাছাড়া লেখক গ্রামীণ জীবন বর্ণনা করলেও বিভিন্ন চরিত্রে গ্রামীণ সংলাপের সার্থক ব্যবহার করেন নি। অনেকটা মান বাংলা ভাষা তুলে দিয়েছেন গ্রামীণ চরিত্রের মুখে। বাস্তবে এটি অমাঞ্জস্য মনে হয়েছে। কাহিনী বিস্তারেও তিনি আরো একটু যত্নশীল হতে পারতেন। যাই হোক, বাংলা সাহিত্যে এমন স্নিগ্ধ সরল গ্রামীণ জীবন উপস্থাপনার দৃষ্টান্ত খুবই কম। তবে তিনি উপন্যাসটির মধ্যে মানবাকাঙ্ক্ষা ও অচরিতার্থ বেদনাকে চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিপূর্ণ রূপে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই আশা নিয়ে বেঁচেছে। মকবুল চেয়েছে তার যেন ফসলী জমি হয় যেখানে সে সারা বছর ফসল ফলাতে পারবেন অন্যের জমি বর্গা করা লাগবে না, সুরত আলীও জীবিকা উপার্জনে অন্যের উপর নির্ভর করতে চায় নি। গণু মোল্লা চেয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি পেতে, আম্বিয়া চেয়েছে মন্তুকে স্বামী হিসেবে পেতে, টুনিও চেয়েছে মন্তুর মতো ভাল মানুষ স্বামী হবে তার। আর মন্তু চেয়েছে টুনিকে বিয়ে করে সুন্দর একটি সংসারের। তবে সেই অর্থে কারোরই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। তাই একরকম অচরিতার্থ বেদনা বহন করেছে এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র। তবে ব্যথা বেদনা ও মালিন্যতাকে পেছনে ফেলে সমগ্র চরিত্রগুলি ছুটে চলেছে সম্মুখ পানে। এ যেন সুরত আলী আর তার ছেলের বিলম্বিত সুরের পুঁথিপড়ার মতোই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহমান বাংলার গ্রামজীবন। সে ক্ষেত্রে উপন্যাসটির নামকরণ যথার্থ ব্যঞ্জনাবহ।

আলোচনার প্রান্ত সোপানে দাঁড়িয়ে বলা যায় জহির রায়হান 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বৈচিত্রহীন নিস্তরঙ্গ পল্লীবাংলার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা হাসি-কান্না, আচার-প্রথা ও রুচিবোধকে নিয়ে নিখুঁত চলচ্ছবি এঁকেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত পরিশীলিত মননশীল ও পরিমিত আবেগী ছিলেন। ফলে হৃদয়বৃত্তি উৎকর্ষ প্রয়োগে আন্তরিকতার ছোঁয়া লেগেছে উপন্যাসের পরতে পরতে। এখানকার ঘটনা ও চরিত্রগুলি যেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের না হয়ে আবহমান গ্রামবাংলার প্রতিনিধি। কোন তাত্ত্বিক জাটিল জালে আবদ্ধ না করে তিনি তাঁর চরিত্রকে বিনির্মাণ করেছেন জীবনের গাঁঢ় উষ্ণতা দিয়ে। আর বৈচিত্রহীন গ্রামীণ জীবন প্রবাহের মধ্যে মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অচরিতার্থ বেদনার অবিকল রূপটি বিশ্বস্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আরেক ফাল্গুন

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯)। ভাষার মাধ্যমে বাঙালির সত্তা সন্ধানের সংগ্রামী ক্যানভাসে চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসটির কাহিনী ব্যঞ্জনা। শুধু তাই নয় ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জের অন্তরালে সামাজিক জীবন বিন্যাসের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা এ উপন্যাসে দৃশ্যমান।

সুজলা, সুফলা, শ্যামল বনানী ঘেরা বঙ্গভূমির ঐশ্বর্যে বারবার লালায়িত হয় বিদেশি লোলুপেরা। কখনো বাণিজ্যের ছলে, কখনো শাসক হয়ে প্রতারিত করে বাঙালিকে। ১৭৫৭ সালে এ অঞ্চলের স্বাধীন নবাবের আসন ছিনিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ ধূর্ত শাসকেরা প্রায় দু'শত বছর নিরীহ বাঙালিকে শাসন করে। আপন দেশে পরাধীনতার শিকল পরে বাঙালিরা বার বার বিদ্রোহের মশাল জ্বালায়। যদিও পরিকল্পনা আর একতার অভাবে তার দ্যুতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তবে বারংবার আত্মপ্রচেষ্টার বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে এদেশ থেকে বিতাড়িত হয় ব্রিটিশ কুশাসকেরা। জন্ম হয় ভারত আর পাকিস্তানের। বঙ্গবাসীরা অনেক স্বাদ করে পাকিস্তানকে স্বাগত জানালেও তাদের আশায় ছেদ পড়ে খুব শীঘ্রই। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাঙালিকে দমন করতে প্রথমেই আঘাত হানে ভাষার উপরে ১৯৪৮ সালে। বাঙালি ভীত সন্ত্রস্ত হয় নি বরং তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেছে। অনেক সভা, সংগ্রামের পরিশেষে ভাষার দাবির জন্য ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে তারা রক্তাক্ত করে আপন বক্ষ। তার বিনিময়েই অনেক অপেক্ষা শেষে বাংলার পূর্ব আকাশে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। আর ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যে দশজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পার হয়ে প্রথমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিলেন তাঁদের একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন জহির রায়হান। অতি কাছ থেকে দেখা বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে, বাঙালি মানস বৈশিষ্ট্যকে চিরন্তন করার লক্ষ্যেই তিনি রচনা করলেন 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি। ৫২'র ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনা না করে তিনি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন ভাষা আন্দোলনের তিন বছর পর বাঙালির জীবনে সে আন্দোলন কিভাবে প্রভাবিত করেছে। শুধু তাই নয় একুশ পালনের সমগ্র আয়োজনের ফাঁকে ফাঁকে বিধৃত করেছেন সদ্য জন্ম নেওয়া নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির আচার সর্বস্ব। সে আলোচনার পূর্বে মধ্যবিত্তের বিবরণ আবশ্যক।

'বাংলাদেশের নাগরিক সভ্যতার যুগ মুঘল আমল থেকে শুরু হলেও বাংলার আধুনিক নগরজীবনের শুরু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে।' (গোলাম কিবরিয়া ভুঁইয়া ১৯৯৬ : ১১৯)। '১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। নতুন করে শাসন শুরু হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের। তবে ব্রিটিশ শাসনের শুরু হয় শিল্পতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সূচনা করে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে, নগর জীবন ও সংস্কৃতির রূপান্তরে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উত্তরণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।' (আমিনুর রহমান সুলতান ২০০৩ : ০৯)। 'উনিশ শতকের বাঙ্গালির রেনেসাঁ বা নবজাগরণ মূলত পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার সম্ভোগের ফল।' (বদরুল হাসান ১৯৯০ : ০১)। প্রথমে ইতালির ফ্লোরেন্সে এই নবজাগরণের সূচনা ঘটে। মধ্যযুগীয় স্থবির জীবন থেকে মোহমুক্তি, সামন্ত সমাজ থেকে

ধনতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ, নগরের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। যা পরবর্তীতে বাঙালি সমাজে আবর্তিত হয় ব্রিটিশ শাসনকালে। প্রথম দিকে হিন্দু সম্প্রদায় নব চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়। তবে 'জাতীয় জীবনে এ সময়ে যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল, তার সবটাই ছিল আরোপিত।' (জুলফিকার মতিন ১৯৯৫ : ১৭)

জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি একুশের চেতনা সমৃদ্ধ গৌরব-দীপ্র প্রথম সার্থক উপন্যাস। তবে ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করে বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেই চিত্রায়িত করেছেন অসামান্য শিল্প মাধুর্যে। 'মধ্যবিত্ত জীবনচিত্র রূপায়ণে জহির রায়হান একেবারেই মোহহীন, মমতাহীন। তাঁর উপন্যাসে জীবন যেমন ছিল ঠিক তেমনিভাবেই রূপায়িত হয়েছে, অকারণ কোনো কথা বাড়িয়ে বলা নেই – নেই তেমনি বাহুল্য অনাবশ্যক কোনো উচ্ছ্বাসও নেই। জীবনের সংকীর্ণতাকে তিনি তুলে ধরেছেন, দেখিয়েছেন সম্ভাবনাকেও; কিন্তু তার চেয়েও বড় হল মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়ত্বের চিত্র রূপায়ণে জহির রায়হান ছিলেন প্রচণ্ডভাবে নির্মম এবং সাহসী কথা-উপস্থাপক।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০০৮ : ১৮৯)

জহির রায়হান ছিলেন মৌলিক শিল্পী। শোষিত, নিপীড়িত মানুষের বিশ্বাস, সংগ্রাম এবং চৈতন্যে সুচিন্তার আলো জ্বালাতে, স্বদেশ উন্নয়নের শুভকামনায় তিনি আন্তরগরজেই উপন্যাস রচনা করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসের মতো মার্কসীয় বিপ্লবী জীবনভাবনা আর সাহসী সংগ্রামী মানুষের সাফল্য এ উপন্যাসে বারবার প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। ষাটের দশকে যখন আমাদের বহু উপন্যাসিক ভয়ে নতি স্বীকার করেছেন বা জাগতিক মোহের কাছে আত্মনিবেদন করেছেন, তখন সমাজ সতর্ক এবং রাজনীতি সচেতন জহির রায়হান ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্য বিরোধী লেখনীর মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছেন নির্ভীক শিল্পী। বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মাত্র তিনদিনের ঘটনা প্রবাহে ১৯৫৫ সালের একুশ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙালি মানস জগতে কতটা শক্তি ও ঐক্যের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তাই বিধৃত হয়েছে এখানে। তিনি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন চেতনার এমন স্ফুরণ শুধু বিপ্লবের ক্ষেত্রেই নয়, প্রেমের ক্ষেত্রে, এমনকি ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধেও বিদ্যমান।

তিনি যখন এ উপন্যাসটি রচনা করেন, তখন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন শীর্ষ স্পর্শী। দীর্ঘ আইউবি স্বৈরশাসনের একযুগের বিমূঢ় ক্ষতবিক্ষত বাস্তব অভিজ্ঞতার বিমূর্ত অথচ তীব্র অনুপ্রবেশ উপন্যাসটিকে সংগ্রামী চরিত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এছাড়া শতবর্ষী সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে লেখক ১৮৫৭ সালের সেপাহী বিদ্রোহের ঘটনাকে সূচনাতেই উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসটির পটভূমি ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি হলেও সময়-সমাজ-জাতীয়তাবোধের গভীরতা নির্ণয়ে লেখক বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অখণ্ড অনুভূতি একীভূত করেছেন। 'ইতিহাসবোধ ও সংগ্রামী জীবন চেতনার অঙ্গীকারে এ উপন্যাস এক সর্বজনীন জীবনানুভবে

তরঙ্গিত-স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।' (রফিকউল্লাহ খান ১৯৯৭ : ১৮৭)। উপন্যাসের শুরুতে ১৮৫৭ সালের রক্তোজ্জ্বল স্মৃতি উন্মোচন এমন :

> খবর পেয়ে যথাসময়ে বৃটিশ-মেরিনের সৈন্যরা এসে পৌঁছেছিলো আর শহরের এ অংশটা দখল করে তাঁবু ফেলেছিলো এখানে। সে থেকে এর নাম হয়েছিলো আন্ডারগোরা ময়দান।...শেষরাতে, লালবাগের নিরস্ত্র সেপাহীদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করেছিলো তারা। মানুষের রক্তে লালবাগের মাটি লাল হয়ে উঠে কিছু সেপাহী মার্চ করে পালিয়ে যায় ময়মনসিংহের দিকে। যারা ধরা পড়ে তাদের ফাঁসি দেয়া হয় আন্ডাগোরার ময়দানে। মৃতদেহ গুলোকে ঝুলিয়ে রাখা হয় গাছের ডালে ডালে।
>
> লোকে দেখুক। দেশদ্রোহীতার শাস্তি কত নির্মম হতে পারে, স্বচক্ষে দেখুক নেটিভরা।
>
> এসব ঘটেছিলো একশো বছর আগে। আঠারশো সাতান্ন সালে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২৩)

ইতিহাস বর্ণনায় নির্লিপ্ত থেকেই ঘটনার সামঞ্জস্য রেখে তিনি তাঁর উপন্যাসে বাস্তবিক অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। '১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারীর যে রক্তাক্ত গণঅভ্যুদয় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের গণ-ঐক্যের উৎসকে অবারিত করে দিয়েছিল, তাকে এবং তার জন্য ৪৮ থেকে ৫২ পর্যন্ত অন্ধকারে আবৃত কয়েকটি বছরে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছিল তাকেও স্মরণে রেখে ১৯৫৫ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী পালনের একটা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে 'আরেক ফাল্গুনে'।' (রনেশ দাশগুপ্ত ১৯৭৩ : ২০৫)। 'শুধুই একুশের দলিল হয়ে থাকেনি 'আরেক ফাল্গুন' ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘটনা, বিপর্যয় অনুভূতি যুক্ত হয়ে আরেক ফাল্গুনকে মহৎ উপন্যাসের মহিমা দিয়েছে।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ৪৬)। আর এ উপলব্ধি নাগরিক জীবনবোধ থেকে উৎসারিত। সদ্য অঙ্কুরিত নাগরিক সমাজ কাঠামো তখনও এদেশে তেমনভাবে বিস্তৃত হতে পারেনি। যার বর্ণনা আমরা পুরানো ঢাকার রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি ও বসতি বর্ণনার মাধ্যমে লক্ষ্য করে থাকি : 'শহরের এ অংশটা পুরানো আর ভাঙ্গাচোরা। বাড়িগুলো সব একটার সঙ্গে আরেকটা একেবারে ঠাসা। দরজাগুলো সব এত ছোট যে, ভেতরে যেতে হলে উপুর হয়ে ডুকতে হয়। রাস্তাগুলো খুব সরু সরু। অনেক জায়গায় এত সরু যে পাশাপাশি একটার বেশি দুটো রিক্শা যেতে পারে না।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৩০)

নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে নগরকে কেন্দ্র করে যা পরবর্তীকালে গ্রামেও বিস্তার লাভ করে। এ উপন্যাসের সমগ্র ঘটনা শহর কেন্দ্রিক, চরিত্রগুলিও শহুরে। এখানে 'জাতীয়তাবাদের উত্তাল ঝড়ের ইঙ্গিত প্রদান করল নগরকেন্দ্রিক নতুন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সোচ্চার আর সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।' (ছন্দশ্রী পাল ২০০৯ : ৩৪)। নগরজীবন ও সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনা যা পাকিস্তান সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে জাগ্রত হয়।এ কারণে আলোচ্য উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র রাজনীতি সচেতন। মূলত মধ্যবিত্ত মানস চিত্রিত করতে গিয়েই ঔপন্যাসিক সমকালীন রাজনীতিকে অনুষঙ্গ করেছেন। এক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্রসমাজ গুরুদায়িত্ব পালন করে। লেখকের ভাষায়:

রাস্তায় শ্লোগান দেয়া নিষেধ। মিছিল শোভাযাত্রা বেআইনী করেছে সরকার। আর তাই ঘরে ঘরে ছাতের উপরে সমবেত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে ওরা, ছাত্ররা। মুসলিম হল, মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল, চামেলী হাউস, ফজলুল হক হল, বান্ধব কুটির, ইডেন হোস্টেল, নূরপুর ভিলা। সবাই যেন এককণ্ঠে আশ্বাস দিচ্ছে, দেশ আমার, ভয় নাই।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ২৬৪)

একুশে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ কিভাবে আগামী দিনের পথ নির্মাণ করবে তার সাম্যক ব্যাখ্যা লেখক এখানে উপস্থাপন করেছেন। 'তিনদিনের কাহিনীতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠীর নিপীড়ন, দমননীতি পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠীর নিপীড়ন ও দমননীতির পাশাপাশি মুক্তিকামী বাঙালির অপ্রতিরোধ্য সাহসিকতা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি বাঙালির চেতনাকামী ঐতিহ্য কিভাবে উত্তরাধিকার খুঁজে পেয়েছে তা বিধৃত হয়েছে।' (আমিনুর রহমান সুলতান ২০০৩ : ১২৭)। ঔপন্যাসিক বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে যেন তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিই ব্যক্ত করেছেন যার ভূগোল নির্মিত হয়েছে ঢাকার বুকে। প্রগতিশীল ছাত্রনেতা আর কর্মীরা একুশ পালনে নানা কর্মসূচী হাতে নেয়। তিনদিন তারা খালি পায়ে হাটে, কালোব্যাজ ধারণ করে, রোজা রাখে, কালো পতাকা উত্তোলন করে, হলের সামনে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে, শহীদ দিবস পালন করবে বলে 'শ্লোগান' তৈরি করে, দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার লাগায়, দেয়ালিকা বের করে, লিফলেট প্রকাশ করে নিজ নিজ দায়িত্বে। আর এসব করে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। সালমার দুরন্ত ভাই শাহেদও দায়িত্বে সচেতন হয়ে ওঠে। বর্ণিত আছে : 'এইতো এখন গিয়ে পোষ্টার লিখতে বসবো। পাড়ার ছেলেদের সব বলে রেখেছি। আজ রাতের মধ্যে দু'শ পোষ্টার লাগানো চাই কি মনে করেছিস তুই?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৯০)

জাতীয় সংকট যখন উপস্থিত হয় বাঙালি ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলেই এক কাতারে দাঁড়িয়ে বারবার তাদের দাবি উত্থাপন করেছে। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটেছে। কার বাড়ি কোথায়, কে বয়সে বড়, কে ছোট, কে কালো, কে সাদা এই প্রভেদ উপেক্ষা করে সবাই একই উদ্দেশ্যে রাজপথে একত্রিত হয়। ঔপন্যাসিকও অতি নিপুণভাবে সেই বর্ণনা দিয়েছেন :

মধুর স্টলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সংঘবদ্ধ হলো বাকি ছেলেরা, সংখ্যায় হয়তো শ'চার-পাঁচেক হবে ওরা। বয়সের তারতম্যটা সহজে চোখে পড়ে। কারো বয়স ষোল সতেরোর বেশি হবে না। কারো চব্বিশ পেরিয়ে গেছে। কারো গায়ের রঙ কালো। কারো গৌরবর্ণ। কারো পরনে পায়জামা, কারো প্যান্ট। কিন্তু সংকল্পে সকলে এক। প্রতিজ্ঞায় অভিন্ন।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ২৭৯)

প্রাচীন, মধ্য এমনকি আধুনিক যুগের উনবিংশ শতকেও বাঙালি নারীর অবস্থান ছিল অন্দরমহলে। অধিকারের কথাতো দূরে থাক নিজেদের সম্মানটুকুও কোনদিন পায়নি। তবে দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে নারী তাদের সত্তা আবিষ্কারে সচেষ্ট হয় এবং আপন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পুরুষের মতো ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। এতদিনের নিপীড়ন, অত্যাচারের

প্রতিবাদ করে। এ উপন্যাসেও নারীর পদচারণায় মুখরিত। তারা সকলেই শিক্ষিত। তারাও শহীদ দিবস পালন করতে আসে, শ্লোগান দেয়, মিছিল ও সভায় অংশগ্রহণ করে এমন কি গ্রেফতার হতেও পিছুপা হয় নি। নারীর অংশগ্রহণ লেখকের ভাষায় এমন : 'সেদিনের সেই কুয়াশা ছড়ান ভোরে রাস্তা যখন অনেকটা ফাঁকা আর জনশূন্য তখন তিনটি মেয়েকে এক সারিতে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। তাদের সবার পরনে চওড়া পাড়ের ধবধবে শাড়ি।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২৫)

প্রগতিশীল তারুণ্যেভরা ছাত্র সমাজের এমন ভূমিকার পাশে লেখক আবার প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রদের স্থবিরতাকেও বর্ণনা করেছেন। টানাপড়েনে দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত চরিত্র নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। এমন ছাত্রের মধ্যে রয়েছে বজলে হোসেন; আপন স্বার্থের বাইরে কিছুই ভাবতে পারত না। সেকারণে জাতি সত্তা প্রচারের একটি মহান দিবস পালনে তার ক্লাস করা হবে না বলে দুঃখ করেছে :

> ওর বড়ো দুঃখ হলো যে আজ তিনটে পার্সেন্টেজ নষ্ট হলো। শুধু আজ নয়, আসছে দুটো দিনেও ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারবে না সে। কি করে যাবে? জুতো পায়ে দিয়ে গেলে যে ছেলেরা তাড়া করবে ওকে। অথচ জুতো ছাড়া খালি পায়ে হাঁটার কথা ভাবতেও পারে না বজলে হোসেন।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৩৫)

মাতৃভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় মুনিম অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দিনভর কাজ করে যায়। মধ্যবিত্তের দোলাচলতা তাকে স্তিমিত করতে পারেনি। কিন্তু সমাজের সবাই সমান নয়। 'অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বার্থান্ধ বলে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর দালালি করতে দ্বিধা করেন না। ফলে নাগরিক জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিভক্ত হয়ে পড়ে দুই দলে। এর প্রভাব এবং সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর প্রভাব নাগরিক জীবনে আনে অস্থিরতা। অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।' (আমিনুর রহমান সুলতান ২০০৩ : ২০)। এ কারণেই লেখক, স্বার্থহীন চরিত্রের পাশাপাশি চরিত্রহীন লম্পট মাহমুদের মতো সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার লোককে বিধৃত করেছেন, যে আপন সত্তা ভুলে নিজ ভাইয়ের সর্বনাশ করতে পিছুপা হয়নি। শুধু তাই নয়, সরুজের মতো ছাত্ররা অর্থের বিনিময়ে গোয়েন্দাদের সহায়তা করেছে। লেখক মাহমুদের কুপরামর্শের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> বজলের উচিত মুনিমের সঙ্গে খুব সদ্‌ভাব রাখা ওর আস্থাভাজন হওয়া। তারপর ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে ভেতরের খবরগুলো সব অতি সাবধানে বের করে নেয়া। কোথায় থাকে সে, কি করে, কাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, এসব জেনে মাহমুদকে বলা। এর বিনিময়ে তার কর্তাদের কাছ থেকে ওকে একটা মোটা টাকা বন্দোবস্ত করে দিতে পারে মাহমুদ। কোন খাটুনী নেই অথচ ফিয়াসেকে নিয়ে আমোদ স্ফুর্তিতে থাকার মত অনেক টাকা পাবে সে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৭৬)

নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি সর্বদাই আত্মগত চেতনায় বৃত্তবন্দী। আত্মরতিতে মগ্ন থাকাই তাদের একমাত্র কাজ। এ উপন্যাসে বেশ কিছু চরিত্রে সে ভাবটি লক্ষ্যণীয়। যারা হল- সালমার চাচা, বজলে হোসেন, সাহানা, ডলি, রাজ্জাক

সাহেব ও তার স্ত্রী। সালমার স্বামী জেলে থাকায় তার চাচা তাকে আবার বিয়ে করে সংসারী হতে পরামর্শ দেয়। এমন কি জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলে :

> কি হবে এসব করে। এতো করে বলি ছেড়ে দে বাবা, ওসব আমাদের ঘরের ছেলেদের পোষায় না। ও হচ্ছে বড় লোকদের কাজ, যাদের কাড়ি কাড়ি টাকা আছে। সারা দুনিয়ার লোকে লুটেপুটে খাচ্ছে। ঘর করছে। বাড়ি করছে। জমি জমা করছে। আর ওনারা শুধু জল খেটেই চলেছেন। দেশ উদ্ধার করবে। বলি, দেশ কি তোদের উদ্ধারের জন্য বসে রয়েছে? সবাই নিজেরটা সামলে নিচ্ছে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৩৮)

মধ্যবিত্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য পলায়ণপর ও শঙ্কিত মানসিকতা। বাস্তবতাকে মোকাবেলা করতে তারা ভয় পায়। সর্বক্ষণ শান্তির নীড় খোঁজে ফেরে। জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বার বার দ্বিধাগ্রস্থ হয়। বিপদের আশঙ্কা যেন পিছু ছাড়ে না। এমন চারিত্রিক আচরণ 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রেও দেখা যায়। শ্লোগানের আওয়াজ পেয়ে জব্বারের গিন্নীর উদ্বিগ্নতা চোখে পড়ার মতো। নিজে কোন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও তার শান্তি বিঘ্নকারী আন্দোলন দেখে তার মানসিক সংশয় লেখক এভাবে প্রকাশ করেন :

> কেউ জানে না কতকাল এমনি উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে ওদের থাকতে হবে। এখনো সময় এসেছে মাঝে মাঝে, যখন মনে হয়েছে। এবার বুঝি তারা শান্তির নাগাল পেলো। কিন্তু পরক্ষণে তাদের সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। হিংসার নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ওরা। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছে, আর পারি না।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৬৩)

নারীশিক্ষা নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ উপন্যাসে আমরা নারীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে দেখি। শুধু তাই নয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধে উজ্জীবিত হয়ে তারা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডেও অংশ গ্রহণ করেছে। পুরুষের পাশাপাশি তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠীত করেছে। এছাড়া লেখক বাস্তব ঘটনার অনুকূলে রেখে নারী চরিত্রগুলি চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের সালমা, রানু, রেনু, নীলা, কামরুন্নেছা চরিত্র যেন নারী ভাষা সৈনিক– রওশন আর বাচ্চু, হালিমা খাতুন, আনোয়ারা খাতুন, সুফিয়া আহমেদ, সফিয়া খান, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, নাগিনা জোহা, মাজেদা আলী প্রমুখের প্রতিচ্ছায়া। ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন : 'তার ডাকে ছেলেরা এসে ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো আম গাছতলায়। মেয়েরাও এসে পৌঁছেছে এতক্ষণে। বারোজন মেয়ে। পরনে সবার কালোপাড় দেয়া শাড়ি। চোখেমুখে সবার আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৮০)

তবে মধ্যবিত্ত চেতনা মানুষের স্বপ্নভঙ্গ করেছে, নৈরাশ্যের বিস্তার ঘটিয়েছে। ফলে মানুষ তার বিশ্বাস হারিয়েছে। 'উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও আমাদের মানবিক গুণ- মানবতা, নৈতিকতা, বিশ্বাস প্রভৃতি দ্রুত হ্রাস পায়। সমাজ হয়ে ওঠে অবক্ষয়গ্রস্ত। আমাদের উন্নতির যে কোন পথে তা সন্ধিৎসার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।' (আমিনুর রহমান সুলতান ২০০৩ : ২৮-২৯)। তাইতো এ উপন্যাসে বজলে হোসেন তৎকালীন বাঙালির স্বার্থবিরোধী শ্রেণির চরিত্রে মূর্তমান। বাঙালি

হয়েও মাহমুদ, রশীদ বিদেশী শাসকদের গোলাম রয়ে যায়। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও একুশ উদ্‌যাপনকারী ছাত্র ছাত্রীদের ঘোরবিরোধী বজলে ও মাহমুদ উভয়ই নারী লিপ্সায় মত্ত। বজলে ছাত্রনেতা মুনিমের প্রেমিক ডলির দিকে কালো হাত বাড়িয়েছিল। আর মাহমুদ বাসায় রক্ষিতা পোষে। পুরুষের মতো নারীরও নৈতিক অবক্ষয় ঘঠেছে। তাই শাহানা আপন সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়ে ভ্রমর হয়ে উড়ে বেড়ায় এক ফুল থেকে অন্য ফুলে। ডলি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মুনিমকে ছেড়ে বজলের হাত ধরে। মাহমুদের দাসবৃত্তির চিত্র লেখক এভাবে বিধৃত করেছেন : 'যাকগে আমাদের এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কর্তারা যা করার করবে যদি বলে ধরো, ধরবো। যদি বলে ছাড়ো, ছাড়বো। যদি বলে মারো, মারবো। আমাদের কি ভাই, টাকা পাই চাকুরী করি।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৫২)। 'অধিকাংশ বাঙালি আমলা অফিসারদের মনোভাব এমনই ছিলো। বাঙালি আমলা উচ্চপদস্থ এলিট অফিসারদের মনোভঙ্গিটা জহির রায়হান খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন একুশের চেতনা ভিত্তিক গল্পগুলোতে এবং আরেক ফাল্গুন উপন্যাসেও।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৬২)

নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসের আর একটি অন্যতম দিক বিদীর্ণ, বিচূর্ণ মনস্তাপ। এ শ্রেণির মানুষেরা বার বার ভুল করে, ভুল স্বীকার করে এবং তার মাসুল বয়ে বেড়ায়। আরেক ফাল্গুনেও এমন চরিত্রের আনাগোনা রয়েছে। ডলি বড়লোকের মেয়ে, সে আন্দোলন পছন্দ করে না। মুনিমের আন্দোলনকে সে অবজ্ঞা করে। তার উপর অভিমান করে বজলে হোসেনের মতো চরিত্রহীনের হাতে ধরা দিয়ে অস্তিত্ব বিনষ্ট করার উপক্রম করে। তারপর আবার ভুল বুঝতে পারে। মুনিমের আদর্শের দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে আবার ফিরে আসে । তার হাতে ফুল গুঁজে দেয়। নিজেকে সমর্পণ করে প্রকৃতজনের পদতলে। লেখকের বর্ণনা : 'স্বল্প অন্ধকারেও মুনিম দেখলো ডালির চোখজোড়া পানিতে ছল ছল করছে। আনন্দে মনটা নেচে উঠছিলো বার বার। আর সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিলো ডলিকে। ডলির এমন রূপ আর কোনদিন চোখে পড়ে নি মুনিমের।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৯১)। এছাড়া সাহানাও শেষ পর্যন্ত তার সকল কর্ম পেছনে ফেলে ভুল শুধরাতে সংগ্রামী ছাত্র জনতার সঙ্গে একাত্ব হয়েছিল।

জহির রায়হান জীবনশিল্পী। জীবনের নানা অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং উপাত্ত সংগ্রহ করে সাহিত্য অনুষঙ্গে রূপায়িত করেছেন। তৎকালীন সময়ে স্বাধীনতার প্রাককালে জন্ম নেয় নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজ। আর লেখকই সেই সমাজের জনমানসের পুঙ্খানুপুঙ্খ চেতনা বাস্তবিক ও বিশ্লেষণধর্মী করে আলোচ্য উপন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন। সেকারণে ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রায়ণের পরও সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত মানসের আশাবাদী চেতনাকে দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন :

> বাইরের জীবনে যখন গভীর নৈরাশ্য পাথরের মত চেপে বসছে মানুষের মনে, যখন প্রতিটি পদক্ষেপ শঙ্কা ভয় আর ত্রাসে জড়িয়ে আসতে চায় আর একটি মুহূর্তের জন্যে মানুষ তাকে বিপদমুক্ত বলে ভাবতে পারেনা, সব সময় মনে হয় ওই বুঝি মৃত্যু নেমে এলো তার ভয়াবহ নীরবতা নিয়ে, তখনো সংসারে স্নেহ প্রেম আর ভালোবাসা পাশাপাশি বিরাজ করে বলেই হয়তো মানুষগুলো এখনো বেঁচে আছে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৪৭)

রাজনীতির লৌহ কঠিন ভাববিন্যাসের মধ্যেও জহির রায়হানের রোমান্টিক ভাবনা জগৎ সংযোজন সত্যিই প্রশংসার্য। ফাল্গুনের রঙে রঞ্জিত রোমান্টিক প্রণয়কে, কল্পনাবৃত্তিকে উপেক্ষা করেন নি বরং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভালোবাসাকে স্থাপন করেছেন উপন্যাসে নানা ভঙ্গিমায়। এখানে দেখা য়ায় সালমা ও তার সংগ্রামী স্বামী রওশনকে। রওশন জেলে দু'হাত হারিয়ে কষ্টে দিন যাপন করছে তুবও সালমা তার পথ চেয়ে দিন গোনে। লিলির দুর্ঘটনার পরও মাহমুদ তাকে বিয়ে করে, আসাদ সালমাকে নিয়ে কল্পনার বাসর সাজায়। অনুরূপ রাজনৈতিক সচেতন মুনিম প্রেম সম্পর্কেও সচেতন ছিল। ডলি নামের মেয়েকে সে ভালোবাসে। স্বপ্ন দেখে ভালোবাসার মানুষটাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। তবে রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের কারণে তাদের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের মিলন ঘটে। মুনিমের ভালোলাগার বর্ণনা এসেছে এভাবে : 'কোলকাতায় ফিরে যাবার আগের দিন ডলিকে প্রথম দেখলো সে। হাল্কা দেহ, ক্ষীণ কটি, কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। প্রথম দৃষ্টিতেই ভালোলেগে গিয়েছিলো মুনিমের।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৩৩)

উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য চরিত্র সৃষ্টিতে। জহির রায়হান এ উপন্যাসের চরিত্র সৃজনেও অনন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এখানে তিনি তিনটি শ্রেণিকে মূর্তমান করেছেন। যথা :

- শাসক শ্রেণি – কিউ খান, ইন্সপেক্টর রশিদ।
- শোষিত শ্রেণি – মুনিম, রাহাত, আসাদ, রানু, বেনু, নীলা, সালমা, কামরুন্নেসা, রওশন, ফজলু, মধুদা, মতি ভাই, মিন্টু, ডলি, সাহানা, কবি রসুল, মালতী প্রমুখ।
- পা-চাটা অনুরক্ত শ্রেণি – বজলে হোসেন, সবুর, মাহ্মুদ, রশীদ, জব্বার, তার গিন্নী, প্রভোষ্ঠ প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় চরিত্র মুনিম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সদ্য ধোয়ান সাদা শার্ট, প্যান্ট পরে খালি পায়ে বের হয়েছে শহীদ দিবস পালনের আয়োজন করতে। তার জীবনে প্রেম ও রাজনীতি দুটোই সমান্তরালে চলেছে। মাতৃভাষার জন্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা প্রয়োজন তা যেমন তার ছিল, তেমনি প্রেম সম্পর্কেও তার সচেতনতার অভাব ছিলনা। ডলিকে সে ভালোবাসে। তবে মিধ্যবিত্তের সংবেদনশীল চরিত্রের কারণে সে আদর্শচ্যুত হয় নি। ডলিকে ভালোবাসলেও তার রাজনৈতিক আদর্শের কারণে ডলির বুর্জোয়া মনোবৃত্তির কাছে হার মানে নি। ডলির ভালোবাসা তাকে টানাপোড়েনে টেনে নিয়ে যেতে পারে নি। ব্যাক্তিগত প্রেমকে উপেক্ষা করে জাতীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে। তাঁর আত্মত্যাগের বর্ণনা এমন : 'না ডলি, তা হয় না। মুনিমের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর আমাকে মিটিং-এ যেতে হবে, না গেলে চলবে না।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৪২)

এ চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিকের স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। মুনিমের পরিবার কলকাতায় থাকত এক সময় তারা ঢাকায় স্থায়ীভাবে চলে আছে। লেখকের জীবনেও এমন ঘটনা প্রলক্ষীত হয়। তাঁর পরিবার এক সময় কলকাতায়

থাকলেও ১৯৪৭ সাল থেকে তাঁরা সপরিবারে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। এছাড়া দেশের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ তা মুনিমের চরিত্রের মধ্যে দৃশ্যায়িত করেছেন।

এ উপন্যাসে সালমা ও রওশন অত্যুচ্চ ত্যাগী চরিত্র। ১৯৫০-৫৫ পাঁচ বছর রওশন রাজশাহী জেলে। দুই হাত নাই। তারপরও সালমা রওশনের স্মৃতি শূণ্য বুকে ধারণ করে এক নিঃসঙ্গ জীবন চালিয়ে নিচ্ছে। একসময় স্বামী ও ভাইয়ের পথ অনুসরণ করে সেও সংগ্রামী মানুষের সাথে মিশে গিয়েছে। তাকে গ্রেফতার হাসি মুখে বরণ করেছে। জেলে সতীর্থদের আগমনে তার উচ্ছ্বাস এমন : 'ওদের দেখতে পেয়ে শিশুদের মত আনন্দে হাততালি দিতে দিতে সেদিকে এগিয়ে গেলো মেডিকেলের মেয়েরা। এই যে নীলা যে, এসো এসো। ছুটে এসে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো সালমা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৮৬)

আবার বিপ্লবী কবি রসুল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির স্মৃতি চারণ করেছে যেন তরতাজা ২১ প্রেক্ষাপট থেকে তুলে এনেছে। ২১ তারিখে আমতলায় ছাত্র-ছাত্রীদের জড়ো হওয়া, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, পুলিশের অত্যাচার প্রতিটি ঘটনার হৃদয়স্পর্শ বর্ণনা দিয়েছে সে। বরকতের শহীদ হওয়ার মুহূর্তটি স্মৃতিচারণ করেছে এভাবে :

> বরকতের গুলি লেগেছিলো উরুর গোড়ায়। রক্তে সাদা পাজামাটা ওর লাল হয়ে গিয়েছিলো। আমরা চারজন ধরাধরি করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। পথে সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছিলো। বলেছিলো, তোমরা ঘাবড়িয়ো না, উরুর গোড়ায় গুলি লেগেছে ও কিছু না। আমি সেরে যাবো।
>
> সে রাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গিয়েছিলো সে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৫৬)

বায়ান্নোর একুশের বাস্তবিক আভিজ্ঞতার পুরো ঘটনাকে কবি রুসুলের মুখ দিয়ে বর্ণনা করেছেন যা উপন্যাসের সামগ্রিকতায় দক্ষভাবে অঙ্গীভূত হয়েছে। 'পরিশীলিত ভাবাবেগের সংশ্লেষণে তা উপন্যাসোচিত কাহিনী হয়ে উঠেছে, এ উপন্যাসের ঋদ্ধি ঘটিয়েছে।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৬৫)

আসাদ চরিত্রও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধে আকৃষ্ট হয়ে সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করে সামনে পথ চলেছে। বাবার শাসন উপেক্ষা করে ১৯৫২ সালের একুশ তারিখের আন্দোলন স্বক্রীয় অংশ গ্রহণ করেছে। ঐদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম দশজনের মধ্যে সেও একজন ছিল এবং পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ে জেল খেটেছে। এ চরিত্রের সঙ্গেও লেখকের সদৃশ্য রয়েছে। বায়ান্নের একুশ ফেব্রুয়ারি জহির রায়হান ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীর প্রথম দশজনের মধ্যে ছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন।

তাছাড়া উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র- রাহত, শাহেদ, রেনু, নীলা, রোকেয়া সবাই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্যদিকে ডলি, সাহানা পুঁজিবাদী সমাজসৃষ্ট চরিত্র, নিজেদের বিকিয়ে দেয় তারা পুঁজির সন্ধানে। আর শাসক শ্রেণির মধ্যে

রয়েছে- কিউ.খান, ইন্সপেক্টর রশিদ যাদের অত্যাচার শোষণে বাঙালি অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে এসেছে রাজপথে, মুক্তির গান গেয়েছে। শুধু বাঙালির ক্ষেত্রে নয় যুগে যুগে যত শাসক শ্রেণির আগমন ঘটেছে এবং ঘটবে তাদের সবার চেহার ও আচারণ এক ও অভিন্ন। শাসকের অত্যাচারে বর্ণনা এমন : 'পুলিশ অফিসাররা হয়ত বুঝতে পেরেছিলো। গ্রেপ্তার করে শেষ করা যাবে না। তাই ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্যে একজন বেঁটে মোটা আফিসার দৌড়ে এসে অকস্মাৎ একটা কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে মারলো ইউনিভার্সিটির ভেতরে। তারপর আরেকটা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৫৫)

আর আত্মঅবমাননাকারী নষ্ট চরিত্রের মধ্যে রয়েছে- মাহমুদ, বজলে ও সবুর। স্বদেশের আলো বাতাসে বেড়ে উঠেও তারা স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এভাবে তিনি উপন্যাসের ভিন্নধর্মী চরিত্র সংযোজন করে তৎকালীন সমাজের প্রকৃত ঘটনাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এসব চরিত্র কোনদিক থেকেই অতিরঞ্জিত নয়। পরিমিত শব্দচয়ন ও পরিধি বিস্তৃত করে অসামান্য সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। 'এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই ভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ধাবমান। বিপ্রতীপ আত্মসুখসন্ধানী চরিত্রও শেষ পর্যন্ত মৌল চেতনার টানে পরিবর্তিত হয়েছে। সালমার স্মৃতিময় অতীত এবং যন্ত্রণাবহ বর্তমানের মধ্যবর্তী ব্যবধান পাকিস্তানশাসিত বাংলাদেশের লাল কালো রেখায় চিহ্নিত, বিভক্ত ও ক্ষতবিক্ষত সময়ের অন্তর্গত ইতিহাসকে ধারণ করেই তাৎপর্যপূর্ণ।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ১৮৭) শুধু তাই নয় পরবর্তী ছাত্র সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয় দেশের আপামর জনতা।

উপন্যাসের ঘটনাবলী পুরনো ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক, কলতাবাজার, নারিন্দা, সদরঘাট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চামেলী হাউজ, মধুদার রেস্তোরা ও শহীদ মিনারের বেদীতে সংগঠিত হয়। ছাত্রদের কর্মসূচির সাথে আস্থা স্থাপন করে ক্যান্টিনওয়ালা মধুদা, চায়ের স্টলওয়ালা মতি ভাই এমনকি অধ্যাপক, কেরানিরা। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ ছাড়াও জগন্নাথ কলেজ, আরমানিটোলা স্কুল, ঢাকা কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা যুক্ত হতে থাকে। আন্দোলনে ২১ তারিখে সকালে তারা কালো পতাকা উত্তোলন করে। শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত করে তোলে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল প্রাঙ্গন। এরই মধ্যে প্রচুর পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল এলাকায় হিংস্রপ্রাণীর রূপ ধারণ করে সমাগম হয়। কালো পতাকা পতপত করে ফ্লাগ স্ট্যান্ডে উড়তে থাকে আর পুলিশ বাহিনী সেসব দেখে দাঁতে দাঁত ঘষে। প্রভোষ্টের আগমনের পর হলে ঢুকতে চায় কিন্তু ছাত্রদের বাধার মুখে পড়ে। পুলিশ বাধা পেয়ে সরে দাঁড়ালেও কালো পতাকা নামানোর জন্য উপর্যুপরি চাপ দিতে থাকে। ফলে সংঘর্ষ বাধে। তাদের নারকীয় হামলা চলে ছাত্র সমাজের উপর। শহীদ মিনারেও আক্রমণ হয়েছিল। লেখকের উদ্ধৃতি এমন : 'কিউ খানের ঈশারা পেয়ে একজন পুলিশ অকস্মাৎ ঝাপিয়ে পড়লো শহীদ বেদীটার ওপর। কঞ্চির ঘেরাটা দু'হাতে উপড়ে অদূরে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো তারা। কালো কাপড়টা টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলো এক পাশে। ফুলগুলো পিষে ফেললো বুটের তলায়।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৪৭)

'আন্দোলনে বহুজন আহত হয় এবং পুলিশ সতেরজন আন্দোলনকারী নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে যার মধ্যে সাতজন মেয়ে। এরপর ও ছাত্র ছাত্রীর তীব্র প্রতিবাদ ও মরিয়া প্রতিরোধ গড়ে কিন্তু পুলিশের বন্য হিংস্রতার কাছে ব্যর্থ হয়। এলোপাথারি লাটি চার্জ, কাঁদলে গ্যাস ছিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের ছত্র-ভঙ্গ করে দিয়ে এখানেও মুনিম, রাহাত, আসাদ, কবি রসুল, নীলা, রানু রোকেয়াসহ আন্দোলনরত কয়েক শ'ছাত্র-ছাত্রী গ্রেফতার করে।' (আমিনুর রহমান সুলতান ২০০৩ : ১২৯) কিন্তু গ্রেফতার হয়েও তারা পুলিশের ভ্যানে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে। বর্ণিত হয়েছে : 'কাঁটা তার আর পুলিশ ঘেরা মাঠটার মধ্যে গোল হয়ে বসলো ছেলেরা মেয়েরা। আর তারা প্রতীক্ষা করতে লাগলো কখন জেলখানায় নিয়ে যাবে। তাদের সকলের মুখে হাসি চোখে শপথের কঠিন্য।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৮৭)

'১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের আইউবি সামারিকশাসন প্রবর্তনের পূর্বকাল পর্যন্ত যদি হয় বাঙালির জাতীয় চেতনার রক্তে রঞ্জিত সংগ্রামী অধ্যায়। তাহলে সামরিক শাসন পীড়িত পরবর্তী সময় প্রবাহ হবে জাতীয় চেতনার অন্ধকারমুখী রক্তক্ষরণের কাল। ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের তরুণ নেতৃত্বই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গতিকে অব্যাহত রেখেছিলো। জহির রায়হান যখন এ উপন্যাস রচনা করেন তখন সমগ্র জাতি এক কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। শেখ মজিবুর রহমানের ছয় দফা এবং প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন সমূহের এগারো দফা কর্মসূচির বেগবান ঐক্যপ্রবাহ তখন সামরিক স্বৈরশাসনের ভিতকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ১৮৮) জহির রায়হান জাতীয় জীবনের এমন বিপর্যস্ত মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন আশাবাদী মানুষ মধ্যবিত্তের খেড়োখাতা উন্মোচন করে এবং বাঙালির প্রতিবাদী মানসিকতাকেই তিনি শুধু বর্ণনা করেননি বরং প্রতিটি চরিত্রকে অবমুক্ত করেছেন এবং জাতির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন উপন্যাসের শেষে। '...কবি রসুল চিৎকার করে উঠলো, জেলখানা আরো বাড়ান সাহেব। এত ছোট জেলখানায় হবেনা। আর একজন বললো। এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৯১)

বাংলাদেশের উপন্যাস নিরীক্ষার ক্ষেত্রে জহির রায়হান ছিলেন স্বতন্ত্র। চলচ্চিত্র ও সৃজনশীল সাহিত্যাঙ্গন উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। গল্পবলা ও দৃশ্যায়ণে সংযোগ স্থাপনে তার উপন্যাসগুলি স্বতন্ত্রমাত্রিক ও ব্যতিক্রমধর্মী। উপন্যাস শিল্পরীতির নতুন এই সম্ভাবনার কথা প্রথম উচ্চারিত হয় নব্য উপন্যাসতত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা আল্যারব গ্রীয়ের কণ্ঠে। চলচ্চিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ও যথাস্থিতবাদী ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করে তার রূপধর্মকে উপন্যাসে শিল্পায়িত করাই এ অভিপ্রায়ের মূলে কাজ করেছে। জহির রায়হানও তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসে নবমাত্রিক এই শিল্পরীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি সচেতনভাবে পরিমিতিবোধ থেকে এ উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। ঘটনাপুঞ্জ ও চরিত্র কাঠামোকে ক্যামেরার লেন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। পুরো উপন্যাসকে নয়টি পরিচ্ছেদ বিভাজন করেছেন। ভাষা ব্যবহারেও অপরূপ কারুকার্য লক্ষণীয়। বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে উপমা, অলঙ্কার ও চিত্রকল্পের নানা গাথুঁনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত ভাষার সারল্য, লোকজ বৈশিষ্ট্য ও কাব্যময়তার উদাহরণ এমন : 'সকালে

কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিলো পুরো আকাশটা। আকাশের অনেক নিচু দিয়ে মন্থর গতিতে ভেসে চলেছিলো একটুকরা মেঘ। উত্তর থেকে দক্ষিনে। রঙ তার অনেকটা জমাট কুয়াশার মত দেখতে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২৪)

উপমা ও প্রতীকের সংমিশ্রণে 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি শিল্পায়িত ধারায় স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণ করেছে। লেখক অতন্ত্য সুচারু রূপে এ উপন্যাসে অলংকার প্রয়োগ করেছেন। যথা :

- পাশ দিয়ে ঠিক গেন মেঘের মতো একটি ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখা গেলো নবাবপুরের দিকে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২৪)
- গায়ের রং তার রাতের আঁধারের মতো কালো। মসৃণ মুখ। খাড়া নাকের গোড়ায় পুরু ফ্রেমের চশমা, পরনে একটা ধবধবে পায়জামা। পা-জোড়া কিন্তু তারও নগ্ন! জুতো নেই। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২৫)
- বদ্ধ পাগলের মতো হাসে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২৭)
- চোখজোড়া বিড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছিলো ডলির। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৩২)
- হালকা দেহ,ক্ষীণ কটি, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৩৩)
- সরু ঠোঁটের নিচে একসার ইঁদুরে দাঁত। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৩৩)
- সারারাত এক লহমার জন্যে ঘুমোল না ওরা। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৬৮)
- কর্মচঞ্চল শহর রাত্রের মুখামুখি দাঁড়িয়ে এই বিষণ্ন বিকেলে হঠাৎ মৌন গভীর সমুদ্রে ডুব মেরেছিলো যেন। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৬৮)

জহির রায়হানের তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের মতো এখানেও শৈল্পিক মাধুর্য সৃষ্টিতে অকুণ্ঠ শিল্পী। সহজ সরল সাবলীল ভঙ্গিমায় চিত্রকল্পের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি উদ্ধৃত করেন এভাবে :

- ... তার দু-পাশে আকাশমুখী যে-গাছগুলো দাঁড়িয়ে তার নাম দেবদারু। ফাল্গুন আসতে সে গাছের পাতা ঝরতে থাকে। ....ছোট ছোট সবুজ পাতাগুলো ঝড়ে পড়ে রাস্তার ওপরে সবুজের আস্তরণ বিছিয়ে দেয়। ভোরের দিকে সেখানে শিশিরের অসংখ্য সোনালি বিন্দু আলতো ছড়িয়ে থাকে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২৫)
- রাত আটটা বাজার তখনো কিছু বাকি ছিলো। আকাশের ক্যানভাসে সোনালি তারাগুলো মিটমিট জ্বলছে। কুয়াশা ঝরছে। উত্তরের হিমেল বাতাস বইছে ধীরে ধীরে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৬৩)
- কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহীদেও খুন ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না।
  যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। পৃথিবী কাঁপছে। ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেঠে পড়েছে দিগবিদিগ। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৬৪)

মূলত এখানে তিনি বড় ধরনের চিত্রক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। ভাষা-কর্মীদের মৃত্যুর কোলে ঢলে-পড়ার বর্ণনার চিত্ররূপ এমন :

সূর্য তখন হেলে পড়েছিলো পশ্চিমে। মেঘহীন আকাশে দাবানল জ্বলছিলো। গাছে গাছে সবুজের সমারোহ। ডালে ডালে ফাল্গুনের প্রাণবন্যা। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৫৪)

মেয়েদের রূপ বর্ণনায়ও লেখক এমন বিচিত্র রকম চিত্রকল্প তৈরি করেন যা একজন ভাস্বর শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। এতে ঔপন্যাসিক হিসেবে একদিকে জহির রায়হানের শৈল্পিক প্রচ্ছন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তাঁর বাস্তববোধ জাগ্রত হয়েছে:

- মেঘকালো চুল পিঠময় ছড়ানো। চোখজোড়া কটাকটা আর চিবুকের ওপর একটা মস্তবড় তিল। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২২৬)
- ...টিয়ে রঙের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সামনের কৌচটিতে বসে পড়লো ডলি। পরনে তার হলদে ডোরাকাটা শাড়ি, গায়ে সিফনের ব্লাউজ। চুলগুলো সুন্দর বেণি করা। কপালে চন্দনের একটা ছোট্ট ফোঁটা আর কানে একজোড়া সাদা পাথরের টব। ডলিকে বেশ লাগছিলো দেখতে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৮৩)
- ...চোখ তুলে এবার তাকালো ওর দিকে। পরনে একখানা কলাপাতার রঙের পাতলা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগানো। চুলগুলো গোলাকার খোঁপা করা। ডলির চেয়ে কম সুন্দরী নয় সাহানা। (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৮৯)

তিনটি নারীচরিত্রের রূপময়তার এ বর্ণনা-কুশলতা উপন্যাসের বিষয়বিন্যাসকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছে। 'আরেক ফাল্গুন' তাই নিছক ভাষা-সংগ্রামের ওপর রচিত শিল্পকর্ম শুধু নয়, বরং জীবন-জগতের এক গভীর সত্য ও উচ্ছ্বাসকেও বাঙময় করে তুলেছে। বাংলাসাহিত্যের গবেষক বিষয় আর ভাবনায় আরেক ফাল্গুনকে জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে এ উপন্যাস। সামরিক শাসনের নিগ্রহের মধ্যে বাস করেও, একুশের মর্মকোষ-উৎসারিত আরেক ফাল্গুন পাঠ করে আমরা হয়ে উঠি সাহসী মানুষ।' (বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৯৯১ :২৯)

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে একুশের চেতনা জীবনবোধের যে উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল জহির রায়হান তাকে অন্তরে ধারণ করে আপন শিল্পমাধুর্য দিয়ে পরিচর্যা করেছেন যা এ উপন্যাসে ব্যঞ্জিত হয়েছে। শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সরদার জয়েনউদ্‌দীন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ সাহিত্যিক তাঁদের কথাসাহিত্যে জাতীয়চেতনা সিক্ত জীবন ও মৃত্তিকালগ্ন চৈতন্যকে বিবৃত করেছেন। কিন্তু জহির রায়হান চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়ায় দৃশ্য ও বর্ণনা একই সূত্রে গেঁথেছেন যা অন্যদের থেকে তাঁকে ভিন্ন আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

বাঙালি জীবন ও বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের মতোই তাৎপর্যবহ ও সুদূরপ্রসারী। জহির রায়হান সময়ের সন্তান হিসেবে এই জাতীয় ঐতিহ্যকে আকড়ে ধরেছেন, আপন চৈতন্য উর্বর করেছেন, দেশমাতার স্বাধীনতা রক্ষার্থে ঝাপিয়ে পড়েছেন অন্যদিকে ঐতিহ্যের চিরন্তনী শক্তিকে বেগবান করতে

কলমের লেখনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসেও একদিকে যেমন সদ্য অঙ্কুরিত নাগরিক মধ্যবিত্তের হালচাল চিত্রিত করেছেন তেমনি উল্লেখ করেছেন একুশের বৈপ্লবিক চেতনা স্পর্শে বাঙালির অপরিমেয় সম্ভাবনার উজ্জীবন। তবে এ উপন্যাসটি ত্রুটি মুক্ত নয়। এর অধিকাংশ চরিত্র একই সরল রেখায় আবর্তিত হয়েছে। মধ্যবিত্তের স্পর্শকাতর মানসিকতাকে অনেকাংশে ধরতে সচেষ্ট হলেও শেষপর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেন নি। তাছাড়া একুশের পরের ঘটনা হলেও তিনি বারবার ইতিহাসকে টেনে এনে কাহিনী বর্ণনা শ্লথ করে দিয়েছেন। একুশ উদ্‌যাপন ও প্রতিবাদী দৃশ্য চিত্রায়ণ করে তিনি যেমন দেশপ্রেমকে ব্যক্ত করেছেন তেমনি আগামী দিনের সম্ভাবনায় তাঁর আশাবাদী মনোভাব উপন্যাসটির স্বার্থকতার পথ প্রশস্ত করেছে। শুধু তাই নয় সদ্যজাত মধ্যবিত্ত মানস রূপায়ণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের সিংহভাগ মানসকে তিনি অতি স্বল্প পরিসরে স্থান দিয়ে দু:সাহাসিক সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও তিনি বাঙালির মানস রূপায়ণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন যা সত্যই বাস্তবধর্মী, যুক্তিনির্ভর ও অভিনব।

পর্যালোচনার সমাপ্তিতে বলা চলে পাকিস্তানি শোষণ নিপীড়নের ফলে সমস্ত বঙ্গভূমি তথা বাংলাদেশ যখন পরিণত হয়েছিলো বন্দীশালায় তখন বাঙালি বিচিত্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। 'আরেক ফাল্গুন'এ যেন এই প্রতিবাদ ও সংগ্রামের চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তাদের এই প্রতিবাদের উজ্জ্বল মহিমাময় দ্বীপ্তি নাগরিক জীবনবোধ থেকেই প্রস্ফুটিত। অন্যদিকে জহির রায়হানের আশাবাদী উদ্ধৃতি যেন পরবর্তী গণঅভ্যুত্থানের একটি অনিবার্য চিত্র। মোটকথা 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে তিনি বাঙালি মানস জাগরণের অবশ্যম্ভাবী প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন যার পরিণতি একাত্তরের মহান স্বাধীনতা।

বরফ গলা নদী

জহির রায়হানের সামগ্রিক মতাদর্শের দর্পণধর্মী উপন্যাস 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯)। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সূক্ষ্মমাত্রা আর সামাজিক বৈষম্য বিরোধী শ্রেণিচেতনা তীব্র ও তীর্থক ভাবে ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। শুধু তাই নয় মন্ময় কৌশলে সমাজ সংলগ্ন দারিদ্রের সংবেদনশীল নির্মম, দুঃসহ ছবি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মানসকিতা দিয়ে অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া সদ্য জন্ম নেওয়া বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চাল চরিত্র পরম বিশ্বস্ততা ও গভীর সহানুভূতি দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে মানুষের অন্তর আত্মার নানান ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে মনোবিশেষজ্ঞের মতো উপস্থাপিত করেছেন উপন্যাসিক।

'বরফ গলা নদী' বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের জন্মলগ্নে ব্যতিক্রমধর্মী অসাধারণ সংযোজনা। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে উপসংহারের কিছুটা আগের ঘটনা দিয়ে। এর পূর্বে জহির রায়হান 'তৃষ্ণা' উপন্যাস শুরু করেছিলেন শেষ দৃশ্য থেকে। তবে এ উপন্যাসে তিনি জীবনের বাঁকে বাঁকে আহরিত পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতাকে বিন্যস্ত করেছেন অতি নিপুণভাবে। সমাজের অন্যায় অনিয়ম দুর্নীতিকে খালি চোখে দেখেছেন এবং কোন রূপ বিকৃতি না ঘটিয়েই উপস্থাপন করেছেন পাঠকের সামনে। জহির রাহয়ান ছিলেন অতি মাত্রায় রাজনীতি সচেতন ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানেও রাজনীতির সূক্ষ্মমাত্রা ও সামাজিক অনাচারের নগ্ন মূর্তি যথাযথভাবে রূপায়িত হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হওয়ায় এ উপন্যাসে তাঁর মতাদর্শ ও চিন্তাধারা তীব্র, ঝাঁঝালো ও প্রখরভাবে ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসের শুরুটা হয়েছে নায়ক মাহমুদ ও তার স্ত্রী লিলির দাম্পত্য জীবনের দৃশ্য দিয়ে। পরে এই ঘটনা প্রবাহ ধাবিত হয় মাহমুদের পূর্বেকার পরিবারের দিকে। তার বাবা হাসমত আলী একজন কেরানি, মা সালেহা বিবি গৃহিণী। পাঁচ ছেলে মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার। সবার বড় সন্তান মাহমুদ পেশায় সাংবাদিক। পরবর্তী সন্তান মরিয়ম দু'মাস হলো এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে টিউশনি করে। এরপর হাসিনা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে যে তের পেরিয়ে চৌদ্দে পা দিয়েছে। ছোট দুই সন্তান দুলু ও খোকন। তিন মেয়ে দুই ছেলে ও স্বামী-স্ত্রীর বিরাট সংসার একজন ছা-পোষা কেরানি হাসমত আলীর পক্ষে চালানো কতটা কষ্ট সাধ্য তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। মেয়ে বিয়ের সময়ে তার অক্ষমতার চিত্র প্রকাশ পায় এভাবে : 'টাকার চিন্তা বারবার বিভ্রান্ত করে ছিলো তাঁকে। কেরানীর জীবনে সঞ্চয় সম্ভব নয়। হাসমত আলীও কিছু জমাতে পারে নি। অথচ ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিতে হলে মোটা অঙ্কের না হোক মোটামুটি একটা অঙ্কের প্রয়োজন।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৪৮)

তাঁর এ উপন্যাসে শ্রেণি সংগ্রামের স্পষ্ট প্রতিমূর্তি রূপায়িত হয়েছে। এখানকার সমাজে তিন শ্রেণির লোক রয়েছে। যথা- সুবিধাবাদী ধণিক শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণি। প্রথমত, সমাজের গভীর অসঙ্গতি, বৈষম্য, শোষণ, সুবিধাবাদকে তীক্ষ্ম চোখে অনুসন্ধান করেছেন এবং তার নগ্নমূর্তি উপস্থাপন করেছেন। এ শ্রেণির মধ্যে রয়েছে মনসুর

ও জাহেদ। উভয়েই আপন স্বার্থ সিদ্ধিতে পটু। আর যখন প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটে তখন নির্দিধায় সব কিছু অস্বীকার করে। জাহেদ মরিয়মকে প্ররোচনা করে বাড়ি ছাড়া করে অথচ যখন যে অসহায় হয়ে পড়ে তখন তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে মনসুর মরিয়মদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মেকি অন্তঃসার শূণ্য সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে তাকে হাতিয়ে নেয় কিন্তু জীবনের পূর্ব ইতিহাস জানার পর আস্তাখুরে ছুড়ে ফেলে। মরিয়ম ও মনসুরের কথপোকথন এমন :

> ওকে দেখে মনসুর বিস্ময়ের ভান করলো। 'তুমি এখনো আছো? অদ্ভূতভাবে ভ্রুজোড়া বাঁকালো সে।
> না থাকলেই কি তুমি খুশি হতে? গলাটা কাঁপছিলো মরিয়মের। ঘরের মাঝখানে টিপয়টার চারপাশে সাজানো সোফার উপর বসে অকম্পিত স্বরে মনসুর জবাব দিলো, এ সহজ কথাটা কি আর বোঝ না তুমি?
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৬৯)

এ উপন্যাসের আরেক শ্রেণির আনাগোনাও চোখে পড়ে যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তারা সংগ্রামী, নিজের ভাগ্যকে নিজেই গড়ে নিতে চায়। অন্যের কাছে তারা একেবারেই মাথা নত করতে চায় না, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী। এসব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে – মাহমুদ, আমেনা ও শাহাদাত। আমেনা ও শাহাদাতের সংগ্রামী জীবনের ব্যক্তিত্বশীল ভাবনা এমন : 'সে চায়না তাদের এই ক্ষয়ে ক্ষয়ে তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা সকলে দেখুক, উপভোগ করুক, বিশেষ করে তার ভাইয়েরা আর তাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা। ওদের চোখের কাছ থেকে নিজের দীনতাটুকু আড়াল করে রাখতে চায় আমেনা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৬৪)

সমাজের সাধারণ শ্রেণি হল নিম্নবিত্ত দরিদ্র শ্রেণি, লেখক অতি নিপুণভাবে তাদের জীবন প্রণালীকেও বিধৃত করেছেন এ উপন্যাসে। এ শ্রেণির প্রতিনিধি হল হাসমত আলী ও তার পরিবার। হাসমত আলী কোন এক অফিসের কেরানী যার অতি সামান্য বেতনে সংসার চালানো দায়। ছেলে মেয়েদের ঠিকমত লেখাপড়ার খরচ যোগাতে পারেনা। তাই তাদের উপর পূর্ণ অধিকার নেই তার। তিনি নীরবে দেখে গিয়েছেন সব কিছু। ভালমন্দ বলার সাহস দেখান নি। মাহমুদ ও মরিয়মের কথা শুনে তাঁর হীনমন্যতা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে : 'শুনেছিলেন আর মনে মনে নিজেকে বারবার অপরাধী বলে মনে হচ্ছিলো তাঁর। ছেলে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানোর গুরুভার বহন করতে পারেন নি তিনি। পারেন নি তাদের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে মানুষ করতে। তাদের শৈশব-যৌবনের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চরিতার্থ করতে। মনে মনে পীড়িত হচ্ছিলেন হাসমত আলী।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩২৯)

রাজনীতি সচেতন লেখক জহির রায়হান তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে কোন না কোনভাবে রাজনীতির আভাস দিয়েছেন। সেই ফলশ্রুতিতে এ উপন্যাসেও রাজনীতি এসেছে স্বমূর্তিতে। যদিও এটি তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস নয় তবু এর রচনা কাল ছিল বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রাক মূহুর্তে। তাই রাজনীতিকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'সিগারেটের মাথায় শুধু এক টুকরো আলো। বিড়ালের চোখের মত জ্বলছে। ভাষা নামক মানুষের আদিম প্রবৃত্তিও বোধহয় চিরন্তন এমনি করে জ্বলে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩১০)। ভাষা নিয়ে বাঙালির প্রতিবাদী চেতনাই এই জ্বলে ওঠার শামিল। তিনি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে স্পষ্টরূপে

ব্যক্ত করেন নি বরং রাজনীতির প্রভাবে সমাজ পরিবর্তনের রূপকেই গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন। লেখক সমাজ চিত্রকে নিরপেক্ষ দর্শক রূপে বর্ণনা করেছেন। মাহমুদ যে সমাজে বাস করে সে সমাজের পরিবেশ পরিকল্পিত ও পরিপাটি আবাসিক এলাকা নয়। সে সমাজ রুগ্ন ক্ষয়ে যাওয়া আস্তর ওঠা সমাজ। তাদের বাসস্থলের বর্ণনায় লেখক বলেছেন : 'চারপাশ নোঙরা আবর্জনা ছড়ানো। কলার খোসা, মাছের আমিষ, মরা ইঁদুর। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পায়খানা, সব মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। দুর্গন্ধে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ...এদিকে গলিটা আরো সরু হয়ে গেছে। একজনের বেশি লোক পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে না।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৯৯)

অন্যদিকে তাদের ঘরের বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন মানুষের জীবন প্রণালীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ণিত আছে:

> দোরগোড়ায় একটা নেড়ি কুকুর বসে বসে গা চুলকাচ্ছিলো। তাদের দেখে এক পাশে সরে গেলো সে। এতক্ষণে নাকের উপর চেপে রাখা আঁচলটা নামিয়ে নিলো লিলি।
>
> দরজাটা পেরুলে একটা সরু বারান্দা। দু'পাশে দুটো কামরা। একটিতে মাহমুদ থাকে। আরেকটিতে মরিয়ম আর হাসিনা। বারন্দার শেষ প্রান্তে আরো একটি কামরা আছে। ওটাতে মা আর বাবা থাকেন। দুলু আর খোকনও থাকে ওখানে। ও ঘরটার পেছনে পাকঘর আর কুয়োতলা, কুয়োতলায় যেতে হলে মা-বাবার কামরার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। অন্য কোন পথ নেই।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৯৯)

কার্যত, 'উপনিবেশ শৃঙ্খলিত শোষণমূলক সমাজের জীর্ণ ও বিপন্ন অবস্থার প্রতীক হাসমত আলীর বাসভবন।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ১৬১)।

এই উপন্যাসে বেশ কিছু পেশাজীবীদের চালচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। 'বাংলাদেশের উপন্যাসের ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর যে সব চরিত্র রূপায়িত হয়েছে তার মধ্যে জহির রায়হানের বরফ গলা নদী উপন্যাস অন্যতম।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০০৮ : ২২৬)। পেশা হিসেবে এ উপন্যাসে বিভিন্ন ব্যবসার উল্লেখ রয়েছে। এখানকার অন্যতম ব্যবসায়ী মনসুর তবে তার ব্যবসা সম্পর্কে লেখক বেশি কিছু বলেন নি। জানা যায় বিয়ের আগে সে গাড়ি কেনে কিন্তু বিয়ের পর সে ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে সারাদিন ঘরে থাকত। তারপরও তার বাড়ি গাড়ির কমতি ছিল না। তবে সে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাভোগী প্রতিনিধি। দারিদ্রের সুযোগে মরিয়মদের পরিবারকে করায়ত করেছে এবং মরিয়মকে বিয়ে করেছে। তাকে ভালোবাসে নি তাই মরিয়মের পূর্ব জীবনের কথা শুনেই প্রত্যাখান করেছে। আবার মরিয়মের মৃত্যুর পর তার ভাইকে সহানুভূতি দেখিয়েছে। এভাবে বাঙালি ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তের মনের ওঠানামা এবং দোলাচলকে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

এ উপন্যাসে আরেকটি ব্যবসার উল্লেখ রয়েছে– ঠিকাদারি ব্যবসা। অল্পকাল ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশা হিসেবে যুক্ত হয়েছে এটি। রফিক এ পেশার প্রতিনিধিত্বকারী। বি.এ পাশ করে বেকার থাকলেও একসময় কন্ট্রাক্টরের

সহযোগী হিসেবে কাজ শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজেই কন্ট্রাক্টর হয়ে যায়। অল্পদিনে অনেক অর্থের মালিক হয়। পেশা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে : 'স্বাধীন ব্যবসা। বড় বড় কন্ট্রাক্টর পাচ্ছে আজ কাল। রাস্তা মেরামত বাড়ি ঘর তৈরি কিংবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ইট, চুন, সুরকি ও লোহা লক্কর সরবরাহের কন্ট্রাক্টর।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৮৪)

ক্ষুদ্র শিল্পাশ্রয়ী বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি 'প্রান্তিক' প্রেসের মালিক শাহাদাত। বউয়ের অনুমতি না থাকায় সে চাকুরিতে যায় নি। স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রির টাকা দিয়ে টাইপ মেশিন কিনেছে তবে মূলধন বাড়াতে পারেনি। রাতারাতি ধনী হওয়ার জন্য জুয়া খেলেও অর্থ সঞ্চয় করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ঢাকা ছেড়ে ভৈরবে গিয়ে স্টেশনারির দোকান দেয়। বর্ণিত আছে : 'প্রেসটা বিক্রি করে দিয়েছে ওরা। ভৈরবে একটা স্টেশনারী দোকান কিনেছে। প্রেসের মালিক অবশেষে স্টেশনারী দোকানের মালিক হতে চললো। কাউন্টারে বসে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করবে শাহাদাত। তবু কারো চাকরি সে করবে না।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৬৪)

উপন্যাসটিতে পেশাজীবীদের মধ্যে শিক্ষকতারও উল্লেখ রয়েছে মরিয়ম ও লিলির চরিত্রে। দরিদ্রতার কারণে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তারা। 'পুরুষ শাসিত সমাজে জীবিকার্জনে গৃহের বাইরে এসে তাদের নানা রকম ভালো-মন্দ অভিজ্ঞতা ঘটেছে।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০০৮ : ২৩০)। স্কুলের চাকুরি প্রার্থী মরিয়ম টিউশনি করে উপার্জন করে দু'বার প্রতারণার শিকার হয়। অন্যদিকে স্কুল শিক্ষিকা পিতৃমাতৃহীন লিলি ভাই-ভাবীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এভাবে শিক্ষকতার মতো মহান পেশা কিভাবে কলুশীত ও উদ্দেশ্য প্রবণ হয়ে ওঠে তার বাস্তবিক চিত্রও লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

এছাড়া এ উপন্যাসে সাংবাদিকতা পেশার আদ্যপান্ত বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনে তিনিও সাংবাদিক ছিলেন। তাই এ পেশার ভেতর বাহিরের প্রকৃত সংবাদ উপস্থাপন করেছেন সাহসিকতার সঙ্গে। এ উপন্যাসে মাহমুদ হল নিম্নমধ্যবিত্ত শহুরে চাকুরিজীবীর সন্তান। কিন্তু মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। আর তাই মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে 'মিলন' পত্রিকার সাব-এডিটর হিসেবে সাংবাদিকতায় যোগদান করে। সে লুই ফিশারের মতো সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক হতে চেয়েছিল। কিন্তু এক বছরের মাথায় সে চেতনা পাল্টে যায় বাস্তবিক ঘটনা প্রবাহের কারণে। বর্ণিত আছে : 'লুই ফিশার হওয়ার কল্পনায় যে একদিন বিভোর ছিল সে আজ আর তেমনি স্বপ্ন দেখতে পারে না।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩১৩)

সাংবাদিকতার মতো মহৎ পেশা তখন রাজনৈতিক কারণে কুলষিত হতে থাকে। উপন্যাস রচনা কালে আইউবি শাসন বিদ্যমান ছিল। তখন গণতন্ত্র বলে কিছু ছিল না। বিরোধী দলকে দমন করতে প্রেস ব্যবহৃত হত। প্রেসও পা-চাটা গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। জহির রায়হান সেই হতাশা ব্যঞ্জক পেশার সচিত্র এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মাহমুদের চরিত্রে:

সাংবাদিক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে আজ সে লজ্জা বোধ করে। সে তো সাংবাদিক নয়, মালিকের হাতের একটি যন্ত্র বিশেষ। কর্তার ইচ্ছেমতো সংবাদ তৈরি করতে হয় তাকে। তাঁরই ইচ্ছেমতো বিকৃত খবর পরিবেশন করতে হয়। মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে মন। তখন সে ভাবে, যদি তার টাকা থাকতো তা হলে নিজে একখানা পত্রিকা বের করতো মাহমুদ। সুস্থ সাংবাদিক হতো যার আদর্শ।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩২২)

মূলত 'সাংবাদিকতার জগতেও যে কুশ্রী মিথ্যাচার আছে, শ্রেণী বৈষম্য আছে, হৃদয়হীনতা আছে– যা হবেই কেননা সাংবাদিকতার জগৎ তো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তা জহির রায়হান দেখিয়েছেন মাহমুদ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার সময়।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৫৩)

বাঙালির নিম্নমধ্যবিত্তের আর একটি পেশা হল রেস্তোরা মালিকের ব্যবসা। এ উপন্যাসে খোদাবক্স তার অন্যতম উদাহরণ। বিশ্রামাগার নামে ছোট একটি রেস্তোরার মালিক সে, তার খদ্দেররা সবাই অল্পবিত্তের লোক, বেকার, শিক্ষিত তরুণ। তাদেরকে ধরে খাওয়াতো এই আশায় একদিন চাকুরি পেয়ে সব কিছু শোধ করে দিব। তার আশা এমন :

তার খদ্দেরদের বেকারত্ব ঘুচুক, তারা ভালো চাকরি পাক এটা সে আন্তরিকভাবে কামনা করে। অবশ্য ভালো চাকরি পেলে হয়তো এ রেস্তোরায় আর আসবে না, অভিজাত রেস্তোরায় গিয়ে চা খাবে। এদিক থেকে ওদের হারাবার ভয়ও আছে খোদাবক্সের। কিন্তু বাকি টাকাগুলো ওদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে, এই তার সান্ত্বনা।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩১৩)

সে তরুণ খদ্দেরদের চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজে দিত, খবরের কাগজ সরবরাহ করত, চাকরির আবেদন করার জন্য উৎসাহ দিত। শুধু তাই নয়, নিকটবর্তী বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের সার্বিক খবর পরিচয় রাখত ও উৎসাহী খদ্দেরদের পরিবেশন করত। এমন বর্ণনার মাধ্যমে সমাজে চরিত্র স্খলনের দৃশ্যও লেখক রূপায়ণ করেছেন।

লেখক এসব ঘটনা বিবরণের মধ্য দিয়ে সদ্যজন্ম নেওয়া মধ্যবিত্ত সমাজের প্রকৃত মূর্তি উপস্থাপন করেছেন। এ সমাজে জীবন প্রবাহ মসৃণ নয়, আছে প্রতিবন্ধকতা, গ্লানি, অস্তিত্বসংকট, নৈতিক স্খলন, অনাচার, স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থতা, ব্যক্তিত্ববোধ আকড়ে রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা। আর এই বিধ্বস্ত সমাজে মানুষ হয়ে যায় অমানুষ, নির্দয় ও স্বার্থপর। লেখক সেই ক্রুর রূপটি প্রকাশ করেছেন মাহমুদের মধ্যে :

আমি তো দুটি সম্পর্ক ছাড়া আর কোন কিছু অস্তিত্বই দেখি না। ওই বড়লোকের বাচ্চাগুলো যারা মুরগির মতো টাকার ওপর বসে বসে তা দিচ্ছে আর আমরা গরিবের বাচ্চারা যাদের ওরা ছোটলোক বলে। এই দুটো সত্য ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না আমার। তুমি হয়তো মনে বড় আঘাত পাচ্ছো, কিন্তু কি আর বলবো বলো, ওরা হলো আমাদের মা-বাপ। আর আমরা ওদের ছা-পোষা, জীব।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৭৪)

জহির রায়হান ছিলেন আশাবাদী মানুষ। জীবনের প্রতি বাঁকে তাঁকে কঠিন সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে তবু পিছুপা হন নি। সাহসকিতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন। আশায় বুক বেঁধেছেন নতুন বার্তায়। নিলিপ্ত প্রশান্তির কোলে আত্মসমাহিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই আশাবাদী রূপ লিলির চেতনায় প্রকাশিত :

> ...ভালবাসার বাঁধ দিয়ে ধ্বংসের প্লাবন রোধ করবে সে।
>
> ... হাতের স্পর্শে ওর হৃদয়ের সকল ব্যথা আর সমস্ত যন্ত্রণার উপশম করে দিতে পারবে। তার ভেতরে বেদনার সামান্য চিহ্নটিও থাকতে দেবে না লিলি।
>
> থাকবে শুধু আনন্দ। অনাবিল হাসি, তৃপ্তি ভরা শান্ত সিগ্ধ সুন্দর জীবন। যেখানে অশ্রু নেই,
>
> বিচ্ছেদ নেই, হাহাকার নেই, প্রেম প্রীতি আর ভালোবাসার একচ্ছত্র আধিপত্য সেখানে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ২৯৭)

এভাবে উপন্যাসটিতে শ্রেণিভূক্ত উপনিবেশিক সমাজের বর্হিজীবন ও অন্তর্জীবনের পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিকুল সময় ও সমাজপটে শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের বহুমাত্রিক সংকটের বহুমুখী দৃষ্টিকোণ রূপায়িত হয়েছে উপন্যাসটির স্তরে স্তরে।

চরিত্র চিত্রণে জহির রায়হান সিদ্ধহস্ত। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও ঘটনার চেয়ে চরিত্রের বিস্তারকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বেশ কিছু চরিত্রের সাবলীল পদচারণায় মুখরিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। তাঁর এ উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র মাহমুদ। পেশায় সাংবাদিক। বছর তিনেক পূর্বে বি.এ পাশ করেছে। অনেক স্বপ্ন নিয়ে সে সাংবাদিকতা পেশা বেছে নিয়েছে। লেখকের বর্ণনায় : 'অনেক আশা নিয়ে একদিন মিলন পত্রিকায় চাকরি নিয়ে ছিলো মাহমুদ সাব এডিটরের চাকরি। মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন। অর্থের চেয়ে আদর্শ সাংবাদিক হওয়ার বাসনাই ছিলো প্রবল। কালে কালে একদিন লুই ফিশার হবে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩১১)

কিছুদিন যেতে যেতে এ পেশার নির্মম রূপ প্রত্যক্ষ করলো। মাইনের টাকা বাড়ানোর আশ্বাস দিলেও তা বাড়েনি। এমনকি চাকুরির অভাবে পঁচিশ বছরের যুবকের আত্মহত্যার সংবাদ ছাপাতে চাইলে নিউজ এডিটরের কারণে পারেনি। অন্যদিকে বিরোধীদলের জনসভায় ৫০ হাজার লোকের উপস্থিতি থাকলেও তাকে ছাপাতে হয়েছে পাঁচ হাজার লোকের কথা। আর এই প্রবঞ্চনাই তাকে বিপ্লবী করেছে। সমাজের বিদ্যমান অবস্থানই তাকে ক্ষুদ্ধ, বদমেজাজী ও প্রতিবাদী করে তুলেছে; শেষ পর্যন্ত এই পেশাকে বৃদ্ধাগুলি দেখিয়েছে। এই পেশা সম্পর্কে বলেছে : 'সাংবাদিক হবার স্বপ্ন ছিলো, সে তো চুরমার হয়ে গেছে। সাংবাদিকতার নামে গণিকাবৃত্তি করেছি এক বছর। মালিকের হুকুম তামিল করেছি বসে বসে। তেলকে ঘি বলতে বলেছে, বলেছি। হাতিকে খরগোশ বানাতে বলেছে, বানিয়েছি। তবু বেটারী বেঈমানী করলো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৩২-৩৩৩)

পরে মাসে নব্বই টাকা বেতনে প্রেসে প্রুফ রীডারের চাকুরি নিয়ে নেয়। মাহমুদ লড়াকু সৈনিক। সংগ্রামী, লড়াকুরা ভাগ্যবাদী কিংবা ভাববাদী হয় না। তারা নিজ পরিশ্রমে ভাগ্যকে বদলাতে চায়। তাই তারা বিধাতায় বিশ্বাসী নয়। মাহমুদের চরিত্রেও এমন ধর্ম লক্ষণীয়। মরিয়মের বিয়েতে স্বাধ থাকা সত্ত্বেও যখন স্বাধ্যি হলোনা তখন মাকে কটাক্ষ করে বলেছে : 'মা, রোজ পাঁচ বেলা যার কাছে মাথা ঠোকো তাকে ভুলেও কি একবার জিজ্ঞেস করতে পারো না; এত স্বাদ আহ্লাদ দিয়ে যদি গড়েছেন তোমাদের, সেগুলো পূরণ করার মত সমার্থ্য কেন দেন নি?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৪৯)

মাহমুদ জহির রায়হানের মানসপুত্র। তাই তাঁর চেতনার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য মাহমুদের চরিত্রে সংযোজিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনে জহির রায়হানও অনেক বিড়ম্বনার শিকার হন। বাস্তব অভিজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ায় তিনি সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে ভাববিলাসী হন নি বরং বাস্তববাদী হয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তিক্ত আলোকের দ্যুতি ছড়িয়েছেন। তাঁর মতে, বড়লোকেরা হৃদয়হীন, সুবিধাবাদী ও আত্মসুখ পরায়ণ হয়। আর এ উপন্যাসে মাহমুদের চেতনাও অনুরূপ। সে জানে বেশি বড়লোক হতে হলে মানুষকে অসাধু পথ অবলম্বন করতে হয়, প্রতারণা করতে হয়। তার ভাষায় : 'এদেশের ক'জন লোক আছে যে তার চরিত্র ঠিক রেখে বড়লোক হতে পেরেছে? অন্যকে ফাঁকি দিয়ে, ধোঁকা বাজ আর লাম্পট্য করে, শোষণ আর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে সব। তাদের আবার চরিত্র।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৪৭)

শুধু তাই নয় আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল বাবা মা যখন উচ্চ শ্রেণির অর্থসম্পন্ন ছেলে পেয়ে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিল তখন মা-বাবাকে তীর্যক ও হৃদয়হীনভাবে কটাক্ষ করেছে। এখানেও তার স্পষ্টবাদীতার পরিচয় পাওয়া যায় : 'টাকার জন্যে যে তোমরা আত্মা বিক্রি করছো তা আমি জানি।'... লোকটার যদি টাকা পয়সা না থাকতো সে যদি তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে এটা সেটা কিনে না দিতো তাহলে কি আর তাকে অমন মাথায় তুলে নাচতে তোমরা?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৪০)

উনিশ শতকে বাঙালি মনীষী অক্ষয় কুমার দত্ত পরিশ্রম ও প্রার্থনার যে সমীকরণ দিয়েছিলেন সেই উক্তিগুলি মনে পড়ে যায় মাহমুদের উক্তির মধ্য দিয়ে। সে সৎ, পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান। তারপরও কোথাও মূল্য পায় নি। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ আছে : 'সে পুরুষ। পাঁচশো টাকা আয় করার মতো সামর্থ কোন দিন তার হবে না। হবে না এজন্য যে তার শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই, যোগ্যতা নেই। হবে না এজন্য যে তার কোন বড়লোক হিতৈষী নেই, মন্ত্রী আত্মীয় নেই, অসৎ পথে অর্থ রোজগারের প্রবৃত্তি নেই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৪১)

তবুও জীবন যুদ্ধে বার বার হেরেও তার সত্য বলার ক্ষমতা দমে যায় নি। হাজার কষ্টের পরও সে অন্যায় পথে পা বাড়ায় নি। সৎ নিষ্ঠার সঙ্গে ক্ষুদ্র কাজই করেছে। অন্যের কাছে মাথা নত করে নি। ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেয় নি। আর

স্পষ্টভাবে কঠিন সত্য বলেছেন নির্লিপ্ত কণ্ঠে। তার ভাষ্য এমন : 'অন্যকে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পার তুমি কিন্তু প্রয়োজনে কারো কাছে থেকে একটা কানাকড়িও পাবে না। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৬৫)। অবস্থানগত দিক থেকে মাহমুদ ছোট সাংবাদিক। ছোটর যন্ত্রণা সবখানে বিশেষ থাকে মাৎসন্ন্যায় সমাজে। 'মাহমুদের মতো সৈনিকেরা তাদের নিষ্ঠা, সততা, স্বপ্ন, কল্পনা নিয়ে পেশাগতভাবে ঠিকমত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, কেবলই বঞ্চনার শিকার হয়। সুবিধাবাদী সবলেরা তাকে গ্রাস করতে চায়। তারপরও মাহমুদ লড়াই করে, স্বপ্ন দেখে যে সে বিশ্ব বিখ্যাত সাংবাদিক লুই ফিশার হবে।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৫৩)। জহির রায়হান তার চরিত্রে মধ্যবিত্তের সকল বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেন। সে সৎ, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে নোংরা বস্তিতে থাকে। জীর্ণ পুরানো ছোট বাসা যেখানে বৃষ্টি এলে ফাটল বেয়ে পানি পড়ে। এত কিছুর পরও বিবেক অস্বীকৃত কাজ করে না, কুণ্ঠিত হয় না চাকুরি ছেড়ে দিতে। ব্যক্তি জীবনে জহির রায়হানও এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁকে দিয়ে কেউ অন্যায় কাজ করাতে পারে নি। সাংবাদিকতা পেশার মেকি রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছেন এবং কলমের লেখনী দিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। মাহমুদকে লেখকের সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রলেপ দিয়ে অঙ্কন করেছেন।

জহির রায়হানের মমতায় সৃষ্ট আর একটি চরিত্র মরিয়ম। দু'মাস হল আই.এ পরীক্ষা দিয়ে গৃহ শিক্ষক হয়েছে এবং একটি স্কুলে চাকুরির জন্য চেষ্টা করছে। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন : 'হাসিনার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। রঙটা ওর ফর্সা, ধব ধবে। মায়ের দেহ-লাবণ্যের উত্তরাধীকারী হয়েছে সে। চেহারাটাও মায়ের মত সুশ্রী। আর চোখজোড়া খুব বড় না হলেও হাসিনার মত কটা নয়।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩০১)। সে খুব বিশ্বাস প্রবণ মানুষ। অল্পতেই অন্যকে বিশ্বাস করে ফেলে। তাই বারবার প্রতারণার শিকার হয়। প্রথম জাহেদ নামে একটি ছেলেকে বিশ্বাস করে তার হাত ধরে চট্টগ্রাম চলে যায়। কিন্তু সে তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে মুনসুর নামে এক ধনী ব্যক্তির প্রেমে পড়ে। নানা রকম সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে মরিয়ম ও তার পরিবারের মন জয় করে। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতে তার জীবন জোয়ারের উচ্ছ্বাসে মনসুর প্রবঞ্চনা করে। তার অত্যাচার ও অনুদার ব্যবহারে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। পিতৃ গৃহে ফিরে এসে জীর্ণ বাড়ি ধসে পড়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে তারও মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। মনসুরকে জাহেদের সব সত্যি কথা খুলে বললে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে লিলি তাকে বলেছে : 'অত সত্যবাদী হতে নেই ম্যারি। এ সমাজে বাঁচতে হলে মিথ্যার মুখোশ পরে চলতে হয়।... বড় সরল মেয়ে তুমি। এ সমাজের কিছুই জান না।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৬১)

মরিয়ম সহজ সরল হলেও মধ্যবিত্তের অস্থিরচিত্ত তার মধ্যে বিদ্যমান। সেকারণে একজনের আঘাত ভুলে যেতে না যেতে অন্যকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। সেই ভুলের মাশুল তাকে জীবন দিয়ে পরিশোধ করতে হয়েছে। মরিয়মের মতো শিক্ষকতা পেশার আর একজন প্রতিনিধি লিলি। এ উপন্যাসের প্রথমে, উপসংহারের আগে ও উপসংহার অংশে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রয়েছে। মরিয়মের বান্ধবী, একটি স্কুলে চাকুরি পেয়েছে। সেও ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বড় হয়েছে। মা-বাবা হীন এই মেয়েটি ভাইয়ের কাছে মানুষ হয়। কিন্তু ভাই-ভাবির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়

বাসা ভাড়া করে আলাদা থাকে। এখানে মধ্যবিত্তের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। তবে সে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন। অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সামনের পথে চলে। তার বাস্তব সম্মত বক্তব্য এমন :

> তুমি তো জান, দুটি ছেলেকে ভালোবেসেছিলাম আমি। একজন ছিল খুব ভালো অভিনেতা আর একজন গায়ক। সেসব অতীতের কথা, তাই বলে ভবিষ্যতে আমি কাউকে ভালোবাসবো না, তাতো নয়। হয়তো ভালোবাসবো, কিন্তু ওদের কারো কথা আমি বলবো না তাকে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৬২)

শেষ পর্যন্ত মাহমুদকে বিয়ে করেছে লিলি। সবাইকে হারিয়ে মাহমুদ যখন বিপন্ন-বিধ্বস্ত তখন তার শিয়রে বিচূর্ণ অস্তিত্বের মায়াবী সান্ত্বনা প্রদায়ী নারী হিসেবে দাঁড়িয়েছে সে। বাস্তব চেতনায় প্রদীপ্ত শিখায় আলোকিত করে মাহমুদের পুনর্জীবন দান করেছে। একদিন তাদের সুখের সংসারে কোল জুড়ে আসে একটি মেয়ে নাম রাখে মিতা। এভাবে লেখক এ চরিত্রটিকে পথ নির্দেশক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

জহির রায়হানের অপূর্ব শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন হাসিনা চরিত্র নির্মাণে। দরিদ্র ঘরের স্বপ্নতাড়িত, চঞ্চল, উচ্ছল কিশোরী রূপে তার পদচারণা। সব কিছুতেই তার কৌতূহল, সৌন্দর্য পুজারী, সাধ্য না থাকলেও স্বাধ ছিল অনেক। নতুন জামা কাপড় পরতে পছন্দ করত। ছবি তোলার জন্য লিলির কাছে বায়না করে মুনসুরকে ক্যামেরা কিনে দিত বলে। সমগ্র উপন্যাসে হাসিনার অকপট সরলমাখা পদচারণা দৃশ্যমান। যে রাতে ছাদ ধ্বসে পড়লো, সেই রাতে ছাদে তসলিমের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় হয় তার। হাসিনার সেই স্বপ্ন, সেই আবেগ যেন চাঁদের টুকরোর মতো ঝরে পড়ে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই সেই স্বপ্ন চাপা পড়লো ধ্বসে পড়া ছাদের নিচে, বৈষম্যমূলক সমাজের নিষ্ঠুর জাতাকলে। তার মৃত্যুর দৃশ্য মাহমুদ এভাবে বর্ণনা করে : 'বাচ্চা নয়, কুত্তার বাচ্চা। নইলে এমন করে মরতে হলো কেন? দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে উঠলো মাহমুদ।' (জহির, ২০১৩: ৩৭৯)। 'মরিয়ম, লিলি, হাসিনা এই তিনটি নারী চরিত্র চিত্রণে অবশ্য হাসিনা কিশোরী-জহির রায়হান অতুলনীয় দরদবোধের পরিচয় দিয়েছেন, শিল্পবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৫৮)

এ উপন্যাসের আর একটি চরিত্র হাসমত আলী। নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি। তিনি অফিসের কেরানী। পাঁচ সন্তান ও স্বামী-স্ত্রীর বড় সংসার তাঁর মতো ছা-পোষা মানুষের পক্ষে স্বচ্ছলভাবে চালানো সম্ভব ছিলনা। ছেলে মেয়েদের পড়ার খরচ দিতে পারেন নি। তাদেরকে নিজে উপার্জন করে লেখাপড়া করতে হয়েছে। এটি নিয়ে তাঁর ভেতর অনেক অপরাধবোধ কাজ করে। ছেলে-মেয়েদের অনেক অন্যায় কর্মেও প্রতিবাদ করে নি, শাসন করে নি। তাঁর এই দৈন্যতার মধ্যে তরুণ ব্যবসায়ী মনসুর বড় মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অর্থের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি গভীরতর বেদনার নিক্ষিপ্ত হন কিন্তু তাকে নিষেধ করতে পারেন নি। নির্মম দারিদ্র আর নিত্য অভাবের বিরস বিড়ম্বনায় তিনি ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন। বর্ণিত আছে :

> স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত সমস্ত পরিবারকে দুর্বার বেগে তার কাছে টেনে নিয়ে এলো মুনসুর। হাসমত আলীকে বাবা বলে সম্বোধন করলো সে, সালেহা বিবিকে মা। খোকনকে একটা ফুটবল কিনে দিলো, দুলুকে একটা প্লাস্টিকের পুতুল। হাসিনার জন্য ওর পছন্দমত একটা শাড়ী কিনে আনলো- আর মরিয়মের জন্য নানারকম টনিক, ফ্রুটস্, আর হরলিক্স। দারিদ্র-বিধ্বস্ত পরিবারে খোদার ফেরেস্তা হিসেবে আর্বির্ভূত হলো মুনসুর।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৩৮)

আর অন্যের সাহায্যে বাঁচার গ্লানিবোধ থেকে তাঁর মধ্যে স্বপ্ন জন্ম নেয় যে, তার বড় ছেলে একদিন বড় চাকুরে হবে। সংসারে তাদের স্বচ্ছলতা একদিন ফিরে আসবে। অন্যের করুণার মুখাপেক্ষী হতে হবে না আর। মাহমুদ সম্পর্কে তাঁর আশাবাদী চিন্তা এমন :

> স্বভাবে উচ্ছৃলতা দোষ থাকলেও সে নিশ্চয় বখাটে ছেলে নয় তা বোঝেন হাসমত আলী। সংসারে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রতিমাসে সাহায্য করছে সে। লেখা-পড়া আর জানা শোনার দিক থেকেও বাবার চেয়ে সে অনেক বড়। তাছাড়া ছেলে মেয়েদের সকলের ভবিষ্যৎ ওর হাতে নির্ভর করছে। ... মাহমুদ একদিন একটা ভালো চাকরি পেয়ে যেতে পারে? সে আশা রাখেন হাসমত আলী।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩২১)

এ চরিত্রের আরেকটি সম্পূরক চরিত্র সালেহা বিবি, তাঁর স্ত্রী। তবে চরিত্র দুটি বৈষম্যের শিকার। এছাড়া অস্থির সময়ের দোলাচল মানসিকতা বিদ্যমান তাদের মধ্যে। তাই তো মনসুরের কপট উদ্দেশ্যের কাছে মাথা নত করে কোন রূপ খোঁজ খবর না নিয়েই মেয়েকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন। তার মিথ্যা আশ্বাসে আশায় বুক বেঁধেছেন যে একদিন তাঁরা নোংরা গলি ছেড়ে অন্যত্র ভালো বাসা নিবে। তবে শেষ পর্যন্ত করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয় তাঁদের। তাঁদের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এভাবেই বাস্তবিক জীবনে সাধারণ চরিত্র হিসেবে লেখক তাঁদের উপস্থাপনা করেছেন।

'বরফ গলা নদী' উপন্যাসের আরো দুটি অসামান্য, জীবন্ত, লড়াকু চরিত্র শাহাদাৎ ও আমেনা। আমেনা ধনী পরিবারের সন্তান। শাহাদাতের হাত ধরে সে ঘর ছাড়া হয়েছে। তাকে অন্যের গোলামী করতে দিতে চায় না আমেনা। তাই সে শত কষ্ট সহ্য করে। অন্যদিকে ব্যবসায় বাঁকা পথ ধরার প্রবৃত্তি না থাকায় শাহাদাৎ বিপদগ্রস্ত হয়। কঠিন বিপদে অস্তিত্ব সংকটের মুহূর্তেও তারা হার মানে নি। ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রেস মেশিন বিক্রি করে শহরের ক্রুর প্রতিবেশ থেকে দূরে গ্রামে গিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচতে চেয়েছে। মূলত এ দুটি চরিত্র জহির রায়হানের সংগ্রামী মতাদর্শের উজ্জ্বল উদাহরণ।

জহির রায়হানের বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজস্থ বিভিন্ন ইতিবাচক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে এ উপন্যাসে বেশ কিছু নেতিবাচক সুবিধাভোগী চরিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি চরিত্র মনসুর। উপন্যাসে অজ্ঞাত ব্যবসায়ী সে। সেলিনার বড় বোনের দেবর। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে চকলেট রঙের মোটর গাড়ি কেনে। মরিয়মকে নয় তার লাবণ্যপ্রদ দৈহিক রূপকান্তিকে ভালোবেসেছিল। মরিয়মের দেহের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে মনসুরের মত বড়লোক ধনী

মরিয়মের নোংরা বাসায় যেতেও দ্বিধা করে নি। গোটা পরিবারকে করুণার তৃণের মতো ভাসিয়ে দিয়েছে সে। নির্মম দারিদ্র্যের কারণে তার মেকিত্বকে যাচাই করতে পারে নি মরিয়মের পরিবার। তবে মাহমুদ প্রতিবাদ করেছিল। মরিয়মকে বলেছে : 'কতদিন বলেছি বড়লোকের বাচ্চাগুলোকে আমি দেখতে পারি না, আর তুমি সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোও?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩২৮)

তবে স্বার্থ চরিতার্থ করার পর মনসুর মরিয়মকে পরিত্যাগ করে। তাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই রাতেই বাড়ি ধ্বসে তার মৃত্যু হয়। মরিয়মের মৃত্যুর পর তার কিছুটা অনুতাপ হওয়ায় মাহমুদকে সহানুভূতি জানাতে আসে। বর্ণিত আছে : 'পেছন থেকে এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরলো মনসুর। ঢোক গিলে বললো আমার ওখানে চলুন ভাইজান।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৮০)। পরে আবার সে সেলিনাকে বিয়ে করে সংসার করে। এভাবে লেখক এ চরিত্রে ভাল-মন্দ উভয় দিকই ফুটিয়ে তুলেছেন।

ধণিক শ্রেণির সুবিধাবাদী চরিত্র উপস্থাপনে আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন নাম রফিক। মাহমুদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনেক চেষ্টা করেও সে একটা চাকরি যোগাতে পারে নি। তাই বাধ্য হয়ে অসৎ পথ অবলম্বন করেছে, অমানুষ হয়েছে। কণ্ট্রাক্টরের সহকারী হিসেবে কাজ করে। তারপর প্রতারণা চক্রে প্রথমে সাব কণ্ট্রাকটর ও পরে কণ্ট্রাক্টর হয়ে যায়। অসৎ পথে বড়লোক হওয়ার পর যাকে ভালোবাসতো তারই সতীত্ব নাশ করে নাঈমকে বিয়ে করতে চাপ দেয়। তার সম্পর্কে নাঈম বলেছে :

> মেয়েটা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে। এবোরসন করার জন্য চাপ দিয়েছিলো রফিক। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। মাঝখান থেকে বড় বিপদে পড়ে গেছে রফিক। তাই আজ কদিন ধরে সে আমায় ধরে বসেছে। বলছে আমার বেতন আরো বাড়িয়ে দেবে আর বিয়ের খরচ-পত্র সব বহন করবে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৮৫)

এভাবে অর্থ সম্পদের সংস্পর্শে এসে মানুষ কীভাবে নীতিভ্রষ্ট হয়ে যায়, কীভাবে চরিত্রের স্খলন ঘটে তার সমূহ রূপ বিধৃত হয়েছে রফিকের মাধ্যমে।

এ উপন্যাসের আর একটি চরিত্র খোদাবক্স। বিশ্রামাগার নামে তার একটি হোটেল আছে। তার অধিকাংশ খদ্দের তরুণ। তাদেরকে ধারে খাওয়ায় এই আশায় একদিন চাকুরি পেয়ে তারা তার ঋণ পরিশোধ করবে। এ কারণে বিভিন্ন চাকুরির খবর দেয়। সংবাদপত্র সরবরাহ করে। আর একটি কাজ করে তরুণ খদ্দেরদের সামনে মহিলা স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের খবর সরবরাহ করে। কার বাড়ি কোথায়, কার বিয়ে হয়েছে, কার হয় নি এসব খবর তার মুখস্থ। এভাবে ভালোগুণের পাশাপাশি মানুষের সর্বনাশ করার দিকটাকেও লেখক উপস্থাপন করেছেন এ চরিত্রে।

এসব চরিত্র ছাড়াও এ উপন্যাসে বেশ কিছু চরিত্র মাহমুদের ছোট ভাই-বোন দুলু ও খোকন, মরিয়মের ছাত্রী সেলিনা, সেলিনার মা আনিসা বেগম, মরিয়মের প্রাক্তন প্রেমিক জাহেদ, মাহমুদের বন্ধু চরিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে কাহিনীর প্রয়োজনে। তবে লেখক অতি উৎসাহে নয় বরং কাহিনী বিন্যাসে যতটুকু প্রয়োজন এসব চরিত্রের ঠিক ততটুকু প্রসারিত করেছেন দক্ষ শিল্পীর মতো।

জহির রায়হান জীবনকে খালি চোখে দেখেছেন আর প্রতিটি উপন্যাসের মতো 'বরফ গলা নদীতে'ও নিরন্তর জীবনতত্ত্বকে উপস্থাপন করলেন। আভরণ পেচিয়ে ভিন্ন মূর্তিতে নয় সতেজ, স্বাভাবিক, প্রসাধনী বিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন ঘটনাবলী। যেন আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া পরিচিত ঘটনা। তাঁর এ উপন্যাস সম্পর্কে কবির চৌধুরী বলেছেন, 'জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস আমার বিবেচনায় 'বরফ গলা নদী'। বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র এখানে পরম বিশ্বস্ততা, বাস্তবতাবোধ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতির সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে।' (কবির চৌধুরী ২০০১ : ৬০)

ভাষা নির্মাণে লেখক সর্বদা সুকৌশলী। পাঠককে ঘটনার মধ্যে নিমগ্ন করতে শুরুতেই তিনি পূর্ব ভূমিকা তৈরি করেন। আর সে সব কল্পচিত্রের বর্ণনাভঙ্গি মনোমুগ্ধকর : 'উত্তরের জানালাটা ধীরে ধীরে খুলে দিলো লিলি। এক ঝলক দমকা বাতাস ছুটে এসে আলিঙ্গন করলো তাকে। শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়লো হাতের উপর। নিকষকালো চুলগুলো ঢেউ খেলে গেলো। কানের দুল জোড়া দোলনার মত দুলে উঠলো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯৫)

ভাষার করুকাজের কারণে অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। দোদুল্যমানতা ও সংশয় সৃষ্টিতেও জহির রায়হানের জুড়ি মেলা ভার। যেমন : 'মানুষ কি দুবার প্রেমে পড়তে পারো না? একজনকে হারিয়ে সেকি অন্য আরেক জনকে ভালোবাসতে পারে না?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৫৯)

একজন মনোবিশ্লেষকের মতো জহির রায়হান মানুষের খবর রেখেছেন। তাইতো এ উপন্যাসের অনেক জায়গায় চরিত্রের স্বগতোক্তি আওড়াতে দেখি। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে গেলেও মাহমুদের মন সচল ছিল সে তার চিন্তার উচ্চারণ মুখে না করলেও অন্তর্লীন ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে লেখকের বক্তব্যের মাধ্যমে। এটি জহির রায়হানের অন্যতম সাফল্য। মাহমুদের স্বগতোকথন এমন : 'এ বয়সে যদি মারা যেতে হলো তবে জন্মেছিলে কেন?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৭৯)

রোমান্টিক ভাবনা সরল ও প্রায়োগিক কৌশল অবলম্বন করে অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রের কথোপকথনকে প্রশ্ন ও সংলাপধর্মী করে উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

উ! সাড়া দিলেন হাসমত আলী।

ঘুমুচ্ছো নাকি?

'না',

কাল মরিয়মকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবো?

কোনটা?

মনসুর যে বলেছিল একটা নতুন বাসায় নিয়ে যাবে আমাদের।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৭৭)

অলঙ্কার প্রয়োগেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। যদিও জহির রায়হানের অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে এটি কম আবেগপূর্ণ তাই এতে কাব্যময়তার উপস্থিতি কম। তবে চিত্রকল্প, প্রবাদ, প্রতীকী উপস্থাপন চমৎকার ব্যঞ্জনা বহুল। যেমন :

> বাইরে বৃষ্টি ঝরছে রিমঝিম। একধারা বর্ষণ মাঝে মাঝে দমকা বাতাস দেয়ালের গায়ে লেগে করুণ বিলাপে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। পৃথিবীর চোখে অশ্রু ঝরছে, বিষন্ন ব্যথার চাপে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৭৭)

নামকরণের ক্ষেত্রেও দারুণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে। এ উপন্যাসের নামকরণের তাৎপর্য রয়েছে শেষ উক্তিতে : 'যে শক্তি জীবনকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে তার কি কোন শেষ আছে লিলি?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৮৮)। এমন দার্শনিক উপলব্ধি থেকেই ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের নামকরণ করেন। পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে গলে নদী সৃষ্টি করে আর সে নদী বন্ধুর ভূমিতে নানান দিকে গতিবেগ সৃষ্টি করে বয়ে চলে। নদীর ধর্মের মতো জীবনের ধর্মও। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সুখ থাকে, সংগ্রাম থাকে, কষ্ট থাকে, অপূর্ণতা থাকে তবু সে থেমে থাকে না, বয়ে চলে নদীর ধারার মতো। থেমে না থেকে মানুষের এই সংগ্রামী জীবনকে নির্দেশ করতে গিয়েই জহির রায়হান উপন্যাসটির নামকরণ করেছেন 'বরফ গলা নদী' যা সার্থক ও যথার্থ রূপকল্প।

'ষাটের দশকে নতুন জীবন চেতনা এবং প্রকাশরীতি নিয়ে যারা উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনা, আশা, কল্পনা, ব্যর্থতা এবং সংকট রূপায়িত হলো।' (সারোয়ার জাহান ১৯৮৮ : ১৭)। জহির রায়হনের রচনায়ও সেই ধারাটি অব্যাহত। তাঁর এই রচনা সম্পর্কে সমালোচক গবেষক মন্তব্য করেছেন, 'বরফ গলা নদীতে কাহিনীর জটিলতা কিংবা ব্যাপকতা নেই, তবে মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র দিক তুলে ধরার সূক্ষ্ম প্রয়াস আছে। কাহিনীর নাটকীয় বিন্যাস উপন্যাসকে চলচ্চিত্র উপযোগী করার প্রয়াসেরই ইঙ্গিত দেয়।' (মনসুর মুসা ১৯৭৪ : ৯২-৯৩)। এছাড়া অন্য সমালোচক বলেছেন, 'নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার রূপায়ণ হিসেবে বরফ গলা নদী নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ১৬১)

মূলত জহির রায়হান জীবনের অন্ধিঃসন্ধিতে ঘুরে ঘুরে কঠোর কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং তাঁর শিল্পকর্মে সেসব অভিজ্ঞতার প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এ উপন্যাসে তাঁর সমগ্র চেতনার আভাস আমরা লক্ষ্য করেছি। লেখক যেন বিন্দুতে সিন্ধুর অবস্থান দেখাতে চেয়েছেন। উপন্যাসটির বিস্তার অতি অল্প তবে, তার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে

জহির রায়হানের সাংবাদিক জীবনের আভাস, প্রেম চেতনা, বাস্তবিক ও কঠোর সত্য বলার দৃঢ়তা, নাস্তিবাদি চেতনা এমনকি প্রকৃত ও দার্শনিকোচিত জীবন উপলব্ধি। সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে শ্রেণি বিভক্ত সমাজে বসবাসরত নানান পেশার মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি যাদের কেউ প্রতারণা করে বড়লোক হয়, গবীবের সরলতা সুযোগ নিয়ে সুবিধাভোগ করে, কেউ জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়েও ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করে না, আবার কউে অন্যের করুণায় আশ্রয় খোঁজে। এসব চরিত্রের মধ্যে ধণিক, সুবিধাভোগীরা বুদ্ধির মারপ্যাচে হয়তো জীবন যুদ্ধে টিকে থাকে কিন্তু রেহাই পায় না মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। তাদের স্বপ্ন, তাদের স্বাধ অন্যকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার লোভ তাদেরকে সর্বোশান্ত করে। দারুণ মূল্যে সেই ঋণ শোধ করতে হয়। কোন এক ঝঞ্ঝা বিক্ষুদ্ধ রাতে জীর্ণ বাড়ি ধ্বসে জীবনে মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়। এ উপন্যাস মাহমুদ ছাড়া তার পরিবারের সকল সদস্যের মর্মান্তিক মৃত্যুই যে তাদের স্বপ্নের প্রায়শ্চিত্ত। উপনিবেশ শৃঙ্খলিত শোষণমূলক সমাজের জীর্ণ ও বিপন্ন অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়েই লেখক এমন বেদনাত্মক ঘটনার অবতারণা করেছেন। অন্যদিকে দারিদ্রের প্রকট ছবিও এঁকেছেন। তিনি বাস্তবিক উপরি কাঠামোকে নয়, সংবেদনধর্মী তীর্যক চোখ দিয়ে মন্ময় কৌশলে দরিদ্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দরিদ্রের নির্মমতার সঙ্গে তাদের বুকের গভীর খনিতে মণি-মাণিক্যের মতো লুকিয়ে থাকা স্বপ্নকেও প্রকাশ করেছেন যা অর্থাভাবে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তাছাড়া তাঁর রচনার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল অপরিপক্ক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মাহমুদ তার সচেতনতা, বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এ সমাজের বাসিন্দা হতে চেয়েছে কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়েছে। তারপরও মধ্যবিত্তের আশাবাদী চেতনায় ভর করে জীবন তরী প্রবাহিত করেছে সম্মুখ সমরে। পরিণতিতে ট্রাজিক অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও সততার কঠিন দণ্ড আকড়ে অপরাজিত রয়েছে।

বর্ণনার পরিণতিতে বলা যায় জহির রায়হান বাংলা উপন্যাসের সূচনা লগ্নে নতুন হাওয়া প্রবাহিত করতে চেয়েছেন। তাঁর সেই চেতনার একটি সংযোজনা ‘বরফ গলা নদী’। রাজনৈতিকভাবে অস্থির সময়ের শুষ্ক মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে প্রকাশ করলেন সমাজে ঘটমান অন্যায়, অনিয়ম ও অনাচার আর মধ্যবিত্তের মোহনীয় জীবন সংগ্রামের অবিকল রূপটি। তাছাড়া জীবনের বা মানুষের বাহ্যিক আভরণের চেয়ে মানুষে মনের অন্তর্নীহিত ভাবনারাজিকে প্রকাশে তিনি উন্মুখ ছিলেন এ উপন্যাসে। এদিক থেকে বলা যায় জহির রায়হান তাঁর জীবনের সামগ্রিক চেতনা ও দর্শন নিপুণ কারিগরের মতো মমতা দিয়ে ‘বরফ গলা নদী’ উপন্যাসে সংযোজনে সচেষ্ট হয়েছেন। মূলত এখানে তাঁর জীবনের সামগ্রীক মতাদর্শের পরিচয় পরিব্যাপ্ত। তাই উপন্যাটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বললে অত্যুক্তি হবে না।

আর কত দিন

জহির রাহানের জীবনের সায়হ্নে এসে আর একটি অসাধারণ উপন্যাস লিখেছেন যার নাম 'আর কত দিন' (১৯৭০)। এটি একটি প্রতীকী উপন্যাস। তাঁর অসমাপ্ত 'লেট দেয়ার বি লাইট' ছবির চিত্রনাট্য। '১৯৭০ সালে বাঙালির মহাসংগ্রামের এক দিগন্তে দাঁড়িয়ে, নতুন চেতনাবোধের আলোকে জহির রায়হান উপন্যাস নিয়ে একটি ফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, নিমগ্ন হচ্ছিলেন নতুনতর নিরীক্ষায়। 'আর কত দিন' এরই সাক্ষ্য। (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৬৮)। ১৯৪৮ সাল থেকে বাঙালি জাতীয়তাবোধকে ধারণ করে যে আন্দোলন শুরু করেছিলো তার সুসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে। লেখক বাঙালির একের পর এক সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাদের উত্তাল সংগ্রাম তাঁকে সাহিত্য রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি রাজনীতিভিত্তিক বেশ কিছু রচনা সৃষ্টি করেছেন তবে তা ছিল নিদৃষ্ট একটি ঘটনা কেন্দ্রিক। এই উপন্যাসে তিনি একই গণ্ডিবদ্ধ না হয়ে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বা বাঙালির মহাসংগ্রামকে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। এই সংগ্রাম এক সময় শুধু বাঙালির একার নয় পৃথিবী ব্যাপী সংগ্রামের বাস্তবিক রূপ ধারণ করেছে। মূলত 'জহির রায়হানের 'আর কত দিন' আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে নানাদিক থেকে অনন্য। এর উদার মানবিকতাবাদ বিশ্বব্যাপ্ত। লেখক গভীর বেদনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন যুগে যুগে মানুষ কি কঠিন যন্ত্রণার শিকার হয়েছে ধর্মান্ধতার জন্য, বর্ণবাদের জন্য, উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্য।' (কবির চৌধুরী ২০০১ : ৬৭)

উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে দুই মানব মানবীর জীবনের নানা জটিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছুটে চলাকে কেন্দ্র করে। তারা উভয়েই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, তবুও জীবন যুদ্ধ তাদের থামতে দেয় নি। ধাবিত করেছে সম্মুখ সমরে। এখানে পদচারণা করেছে আটাশ জন মানুষ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপু ও ইভা। তাছাড়া রয়েছে বুড়ী মা, তাদের তিন ছেলে, বুড়ো বাবা, চদ্দৌ বছরের মেয়ে, চার্চের প্রাদী এবং উনিশ জন অসহায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ। তবে লেখক এখানে নিদৃষ্ট কোন সময়ের উল্লেখ করেন নি। তিনি একদিকে উল্লেখ রয়েছে যিশুখ্রিষ্টের কাল অন্যদিকে উনিশ শতকের মর্মান্তিক ঘটনা। স্থান বর্ণনায় তিনি উল্লেখ করেছেন– স্ট্যালিনগ্রাড, অসউইজ, বুখেনওয়াল্ড, হিরোশিমা, সাইপ্রাস, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, গ্রীস, আফ্রিকা, জেরুজালেম, প্রভৃতি স্থানের নাম। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের উল্লেখ করে তিনি মূলত উপন্যাসটির কাহিনী বিস্তারের পরিব্যাপ্তি তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে লেখকের দার্শনিক চেতনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সৃষ্টির আদি থেকে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, হানাহানি, প্রতিবাদ প্রভৃতির কারণ খুঁজতে চেয়েছেন। মানুষের অনন্ত অতৃপ্তি কামনার উল্লেখ রয়েছে এখানে। কোন কিছুর বিনিময়ে যেন এর সমাপ্তি নেই। প্রশান্তির সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে আছে। মানব জীবনের প্রতিটি প্রান্ত বিভীষিকাময়। কোথাও কারো নিস্তার নাই। তাই লেখক উদগ্রীব চিন্তিত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে। তিনি জগতের এই বীভৎস চিত্র অঙ্কন করেছেন উপন্যাসের প্রথমেই :

> তবু মানুষ মানুষকে হত্যা করে।
> ধর্মের নামে।

বর্ণের নামে।

সংস্কৃতির নামে।

এই বর্বরতাই অনাদিকাল ধরে আমাদের এই পৃথিবীর শান্তিকে বিপন্ন করেছে। হিংসার এই বিশ লক্ষ-কোটি মানব সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯১)

এমন নিঃসংশতার মধ্যেও মানুষের পথ চলা থেমে যায় নি, স্তনমিত হয় নি আশার প্রদীপ বরং সংঘাতময় জীবন মানুষকে আরো দৃঢ় করেছে, আরো সংযমী করেছে কিংবা বিধ্বংসী হতে শিখিয়েছে। লেখক এমনই দার্শনিক কথা এখানে তুলে ধরেছেন :

কিন্তু। মানুষ মরতে চায় না।

এই বাঁচার আগ্রহ নিয়েই গুহা-মানব তার গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

.....

বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে।

মানুষের এ এক চিরন্তন যাত্রা।

জ্ঞানের জন্যে।

আলোর জন্যে।

সুখের জন্য।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯১)

আর মানব জীবনের সেই সংগ্রামের গুরুত্ব বোঝাতে লেখক সভ্যতার ক্রমবিকাশকালীন গুহা মানবের অন্ধকার ছেড়ে আলোর দিকে ধাবিত হওয়ার চিত্র বর্ণনা করেছেন। লেখকের ভাষায় :

ইতিহাসের এক দীর্ঘ যন্ত্রণাময় পক্ষ পেরিয়ে সেই গুহা-মানব এগিয়ে এসেছে অন্ধকার থেকে আলোতে। বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে।

মানুষের এ এক চিরন্তন যাত্রা।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯১)

এ উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে সেই সন্ধানী মানব-মানবী তপু এবং ইভা। তারাও অন্ধকার সমাহিত মৃত নগরীর উপর দাঁড়িয়ে সম্মুখ পানে ছুটে চলার প্রেরণা পেয়েছে, সুখে সংসার করতে চেয়েছে, তারাও বাঁচতে চেয়েছে, চেয়েছে নতুন সন্তানকে সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে। ফ্যাসিবাদ পৃথিবীব্যাপ্ত উপনিবেশ, সাম্রাজ্যবাদ, শৃঙ্খলা এবং শ্রেণি বৈষম্য ও বর্ণবাদের আগ্রাসনের মধ্যেও তারা স্বপ্ন দেখেছে। জীবন আর মৃত্যুর দ্বান্দ্বিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ও জীবনের আকাঙ্ক্ষা, ভালোলাগা, ভালোবাসা, স্বপ্নগুলিকে অক্ষুন্ন রেখেছে। 'আমি শুধু তোমার ভালোবাসা চাই। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো ইভা। সারাটা জীবন শুধু তোমাকে ভালোবাসতে চাই। আমি তোমার সন্তানের মা হতে চাই তপু। আমি একটা সুন্দর

ঘর বাঁধতে চাই। আমি সুখ চাই। শান্তি চাই। বলতে বলতে দু'চোখ ভরে অশ্রু জমে এলো তার।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪০০)

অন্যদিকে বুড়ো পাদ্রী তাদের গন্তব্যের কথা জানতে চাইলে বলেছে :

'আমরা অন্ধকার থেকে আলোতে যেতে চাই।
আমরা আলো চাই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪০০)

এমন বক্তব্য শুধু তপু ও ইভার নয় এই সব উক্তির মাধ্যমে লেখক মানব জীবনের বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করেছেন।

শুরু থেকেই বিশ্বে উৎপীড়ন-শোষণ চলে আসছে শোষক আর সাধারণের মধ্যে। বিশ্বব্যাপী শ্রেণি বৈষম্য আর উৎপীড়নের প্রায় সকল চরিত্রই লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এখানে। একসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন বিশ্বময় সকল যন্ত্রণা বেদনা–শোষণ ও প্রতিবাদকে :

> ...আমি তো কাঁদি না। অফুরন্ত মিছিলের একজন বললো। ওরা আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে হিরোশিমায়। আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়। আমার বোনটা এক সাদা কুত্তার বাড়িতে বাঁদী ছিলো। তার প্রভু তাকে ধর্ষণ করে মেরেছে আফ্রিকাতে। আমার বাবাকে হত্যা করেছে ভিয়েতনামে। আর আমার ভাই তাকে ফাঁসে ঝুলিয়ে মেরেছে ওরা। কারণ সে মানুষ জীবন ভালোবাসতো।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯৭)

শুধু এমন বর্ণনা নয় অত্যাচারী বর্বরদের নির্মম আচরণের কথাও লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে এভাবে:

> অতো কী আর মনে থাকে মা। গ্রামকে-গ্রাম ওরা পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। কত মেরেছে জিজ্ঞাসা করেছো ? তার কি কোনো হিসেব আছে। এক বছর নদীতে কোন স্রোত ছিলো না। মরা মানুষের গাদাগাদিতে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। শকুনরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে দু-বছর ধরে এখনো খাচ্ছে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯৭)

এমন নির্যাতনে সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ শান্তি প্রিয়। কিন্তু বারবার তাদের সম্মুখে ঘটে যায় নানান রক্তাক্ত ঘটনা। এসব তাদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায় হৃদয় হয় ক্ষতবিক্ষত। তারা হয়ে পড়ে আশ্রয়হীন, অসহায়। তখন নিজেরা বাঁচার তাগিদে দিশেহারা। তাদের জীবনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকেও লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে : 'আর সেই বন্যতার ভয়ে ভীত একদল মানুষ নোংরা অন্ধকারে একটি ঘরের ভেতরে, ইঁদুর যেমন করে তার গর্তের মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে থাকে; তেমনি বসে আছে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯২)

এমন পরিস্থিতিতেও জীবনের দাবী অপ্রতিরোধ্য যা উপন্যাসটিতে লক্ষ্য করা যায়। জীবন ও মৃত্যু নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক অন্তসত্ত্বা মহিলার প্রসব বেদনা এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা ঘটে। আর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামশীল মানুষ হত্যা করে সদ্যজাত এই মানব শিশুকে যার কান্নায় ছিল জীবনের ইঙ্গিত। বর্ণিত আসে :

> মুমূর্ষু মহিলাটি যন্ত্রণার অস্থিরতায় বারবার নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর ঘর্মাক্ত দেহটাকে আয়ত্তে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু! সবাইকে হতাশ করে দিয়ে উনিশ জন মানুষের অভিসম্পাত কুড়োতে কুড়োতে শিশুটি ভূমিষ্ট হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে উনিশজনের একজন সেই বাচ্চাটির গলা টিপে ধরলো।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪০২)

মানুষ সব সময় নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজের জন্য লড়ে যায়। লেখক এই বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করতেই আলোচ্য ঘটনার অবতারণা করেছেন। অন্যদিকে জীবন ও মানুষ সম্পর্কে অন্যত্র তার চেতনার বহিঃপ্রকাশ করেছেন এভাবে : 'সবাই নিজের ভাবনা আর চিন্তায় মগ্ন। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের কথা নিয়ে দুদণ্ড আলাপ করার অবকাশ নেই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯৭)

যেহেতু এ উপন্যাসের পটচিত্র জগতের বিশাল ক্যানভাসে আঁকা তাই পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার সমারোহ দৃশ্যমান। বর্তমান যুগে বিশ্ব মানবতাই সব চেয়ে বড় আলোচ্য বিষয়। লেখক তাঁর উপন্যাসে সেই দিকটি তুলে ধরেছেন তপুর বৃদ্ধা মা, বাবা ও গীর্জার পাদ্রীর মাধ্যমে। বৃদ্ধা মা পরিবারের সবার বিরুদ্ধে গিয়ে, সকল শঙ্কা উপেক্ষা করে উনিশ জন মানব মানবীকে তার বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছিলেন। বর্ণিত রয়েছে :

> মা তিন জনের দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে বললেন, কতগুলো নিরপরাধ মানুষকে আমাদের চোখের সামনে মেরে ফেলবে আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখবো! তপুর কথা ভাবো একবার। তোমাদের ভাই। সে এখন কোথায়? তাকে যদি কেউ মেওে ফেলে?
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯৪)

বাবা তপুর তিন ভাইকে জনগোষ্ঠী আর ভাষা, বর্ণ, ধর্ম উর্ধ্বে উঠে নিজেদেরকে মানবতার মাঝে বিলিয়ে দিতে বলেছেন। আর ভাইয়েরা প্রথমে হিংসাত্মক হলেও পরবর্তীতে মানব ধর্মে দীক্ষিত হয়। লেখক চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন :

> একটা বাচ্চা ছেলে ঘুমন্ত মায়ের স্তন নিয়ে খেলা করছিলো। সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে।
>
> তার হাসির শব্দে চমকে উঠলো তিন তস্কর।
>
> হাত থেকে দা আর ছুরি নিচে মেঝেতে খসে পড়ার আওয়াজে বাক্সঘরের বাসিন্দারা জেগে গেলো সবাই। ওরা অবাক হয়ে খোলা দরজায় দাঁড়ানো তিন ভাই এর দিকে তাকালো।
>
> ওদের সে দৃষ্টি যেন সহ্য করতে পারলো না তিন ভাই।
>
> ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে নিলো।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪০৬)

এমন অসহ্য অবাসযোগ্য পরিবেশের দুই জন লড়াকু সৈনিক তপু ও ইভা। যারা এক পরাবাস্তববাদী চেতনায় ভর করে আছে। সেখানেও তাদের সংগ্রাম থেমে নেই। জগতের সকল জ্বরাজীর্ণতা পেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। সেজন্য ধ্বংস যজ্ঞের করাল গ্রাস থেকে একটু প্রশান্তির আশায় তাদের ছুটে চলা :

ওরা দু'জনে ছুটছে। প্রাণপণে।

টুকরো টুকরো ইটে-ভরা শহুরে রাস্তাগুলোতে আলো ঝলমল করছে। আর ওরা অন্ধকার খুঁজছে।

একটুখানি অন্ধকার পেলে তার ভেতরে দুজনে আত্মগোপন করবে ওরা।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯৭)

জহির রায়হান ব্যক্তি জীবনে প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। তাই তাঁর প্রতিটি লেখার মতো এই উপন্যাসে এত ধ্বংস বিধ্বস্ত বর্ণনার মধ্যে অতি অল্প হলেও নর নারীর প্রেমের সম্পর্ককে ফুটিয়ে তুলতে ভুলে যান নি। তপু ও ইভার প্রণয়ানুভূতির প্রকাশ লেখকের ভাষায় এমন :

ইভা। তপু ডাকলো

কী। ওর দিকে চোখ তুলে তাকালো ইভা।

ভয় লাগছে?

না। তুমি পাশে থাকলে আমি ভয় পাই না।

আচ্ছা ইভা। তপু আবার বললো, তুমি আমাকে ভালোবাসতে, গেলে কেন বলোতো?

জানি না। ইভা মিষ্টি করে হাসলো। ভালো লেগেছে। ভালো লাগে। তাই ভালোবাসি।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯৮)

আবার তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নময় সংসারের বর্ণনা রয়েছে এখানে। সুখকর দাম্পত্য জীবনের আশা ও স্বপ্নের বিবরণ এমন :

তখন দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তোমার নাম ধরে ডাকবো। আশেপাশের বাড়ির লোকগুলো সবাই চমকে তাকাবে সেদিকে। তুমি দরজা খুলেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে এতো দেরি, হলো যে?

আমি বলবো। কি বলবো বলো তো?

তুমি বলবে অনেক কাজ ছিলো তাই।

না না। আমি বলবো। কাজের মাঝখানে তোমাকে নিয়ে একটা মিষ্টি কবিতা লিখেছি,

তাই।

.....

যখন পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। এই পৃথিবীর একটি মানুষও জেগে থাকবে না। তুমি আমি পাশাপাশি বসবো। দু'জনে দুজনকে দেখবো। তখন শোনাবো তোমাকে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪০৮)

এই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেই তারা ছুটে চলেছে। তারা ভেবেছিল আর সামান্য পথ পেরোলেই নিরাপদ সীমানা। তপুর বাবার বাড়িতে রয়েছে তার আপন জনেরা। কিন্তু তাদের আসা ও স্বপ্নের পথে ছেদ পড়ে। বাড়িতে এক ভয়ঙ্কর সত্য অপেক্ষা করে রয়েছে তাদের জন্য। যদিও তারা ভেবেছিল এবার হয়তো সংগ্রামের অবসান ঘটবে, নিরাপদ আশ্রয় পাবে কিন্তু বাড়ি এসে দেখে সেটিও পরিণত হয়েছে মৃত্যু কূপে। এত দিন বাইরের, আর এখানে ঘরের শত্রুদের জন্য টেকা দায় হয়ে দাঁড়ায়। শত্রু থেকে পালিয়ে এসেছে কিন্তু আবার হয়ে পড়ে উদ্বাস্তু। বর্ণিত রয়েছে :

> শব্দের রাক্ষসগুলো আবার তাড়া করছে পেছন থেকে।'
>
> পাগলা কুকুর নয়।
>
> শূকর শূকরী নয়।
>
> কতগুলো মানুষ।
>
> কতগুলো চেনা মুখ।
>
> মায়ের। বাবার। ভাইয়ের। বোনের।
>
> পেছন থেকে ছুটে আসছে। ছুটে আসছে ওদের হত্যা করার জন্যে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪০৯)

এই ছুটে চলা তাদের অনন্ত কালের। বাস্তবে সারা বিশ্বের পরিস্থিতিই এমন। বিশ্বের প্রতিটি মানুষের একদিকে রয়েছে বাহ্যিক শত্রু অন্যদিকে রয়েছে আভ্যন্তরীণ শত্রু। তাই তারা সর্বদা নিরাপ্তাহীনতায় ভুগছে। অস্তিত্ব রক্ষায় হয়ে পড়ছে দিকভ্রান্ত। উপন্যাসের শেষের দিকে তপু ও ইভার আত্ম আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্ব জীবনের সার্বজনীন রূপ পরিলক্ষিত হয় :

> ক্ষতবিক্ষত দেহ। আর অবয়ব।
>
> আমরা কোথায়?
>
> ভিয়েতনামে না ইন্দোনেশিয়ায়।
>
> জেরুজালেম না সাইপ্রাসে।
>
> ভারতে না পাকিস্তানে।
>
> কোথায় আমরা ?
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪১০)

১৯৭০ সালে বাঙালির মহাসংগ্রামের এক 'দিগন্তে দাঁড়িয়ে নতুন চেতনাবোধের আলোকে জহির রায়হান, নিমগ্ন হচ্ছিলেন নতুনতর নিরীক্ষায়। উপন্যাস নিয়ে নতুন ফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। 'আর কত দিন' এরই সাক্ষ্য।' (মাহমুদল বাসার ২০১১ : ৬৮)। বহুমুখী সংগ্রামের চিত্র এঁকেছেন। সত্তরের দশকে বিশ্বের অনেক দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল। যেমন চব্বিশ বছর ধরে ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদী উগ্রতার উত্থান, ২য় বিশ্বযুদ্ধের হত্যাযজ্ঞ, হিরোশিমা-নাগাশাকির ধ্বংসযজ্ঞ, সাতচল্লিশের দাঙ্গা, জীবন বিধ্বংসী বর্বরতা প্রভৃতি। এসব দেশের বিপর্যস্থ ঘটনা

লেখক তাঁর মননে ধারণ করে এ উপন্যাসে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাই এ উপন্যাসে কোন কাহিনীর বিস্তর বিন্যাস ঘটে নাই। বিষয়বস্তুর আকার, গভীরতম উপলব্ধি নিংড়িয়ে বোঝাতে চেয়েছেন জীবনের চেয়ে কিংবা মানবতার চেয়ে জাতিসংস্কৃতি কোন, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম, অংশেই বেশি মূল্যবান হতে পারে না। তবু উগ্রতার নগ্নমূর্তি সর্বক্ষণ আমাদের সম্মুখ পানে উন্মোচিত হয়। সেই ইঙ্গিত উপন্যাসের প্রথমেই :

তবু মানুষের এই দীনতার বুঝি শেষ নেই।
শেষ নেই মৃত্যুরও ।
তবু মানুষ মানুষকে হত্যা করে
ধর্মের নামে।
জাতীয়তার নামে।
সংস্কৃতির নামে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯১)

এই সমাজে নবাগতর আগমন মঙ্গলের নয়। বরং তার আবির্ভাব কষ্টের। তাই গলা টিপে খুন হতে হয়। এ হত্যা যেন একটি সুন্দর সকালকে হত্যা করা। এভাবেই একটি ভুলের সংশোধনে বার বার ভুল করে পাগল প্রায় হয়ে পড়েছে তারা। এমন দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখি 'আরেক ফাল্গুনে'। সেখানেও মানুষ মারা গেলে শোক করতে দেওয়া হয় না। ফ্যাসিবাদী অশুভ শক্তিই যেন মানুষরে কাঁদবার অধিকার কেড়ে নেয়। আবার মাতৃত্বের চিরন্তন রূপটিও বিবর্ণ হয়ে যায় তাদের প্রতাপে। তাদের বীভৎস বর্বরতা মানুষের স্বপ্নকে ধুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। তবু জীবনের দাবি অপ্রতিরোধ্য। এত ধ্বংসযজ্ঞের পর আজও পৃথিবী টিকে আছে। জহির রায়হানও সেই সত্যটি ব্যক্ত করেছেন এ উপন্যাসে। জীবন শেষ পর্যন্ত সকল বর্বরতা, ভয়ঙ্কর দানবীয়তা, হিংস্রতা অতিক্রম করে জয়ের পতাকা তোলে। এ দিকটি উপন্যাসের শেষে বর্ণিত আছে। সব হারিয়েও ইভা একটি শিশুকে বুকে নিয়ে প্রাণপণে অফুরন্ত স্রোতে একাত্ম হয় এভাবে :

'ওর পাশে এসে দাঁড়ালো তপু আর ইভা।
তারপর সমুদ্রের পাড় ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো ওরা। সামনে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪১০)

পৃথিবীর সমস্ত হিংসা নিষ্ঠুরতাও পাশবিকতাকে পেছনে ফেলে তপু ও ইভার এই ছুটে চলার মূলে রয়েছে জীবনের প্রতি ভালোবাসা। লেখক নিজেই মানুষকে ভীষণ ভালোবাসতেন। যার ফলশ্রুতিতেই এমন উপন্যাসের জন্ম হয়েছে।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে জহির রায়হান এ উপন্যাসে নতুন একটি ফার্ম ব্যবহার করেছেন। বিশ্বব্যাপী জীবন সংগ্রাম, অস্তিত্বের সংকটকে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। যেন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক গাঁথায় রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যদিকে তিনি এ উপন্যাসে চলচ্চিত্রের রূপরীতিকে সচেতনভাবে অনুসরণ করেছেন। ঘটনা উপস্থাপনে তিনি cut to cut পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। চিত্রনাট্যানুগ ঘটনার উপস্থাপন এমন :

অন্ধকারের নিচে সমাহিত মৃত নগরী।

প্রাণহীন।

যেন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত তার অবয়ব।

দীর্ঘ প্রশস্ত পথগুলোতে কবরের শূন্যতা।

ভাঙ্গা কাচের টুকরো। ইটের টুকরো। আর মৃত দেহ।

কুকুরের

বিড়ালের

.....

আর মানুষের।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯২)

অনেকটা প্রতীকী পরাবাস্তবতা ঢঙয়ে রচিত হয়েছে উপন্যাটি। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতির স্মরণাপন্ন হয়েছেন। এখানে প্রকৃতি এসেছে প্রতীক রূপায়ণের উপকরণ হিসেবে। যেমন :

আকাশ কালো করা জমাটে মেঘগুলো বৃষ্টির রূপ নিয়ে অফুরন্ত ধারায় ঝরে পড়ছে মাটিতে।

আর অসংখ্য অগণিত লোক সেই বর্ষণের তীব্রতাকে উপেক্ষা করে এক হাঁটু পানি আর কাদা ডিঙ্গিয়ে হেঁটে চলেছে।

নানা বর্ণের।

নানা বয়সের।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৩৯৬)

এই বৃষ্টি শুধু প্রকৃতির বৃষ্টি নয় এ যেন বিশ্ব মানবতার জীবনে ঘটে যাওয়া নানা দুর্ঘটনা দুর্যোগ ও উৎপীড়নের ইঙ্গিত।

উপন্যাসের সংলাপ ব্যবহারে তিনি ছিলেন আরো বেশি যত্নশীল। 'ছোট ছোট কাব্যময় বাক্যের তির্যক ব্যবহার এ উপন্যাসকে ভিন্নতা দান করেছে। 'আর কত দিন' প্যারল জাতীয় রচনা। ভাষা ব্যবহারেও প্রায় বাইবেলীয় নিরাভরণ সরলতা লক্ষনীয়।' (কবির চৌধুরী ২০০১ : ৬৭)। মূলত লেখক জীবনের অভিজ্ঞতার উপাত্ত থেকে পৃথিবীর বিধ্বংসী সব ঘটনাকে অতি যত্নে বিশ্বাসযোগ্য বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন এভাবে : 'সারাটি জীবন শুধু তোমাকে ভালোবাসতে চাই। আমি একটা সুন্দর ঘর বাঁধতে চাই। আমি সুখ চাই। শান্তি চাই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪০০)

উপন্যাসের আরেকটি দিক এখানে বেশ কিছু পশুর নাম উল্লেখ আছে। এসব পশুর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মধ্যকার পশুবৃত্তিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, কারণ মানবিক গুণ বিদ্যমান মানুষ কখনো কাউকে কষ্ট দিতে পারে না, প্রতারণা করতে পারে না, পারে না হত্যা করতে। বরং যখন তার মধ্যে পশুত্ব জাগ্রত হয় তখনই সে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। এমন চিত্র ফুটিয়ে তুলতেই লেখা বার বার নিকৃষ্ট পশুর উল্লেখ করেছেন। আর কিছু কিছু শব্দ বার বার উচ্চারণ করেছেন অধিক গুরুত্ব বুঝাতে।

জাতি শোষণ, শ্রেণি শোষণ, ধর্ম-বর্ণ, সাম্প্রাদায়িক শোষণের বিরুদ্ধে শিল্পিত প্রতিবাদ 'আর কত দিন' উপন্যাসকে গৌরবময় স্বাতন্ত্র্য দান করছে। আকারে সীমিত হওয়া সত্ত্বেও উপকরণ ও প্রকরণের বিশ্ববিস্তার ও অভিনবত্বে এ উপন্যাস জহির রায়হানের জীবনার্থ ও শিল্পবোধের অনন্যতার সাক্ষ্যবাহী।' (রফিকউল্লাহ খান ২০০৯ : ১৮৯)। এছাড়া নিরীক্ষাধর্মী এই উপন্যাস ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, বিশেষ করে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক শিল্পরূপ। অন্যদিকে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের, ভাষা আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলকেও ধারণ করেছে 'আর কত দিন' উপন্যাস।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০০৮ : ২৪৪)

জহির রায়হানের 'আর কত দিন' একটি ব্যাতিক্রমধর্মী উপন্যাস। এটি পাঠের সময় যেন একটি ছায়াছবির প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। হয়ত সেখানে কোন ধারাবাহিক কাহিনী নেই, নেই কোন ঘটনার ঘনঘটা তবুও একটি সমাজের বিবর্ণ চিত্র আমাদের সম্মুখে ফুটে ওঠে। অতি অল্প কথনে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের সামগ্রিক ঘটনার আভাস দিয়েছেন। এত বিস্তৃত পটভূমি হওয়ায় উপন্যাসটিতে কোন নির্মম ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও দেখা যায় না, বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণী বিন্যাসে উপন্যাসের গাম্ভীর্য কিছুটা ম্লান হয়েছে। বাস্তবতার স্বাদ কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে। জীবনের নিরাভরণ দ্যোতনায় ছেদ পড়েছে। তবে লেখকের মূল উদ্দেশ্য সম্ভাবত জীবনের গতিপথ নির্ণয় করা। তাই তাবত দুনিয়া ঘুরে ঘুরে নানা অন্যায় অত্যাচার শোষণের আভাস দিয়ে মানুষের চলার পথকেই দৃশ্যায়িত করতে চেয়েছেন। মানব জীবনে সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতার শেষ নেই। প্রায়শই অন্যায় অত্যাচারের সম্মুখীন হয়, ভুল করে, বিপদে পড়ে অনেক সময় জীবন প্রদীপ নিস্তেজ হয়ে যায় তবুও তার চলার শেষ নাই। দুমড়ে মুচড়ে ক্ষয়ে যাওয়া দেহকে মেরামত করে পুনরায় অগ্রসর হয়, অসীম পাথারে ঝাপিয়ে পড়ে। হয়তো কোন গন্তব্য পায়, হয়তো বা পায় না। তবু জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত উপন্যাসের চরিত্র তপু ও ইভার মাধ্যমে জীবনযুদ্ধের সংগ্রামকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশীয় নানা ষড়যন্ত্র শোষণ এমনকি বিদেশি চক্রান্তের বাস্তব সাক্ষী হয়েই মানব জীবনের চরম লক্ষ অনন্তের পানে ছুটে চলার মতাদর্শকে উপন্যাসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি এদেশের মানুষকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, সাহস যোগাতে চেয়েছেন। নানা অন্যায় অত্যাচারে যারা সর্বশান্ত। তাঁর আকাঙ্ক্ষা এদেশের মানুষ যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। পূর্বের সংগ্রামের মতো নতুন উদ্দামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সম্মুখ সমরে। কারণ তাদের পথ চলার শেষ নেই। ঔপন্যাসিক মূলত সমগ্র বিশ্বের শুষ্ক প্রান্তে দাঁড়িয়ে বর্ণ-ধর্ম-জাতি-শ্রেণি বৈষম্যের উর্ধ্বে উঠে মানব জীবনের গতি এবং বিশ্বমানবতার কথা সার্থকভাবে ব্যক্ত করেছেন এ উপন্যাসে।

বর্ণনার শেষ পঙক্তিতে এসে বলা যায় জহির রায়হান তাঁর সমকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকৃত নির্যাস দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসকে শিল্পীত করেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বভূমির নানা রাজনৈতিক শোষণ অত্যাচার বর্ণনা করে মানব জীবনের সংগ্রামকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। আর উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে মানব জীবনের অফুরান্ত সংগ্রামের অকাট্য সত্যকে বিশ্বস্ত ও সার্থক রূপায়ণ করেছেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে আর কত দিন মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজাই এ উপন্যাসে মূল উপজীব্য।

কয়েকটি মৃত্যু

'কয়েকটি মৃত্যু' (১৯৭০) জহির রায়হানের মননধর্মী উপন্যাস। মানুষের বাহ্যিক আচার ব্যবহারের চেয়ে তাদের আন্তর বিশ্লেষণেই যেন উপন্যাসিক অধিক সচেষ্ট। ক্ষুদ্রকলেবরে হৃদয়বৃত্তির অক্ষুন্ন রোমান্টিক আবেশে মানব চরিত্রের আত্মোপলব্ধি মনন বিশ্লেষণ ও সত্তা সন্ধানের চমৎকার বাণী বিন্যাস হয়েছে উপন্যাসটিতে জহির রায়হানের রচনার মৌল প্রবণতা মধ্যবিত্তের জীবন রূপায়ণ। এখানেও তার ব্যাত্তয় ঘটেনি। মধ্যবিত্তের আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থন্বেষিতা ও সুযোগ সন্ধানী বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশে সমাজের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করেছেন এখানে। জীবনের শেষ দিকে এসে মানুষের ভেতর যে মৃত্যু চিন্তার আবির্ভাব ঘটে সেই প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে সংসারী মানুষদের বিচলিত হওয়ার বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন। জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়েও মানুষ চলে যেতে চায় না, চায় না অতি কষ্টে গড়া সংসার ছাড়তে, নিজের সকল পরিশ্রমের ফসল ত্যাগ করতে। আর তাই নানা কৌশলে নিজের অস্তিত্ব বা অবস্থানকে দৃঢ় করতে চায়, টিকিয়ে রাখতে চায়। প্রতিটি মানব জীবনের এই কঠিন সত্যই লেখক অতি নিপুণভাবে ব্যক্ত করেছেন এ উপন্যাসে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আহমদ আলী শেখ। তার চার ছেলে এক মেয়ে। তিন ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছেলের বয়স একুশ বছর। ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে ছেলে তিনটির বউয়েরাও খুব ভালো। বড় ছেলে সাইত্রিশ বছরের মনসুরের পাঁচ ছেলে মেয়ে, পেশায় উকিল। মেজো ছেলে চৌত্রিশ বছরের আহসানের দুই ছেলে মেয়ে, সে ইঞ্জিনিয়ার। সেজো ছেলে আটাশ বছরের মকবুলের আট মাসের মেয়ে। পেশায় পাটের কারবারি। আর ছোট ছেলে শামসু রোগা প্রকৃতির। স্ত্রী পুত্র কন্যা-পুত্রবধূ ও নাতি নাতনী সবাই মিলে সমৃদ্ধ সংসারে বেশ সুখেই কাটত তাঁর দিন। মাঝে মাঝে সবাইকে এক ঘরে ডেকে এনে তাদেরকে দেখতেন। একজন চাষী যেমন তার ফসল ভরা খেতের দিকে চেয়ে থাকে তেমনি সবার দিকে তাকিয়ে তাদের দীর্ঘজীবি করার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা করতেন। তিনি এদেশের বাসিন্দা নয়। ভারত থেকে এসেছেন। আর আসার কারণ উল্লেখে লেখক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসে আহমদ শেখের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ১৯৬৮ সালে। কিন্তু তারা এদেশে এসেছিল আরো পূর্বে। তখন ছিল উনিশ সাতচল্লিশ সাল। ভারত পাকিস্তান বিভক্তির সন্ধিক্ষণ। ভাষা, ধর্ম ও ব্যক্তিগত সুবিধার কারণেই হয়তো আহমদ শেখ এসেছিল ঢাকায় বসতি গড়েছে এদেশ ছাড়া এক হিন্দুর পরিত্যক্ত বাড়িতে। লেখকের বর্ণনায় :

> বাড়িটা এককালে কোন এক বিত্তবান হিন্দুর সম্পত্তি ছিলো। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর তাদের চব্বিশ পরগণার ভিটে বাড়ি, জমিজমা পুকুর সবকিছুর বিনিময়ে এ দালানটার মালিকানা পেয়েছেন। মূল্যায়ণের দিক থেকে হয়তো এতে তাঁর বেশ কিছু লোকসান হয়েছে তবু অজানাদেশে এসে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পাওয়া গেলো সে কথা ভেবে আল্লাহর দরগায় হাজার শোকর জানিয়েছেন আহমদ আলী শেখ।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪১৩)

জটিল রাজনেতিক সংকটে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন দিশাহারা, তখন তারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। নিজেদের প্রশান্তি ও স্বস্থির জন্য আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর হয়ে উঠে। আহমদ শেখের মধ্যেও সেই সংকটকালীন প্রবৃত্তির উৎপত্তি

হয়। এদেশে এসে নিজে ও নিজের পরিবারের স্বার্থ রক্ষার্থে উন্মুখ হয়ে ওঠে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ নিজের সুখ, শান্তি, লাভ, লোকসান বড় করে দেখে। আহমদ শেখও সেই প্রকৃতির। রাজনৈতিক সামাজিক কোন রকম ঘটনাই তার জীবনে গুরুত্ব নাই। বর্ণিত রয়েছে :

> রাজনৈতিক খবরাখবরে তাঁর কোন উৎসাৎ নেই। দল গড়ছে। দল ভাঙছে। দফার পর দফা সৃষ্টি করছে। আর বক্তৃতা দিয়ে। ভিয়েতনামে ত্রিশ জন মরলো। রোজ মরছে। তবু শেষ হয়না। আইয়ুব খানের ভাষণ। আর কাশ্মির, কাশ্মির পড়তে পড়তে মুখ ব্যথা করে উঠে। আহমদ আলী শেখ মামলা মকদ্দমার খবরগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন। আর পড়েন পাঠের বাজারে উঠতি পড়তির খবরা খবরগুলো কিংবা নতুন করে কোন দালান কোঠা ব্রিজ, কারখানা তৈরির খবর থাকলে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪১৪)

মূলত তাঁর স্বার্থই সবার উপরে অবস্থান করে। দেশ-দুনিয়া উচ্ছন্নে গেলেও তাঁর কোন উদ্বেগ নাই। তিনি শুধুমাত্র তাঁর ছেলেদের উন্নতির কথাই ভাবেন। এছাড়া এমন বক্তব্যের মাধ্যমে লেখক বিচক্ষণতার সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনার আভাসও দিয়ে গেলেন। আহদম শেখ বৃদ্ধলোক। তার জীবনতরী শেষ ঘাটে ভিড়বার অপেক্ষায় তবু তার অন্তরে বৈশ্বিক চেতনা মূর্তমান। তিনি জীবনের প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন।

'যারা আত্মকেন্দ্রিক তাদের মধ্যে যেমন স্বার্থপরতা কাজ করে তেমন অবাস্তব অন্ধবিশ্বাসও কাজ করে। কাজ করে প্রতিক্রিয়াশীল ও কাজ করে অমানবিক দৃষ্টি ভঙ্গিত। জহির রায়হান সূক্ষ্ম কৌশলে মানুষের নাড়ির সঙ্গে জড়ানো সুবিধাবাদিতা, রক্ষণশীলতা, অন্ধবিশ্বাস, ভণ্ডামী, আত্মপরায়ণতা টেনে টেনে বের করেছেন। মৃত্যু ভীতিটাও কিন্তু যেমন অন্ধবিশ্বাস থেকে, তেমনি স্বার্থপরতা থেকে আসে।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ৭৫)। আহমদ শেখের মধ্যেও মৃত্যু ভীতি কাজ করে এক রাতের স্বপ্ন থেকে। তিনি স্বপ্ন দেখেন চারাটে সাদা কাপড়ে ঢাকা মূর্তি এসে খাটের পাশে দাঁড়ায় এবং তাকে নিয়ে যেতে চায়। বাইশ বছর আগে তার বাবা এমন স্বপ্ন দেখার পরদিন মেঝ ভাইসহ বাবা কলেরায় মারা যায়। আর বাইশ বছর পর একই স্বপ্ন দেখায় তিনিও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এরপর থেকে মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তা অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে গেথে গেল। ভয়ে তিনি দিশাহারা হয়ে ওঠেন। এতদিন মৃত্যুর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন বুড়ো কর্তা। দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করলেও তিনি নিজেকে বৃদ্ধ ভাবতেন না। কিন্তু একটি স্বপ্নেই তার চিন্তাধারা পাল্টে দেয়। বর্ণিত আছে :

> মনে মনে আজরাইলের কথা ভাবলেন বুড়ো কর্তা।
> পরলোকের কথা ভাবলেন।
> হাসরের ময়দানের কথা ভাবলেন
> বেহেস্ত আর দোজখের কথা ভাবলেন।
> .....
> অনেকদিন হলো তিনি বুড়ো হয়েছেন। কিন্তু

বার্ধক্যের অনুষঙ্গ গুলো কোনদিন উপলব্ধি করেন নি। আজ মনে পড়েছে।

দেহটা ভার ভার লাগছে মনে হচ্ছে বুঝি লাঠি ছাড়া তিনি হাঁটতে পারবেন না।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪২৯-৪৩০)

আহমদ আলী জীবনের সঙ্গে এতটাই একাত্ম ছিল যে তার অন্য কোন দিক দৃষ্টিগোচর হয়নি। পৃথিবী থেকে এক সময় চলে যাওয়ার মতো কঠিন সত্যকেও তিনি ভুলে গিয়েছেন। মূলত নির্মম সত্যকে সমাজের পরগাছারা মেনে নেয় না। যখন বিপদ আসে তখন তাদের টনক নড়ে। যেমনটি দেখা যায় আহমদ শেখের মধ্যে। তিনি জাগতিক মহা সত্যটিকে মেনে নিতে চান নি। তাই যখন তার ছেলেদের মৃত্যু কথা ছায়ামূর্তিরা উপস্থাপন করে তখন নিজেকে স্বার্থপরতার উর্ধ্বে তুলতে পারেন নি। বরং তার বক্তব্য ছিল এমন : 'তুমি আমার দুটি ছেলেকে না মেরে তাদের তিন তিনটি বউ আছে আমার ঘরে। তাদের তিনটি বউকে মেরে ফেলো। বউমারা গেলে বউ পাওয়া যাবে। কিন্তু ছেলে মারা গেলে তাদের তো আমি আর ফিরে পাবো না।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৩৩)। স্বার্থপর সুবিধাবাদী সঙ্কীর্ণ লোকেরাই এমন প্রার্থনা করতে পারে। তারাই অন্যের সর্বনাশ ডেকে নিজের ভালো করতে চায়। নিজের শান্তির জন্য কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য ব্যবহার করতেও দ্বিধা করে না।

উপন্যাসে শুধুমাত্র আহমদ শেখই আত্মকেন্দ্রিক নয় অধিকাংশ চরিত্রই নিজেকে নিয়ে বিভোর। তারা কেউই এ পৃথিবী ত্যাগ করতে চায়না। পৃথিবীর আস্বাদ গ্রহণে ব্যাকুল। আহমদ শেখের বড় ছেলে মকবুল আলী। সেও বাবার মতো আত্মকেন্দ্রিক। তাই বাবার স্বপ্নের কথা শুনে খোদাকে ডাকার জন্য ব্যতীব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রীর কাছে কাছে বাবার জায়নামাজী চায় নামাজ পড়ার জন্য। আর যখন বাবা তার চার সন্তানের দুজনের সেচ্ছায় মৃত্যু ইচ্ছা জানতে চায় তখন বলে, : 'কাঁপা গলায় অস্পষ্ট স্বরে সে বললো, আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি আব্বা। আমি আপনার বড় ছেলে। আমি মরে গেলে আব্বা। আব্বা। আমার অনেকগুলো ছেলেপিলে। আপনি একটু বিবেচনা করে দেখুন আব্বা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৩৩)

অন্যদিকে বাড়ির মেঝ ছেলে আহসানও মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তার ইন্সিওরেন্সের সঞ্চয় রয়েছে। যদিও তার মৃত্যুর পর তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চিতে থাকবে তবু ভয়ে কাতর হয়ে বাবাকে বলেছে :

'কাঁদো কাঁদো গলায় মেজ ছেলে বললো, আব্বা, আমি আপনাকে বেশি ভালোবাসি আব্বা। আপনার যখন সেবার অুসখ করেছিলো, আমি আব্বা সারারাত জেগে আপনার সেবা করেছি। আমি মরে গেলে আব্বা, আব্বা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৩৩)

উপন্যাসে কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্মত চরিত্র আহমদ শেখের সেজ ছেলে মকবুল। অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে সে কুণ্ঠিত হয় না। জীবনের নিয়মেই সে চলতে চায়। তবে মৃত্যু ভয় তাকে বিচলিত করেছে, সেও বাঁচতে চেয়েছে। বাবার কাছে আকুতি করে এভাবে : 'ক্ষীণ কণ্ঠেস্বরে কোনমতে বললো আব্বা আমি আপনার সবচেয়ে আদরের ছেলে।

মনে নেই আব্বা, সেবার আপনার যখন কিছু টাকার দরকার হয়েছিলো তখন কেউ দেয়নি। আমি দিয়েছিলাম। আব্বা আমি মরে গেলে আমার ছোট বাচ্চাটা আব্বা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৩৩)

অন্যদিকে ছোট ছেলে শামসু। সে রোগা প্রকৃতির তবুও সে বাঁচতে চায়। জীবনকে উপভোগ করতে চায়। সংসার সাগরের মোহে আবদ্ধ থাকতে চায়। মৃত্যুর কথা বলতে গেলে সে বলে :
'আব্বা আমি আপনার ছোট ছেলে। সবার শেষে দুনিয়াতে এসেছি। আমি এখানো বিয়েশাদিও করিনি আব্বা। এখন আমি মরে গেলে আমার কবরে বাতি দেওয়ারও কেউ থাকবে না আব্বা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৩৩)

অন্যদিকে বাড়ির বড় বউ মনে করেছে শামসু আর বুড়ো কর্তা মারা যাবে তারা তাঁর সম্পতি ভোগ করবে। আবার আহমদ শেখের মেয়ে আমেনাও বাড়িতে এসে এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে বিব্রত-বিরক্ত। তার মধ্যেও মৃত্যুর ভয় কাজ করছে। তাই স্বামীকে পত্র লিখেছে যত তাড়াতাড়ি এ বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে পারে যেন নিয়ে যায়।

তবে এ উপন্যাসের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের চরিত্র হল আহমদ শেখের স্ত্রী হাজারা খাতুন। বাড়ি কেউ যখন মরতে চায় না বরং অন্যদের মৃত্যু কামনা করে ঠিক তখন তিনি নিজেকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি। মৃত্যুকে ভয় করেও সকলের মঙ্গলার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছেন। জায়নামাজে বসে তার মৃত্যুর বিনিময়ে সকলকে রক্ষা করতে বলেছেন। লেখক মূলত মানবিকতা গুণের বিকাশ ঘটাতেই চরিত্রটি উপস্থাপন করেছেন। তার বক্তব্য এমন :

> ইয়া আল্লাহ। কাউকে যদি মরতে হয় তাহলে সবার আগে আমাকে মারো। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ইয়া আল্লাহ, আমি বেঁচে থাকতে আমার কোন ছেলেমেয়ের গায়ে হাত দিয়ো না। আমার স্বামীর গায়ে হাত দিয়োনা। ইয়া আল্লাহ আমি যেন তাদের সবার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৩৩-৪৩৪)

এখানকার দুই বলিষ্ঠ জীবন্ত তবু ক্ষুদ্র দুটি চরিত্র রসুল ও পেঁচি। তারা সংসার সাগরের সকল কুসংস্কারের উর্ধ্বে। একে অপরকে ভালোবেসেছে। তবে কোন অলীক স্বপ্নকে বিশ্বাস করেনি। তারা পরকাল মানে না। তাই তারা ভীত নয়। জীবনকে উপভোগের মধ্যেই তাদের আনন্দ, রসুল পেঁচিকে বলে : 'দাঁড়া, একটা এক্ষুনি ধরিয়ে খাই। মরার আগে অন্তত একটা দামী সিগারেট খেয়ে মরি। মরার কথা বললেই কি মানুষ মরে না কিরে। তোকে বললাম না ওসব স্বপ্ন টপ্ন নিয়ে বেশি মাথা ঘামাসনে পেঁচি। সব বাজে একে বারে ভুয়ো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪২৭)

এভাবে লেখকের মানব জীবনের অতি বাস্তব একটি দিক মৃত্যু চিন্তার প্রসঙ্গ তুলে এনেছে। মৃত্যুর মতো সত্য বিষয়ও মানুষকে ভীত করে, মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। লেখক বোঝাতে চেয়েছেন মানব জীবনের নানান অভিজ্ঞতা আস্বাদেই তার স্বার্থকতা। মৃত্যু নিয়ে বিচিত্র ভাবনার পাশাপাশি লেখক এখানে মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতাকে বাস্তব সম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তৎকালীন সমাজে সদ্য রূপান্তরিত মধ্যবিত্তের গণ্ডি ছিল নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে। তাদেও জীবনের

গতিবিধি একই বিন্দুতে ঘুর্ণায়মান। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। মানবিকতা ও পরোপকারের চেতনা যেখানে অনুপস্থিত। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, স্বীয় সুবিধার কথা চিন্তা করাই তাদের আচরণিক বৈশিষ্ট্য। লেখক মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ চেতানাটি উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আহমদ আলী শেখ অবসর জীবনের সুখী সংসারে থেকেও সর্বদা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অন্যকে নিয়ে ভাবনার কোন ফুরসত নেই তাঁর। এমনকি মৃত্যুর কথাও ভুলে যান। কীভাবে এবং তাঁর ছেলেদের সুবিধা হবে এটাই ছিল তার একমাত্র অন্বিষ্টের বিষয়।

এ উপন্যাসে স্বার্থপরতার ভয়ঙ্কর চিত্র দেখা যায় বুড়ো কর্তার ছেলে মেয়ে ও বউদের আচরণে। তারা সবাই আত্মকেন্দ্রিক। তাদের মধ্যে যেমন কাজ করেছে অন্ধবিশ্বাস, তেমনি রয়েছে অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আর এসবের মূলে রয়েছে জীবনের প্রতি মোহ। মার্কসবাদীরা বলেন ভয় থেকেই ধর্মের প্রতি বিশ্বাস জন্মে। এখানে আমরা তেমনটি দেখি। বুড়ো আহমদের বড় ছেলে মকবুল মৃত্যুর কথা শুনে টালমাটাল হয়ে পড়ে। হঠাৎ তার পরকালের কথা মনে পড়ে কারণ সে আদালতে মিথ্যার কারবারি করে। তখন সেটা করে পরকালের বেসাতি গোছাতে স্ত্রীর কাছে জায়নামাজ চায় নামাজ পড়বে বলে। অন্যদিকে স্ত্রীর কাছে কটু কথা শুনে তার পাপের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়। এটি মধ্যবিত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্ণিত আছে :

> হ্যাঁ। পাপ আমি করেছি বইকি। কিন্তু কাদের জন্য করেছি। তোমার জন্যে।
> তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে।
> তাদের ভবিষ্যতের জন্যে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪২৪)

ওদিকে তার স্ত্রীর মধ্যেও স্বার্থপরতার হিসাব জাগ্রত হয়েছে। বুড়োর মৃত্যুর পর সম্পত্তির হিসাব বুঝে নিতে তার চেতনায় মধ্যযুগীর চিন্তা চেতনা বিরাজমান। তার মতে স্বামী বড় ছেলে হওয়ার বাবার সম্পত্তিতে সবার থেকে তার অধিকার বেশি থাকবে যা তাদের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ ও স্বচ্ছল করবে। তারা ভাষ্য এমন : 'তুমি হলে বাড়ির বড় ছেলে। তোমার ভাগে কিছুটা বেশি হওয়া উচিত।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৩০)

আর আহসানের স্ত্রী হিসেব করে স্বামীর ইন্সুরেন্স করেছে কিনা। অন্যদিকে সেজো বউ তার মৃত্যুরপর স্বামী বিয়ে করবে কিনা জানতে চায়। এছাড়া তারা তিন বউ ভাবে, এ যাত্রার রুগ্ন দেবর শামসু আর বুড়ো মারা যাবে এবং শ্বশুরের সম্পতি নিয়ে তারা সুখে শান্তিতে থাকবে। নির্মম ও সংকীর্ণ চিন্তা শুধু তিন বউ নয় বুড়োর মেয়ে আমেনার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। বাবার বাড়ির এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে এসে সে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে কি বরং এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে স্বামীর কাছে চিঠি লিখেছে যাতে তাড়াতাড়ি নিয়ে যায়। এভাবে আত্মরক্ষার নানা উপায় বর্ণনার মাধ্যমে লেখক সমাজ মানুষের মনের সুপ্ত সংকীর্ণ চেতনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসটিতে।

উপন্যাসের পরিসমপ্তিতে চাকর আবদুলের স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠলেও এই সব চরিত্রের অমানবিক আচরণের চিত্র উন্মাচিত হয়। তারা তাকে বাঁচাতে কোন রকম সাহায্য করতে চায় না কারণ দু'জন লোকের মৃত্যু আবদুলের বউ ও বাচ্চার উপর দিয়ে গেলই বাঁচা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবার আসা ব্যর্থ করে দুই যমজ বাচ্চার জন্ম হয়।

মানব জীবনের অন্তর ভাবনা চিত্রণের পাশাপাশি সমাজের বাহ্যিক অবয়বকেও দেখানো হয়েছে। এখানে যেমন এসেছে রাজনীতি তেমনি এসেছে সামাজিক আচার বন্ধন। তৎকালীন সমাজের পারিবারিক যৌথ বন্ধনকে লেখক অতি বিশ্বস্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। হয়তো বর্তমান সময়ে যৌথ পরিবারের প্রচলন নেই বললেই চলে কিন্তু তৎকালীন সময়ে পারিবারিক বন্ধন অটুট ছিল। সবাই একই সঙ্গে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতো। লেখক অতি দক্ষতার সঙ্গে সেই বন্ধনকেও তুলে ধরছেন এখানে। আর শেষে জীবনের জয়গান করেছেন। যদিও পুরো উপন্যাস জুড়ে সবার মনে এক ধরনের মৃত্যুভীতি কাজ করেছে, কিন্তু শেষে তিনি দুটি সন্তানের জন্মানোর দৃশ্য বর্ণনা করে নতুন বার্তাকেই পাঠক সমাবেশে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন মৃত্যুর চেয়ে জীবনের স্বার্থকতা অনেক। তাই মৃত্যুচিন্তা করে জীবন উচ্ছন্ন না করে বরং নতুনকে বরণ করার মানসিকতা জাগ্রত করা আহ্বান করেছেন এ উপন্যাসের মাধ্যমে।

এ উপন্যাসটি ক্ষুদ্র কলেবরের বলে অনেকে উপন্যাস বলতে চান নি। তাদের কাছে এটি নক্সা জাতীয় রচনা। তবে পুরোপুরি শিল্পসফল না হলেও উপন্যাসের অনেক গুণ বিদ্যমান। 'মূলতঃ এটি একটি পোট্রেট গ্যালারী। চরিত্র চিত্রণ বাস্তবায়ণ লেখকের একদেশদর্শিতার দোষমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। বুড়ো কর্তার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে অঙ্কিত। আর একটা রুচিশীল কৌতুকের ফল্গুধারা রচনাটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে।' (কবির চৌধুরী ২০০১ : ৬৭)

উপন্যাসটিকে রূপকাশ্রিত উপন্যাস বলা যেতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে আহমদ শেখের পরিবারকে সুখী সমৃদ্ধ মনে হলেও তার অন্তরালে স্বার্থান্বেষী, সংকীর্ণ কুসংস্কারচ্ছন্ন এক পরিবারের প্রতিচিত্রই লেখক অঙ্কন করেছেন। আর এই বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চরিত্রগুলিকে মৃত্যুর ভয়ে ভীত স্বন্ত্রস্ত করেছেন। সমাজ ক্রমাগত নষ্টদের হাতে চলে যাচ্ছে সেই বিষয়টি তাঁকে বিচলিত করে এবং জনস্বার্থরক্ষার্থেই এমন বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন। তবে তাঁর মধ্যে আশাবাদী চেতনা ছিল প্রবল। এ কারণেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে সকল অপশক্তি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ও স্বার্থপরতার শিকল মুক্তির আভাস দিয়েছেন।

মূলত এখানে সত্য বক্তব্য উপস্থাপনই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। তাই উপন্যাসের আঙ্গিক নির্মাণে তিনি যত্নশীল ছিলেন না। কথার পর কথা রচনা করে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন মাত্র। অন্যান্য উপন্যাসে তাঁকে যেমন প্রতিনিয়ত ফর্ম বা কাঠামো নিয়ে খেলতে দেখা যায় এখানে তেমনটি অনুপস্থিত। অতিসংক্ষিপ্ত এই রচনায় অলঙ্কার ব্যবহারেও কৃপণ ছিলেন ঔপন্যাসিক। খুব সামান্য উপমার ব্যবহার চোখে পড়ে। তাঁর উপমার ব্যবহার এমন : 'ভরা ফসলের ক্ষেতে

পোকা-পড়ার পর অসহায় আতঙ্ক নিয়ে একজন চাষী যেমন করে তাকিয়ে থাকে ঠিক তেমন করে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪২৩)

এছাড়া ছোট ছোট বাক্য ও সরল বাণী বিন্যাসের মাধ্যমে অতিঅল্প পরিসরে জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন সার্থকভাবে। মাঝে মাঝে আবার তিনি বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে জীবনের এমন গুরুগম্ভীর চেতনাকে অতি অল্প ও ভাসা ভাসা বর্ণনা করায় উপন্যাসের গুণ ক্ষুন্ন হয়েছে, সার্থক শিল্প প্রশাখা হিসেবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এমন স্পর্শকাতর বিষয় আলোচনার লেখকের আরও সতর্ক ও যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল। তারপরও বলা যায় জীবন বিন্যাসের আপাতদৃষ্টি দিয়ে দেখা জীবনকে রূপায়ণে লেখকের প্রচেষ্টা সমাদরযোগ্য।

একুশে ফেব্রুয়ারী

জহির রায়হান শুধু একক নাম নয় যেন একটি আদর্শের প্রতীক, একটি জাতির আশ্রয়স্থল। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যাঁর উন্মেষ, রাজনৈতিক উত্তাল উঠানে তাঁর পরিভ্রমণ। বাস্তব জীবনের এই পরিক্রম বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। সেই ক্রমধারায় তিনি রচনা করেন উপন্যাস 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৭০)। উপন্যাসটি তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো নয়। অনেকটা চিত্রনাট্যের ঢঙে অতি ক্ষুদ্র অবয়বে একুশের সংগ্রাম বর্ণনা করেছেন। মূলত ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে জহির রায়হান একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে ছবি বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তবে নানা বাঁধা-বন্ধকতার কারণে শেষ পর্যন্ত ছবিটির চিত্রনাট্য হিসেবই এ উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। এটি তাঁর জীবনের শেষের দিকের রচনা। তবে তার আবেদন সমকাল পর্যন্ত চলমান।

জহির রায়হান সরাসরি একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৪৪ ধার ভঙ্গের মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছেন। তখনকার সকল উত্তাল ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এমনকি ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার মিছিলে প্রথম দশ জনের মধ্যে তিনিও ছিলেন, যা সম্পর্কে নিজেই বলেছেন 'ছাত্রদের গ্রুপে ভাগ করা হলো। আমি ছিলাম প্রথম দশজনের ভেতর। '১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে। কিন্তু প্রথম ব্যাচে কারা যাবে? হাত তুলতে বলা হলো। অনেক ছাত্র থাকা সত্ত্বেও হাত আর ওঠেনা। কারণ ক্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে পজিশন নিয়ে বসে আছে। ভাবখানা এই যে, বেরুলেই গুলি করবে। ধীরে ধীরে একটা দু'টো করে হাত উঠতে লাগলো। গুণে দেখা গেলো আটখানা। আমার পাশে ছিলো ঢাকা কলেজের একটি ছেলে। আমার খুব বাধ্য ছিলো। যা বলতাম, তাই করতো। আমি তুলে ওকে বললাম হাত তোল। আমি নিজেই ওর হাত তুলে দিলাম। এই ভাবে দশজন হলো।' (শাহরিয়ার কবির ১৯৮৬ : ৯)। এমন বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। বিবেকের তাড়নায় নিজ দায়িত্বে তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে তৎকালীন রাজনৈতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন্ত রূপে। এক্ষেত্রে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' যেন বায়ান্নের একুশ তারিখে ঘটে যাওয়া চিত্রের বাস্তব দলিল। নানা শ্রেণিপেশার লোকের চেতনায় একুশ কতটা প্রখর, কতটা সক্রিয় এবং একুশ বিরোধী শক্তির অপপ্রচেষ্টা এ আন্দোলন কতটা ক্ষীণরূপে দৃশ্যমান তারই সচিত্র অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে গ্রামীণ প্রেক্ষাপট থেকে। ঐতিহ্যের ধারক জহির রায়হান জানতেন বাংলাদেশের সমগ্র ঐতিহ্যের সূতিকাগার গ্রামীণ সমাজ জীবন। তাছাড়া এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাই গ্রামীণ সমাবেশের সংযুক্তি ছাড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন শহরে মানুষের প্রতিবাদে একটি জাতীয় আন্দোলন সম্ভব নয়। ভাষা আন্দোলনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শুধুমাত্র শহরের নাগরিকদের একার প্রচেষ্টা নয়। লেখক প্রথমেই আন্দোলনের সূত্রপাতের পটভূমি হিসেবে গ্রামীণ দৃশ বর্ণনা করেছেন :

> একরাশ কৃষ্ণচূড়া ঝরে পড়লো গাছের ডাল থেকে।
>
> সূর্যের প্রখর দীপ্তির নিচে- একটা নয়, দুটো নয়। অসংখ্য কালো পতাকা এখন।

উদ্ধত সাপের ফণার মতো উড়ছে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫২)

প্রকৃতি বর্ণনার সাথে সাথে তিনি তৎকালীন সময়ের চিত্রও তুলে ধরলেন। সময়টি ছিল ফাগুন মাস, যখন কৃষ্ণচূড়া ফোটে আর চারিদিকে কালো পতাকা যেন প্রতিবাদের প্রতীকি উপস্থাপন। লেখক নানা ঘটনার মাধ্যমে সমাজে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের জীবনে একুশ তারিখ কীভাবে এসেছিল তা বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছে গ্রাম্য চাষী গফুর, ঢাকা শহরের রিক্সাওয়ালা সেলিম, প্রতিবাদী ছাত্র তসলিম, পুলিশ অফিসার আহমেদ হোসেন, বিত্তবান মকবুল সাহেবের পরিবার, কবি আনোয়ার ও তার স্ত্রী সালেহা। এখানকার প্রতিটি মানুষের জীবনে একুশ এসেছে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমায়।

উপন্যাসের প্রথম চরিত্র রসুল। সে গ্রাম্য কৃষক। গভীর রাতে গ্রামের মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে সুর করে ছহি বড় সোনাভানের ও ছয়ফল মুল্লুকের পুঁথি পড়তো। স্বপ্ন দেখতো খুব, পুকুর ঘাটে লাল সবুজ ডুরে শাড়ি পরা আমেনাকে দেখে তার ভালো লেগেছিল। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। এক সময় বিয়ে ঠিক হয়। আর বিয়ের ফর্দ কিনতে ঢাকা শহরে এসেছিল বিশ তারিখে। বাজার করতে করতে দেরি হওয়ায় সে রাতে থেকে যায় শহরে। এছাড়া তার আর একটি উদ্দেশ ছিল, শহরে হরতাল দেখবে :

ইচ্ছে করলে সে আজ গ্রামে ফিরে যেতে পারতো। কিন্তু যায় নি। কারণ সে হরতাল দেখবে।
হয়তো কোনোদিন আর শহরে আসা নাও হতে পারে। তাই হরতাল সে দেখে যাবে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৬২)

কিন্তু তার আর গ্রামে ফিরে যাওয়া হলো না। আর কোনদিন আমেনার সঙ্গে দেখাও হলো না। বিনা কারণে প্রাণ দিতে হলো পাক বাহিনীর হাতে।

এখানকার আর একটি পরিবার আহমেদ হোসেনের। পেশায় পুলিশ। সরকারের অনুরক্ত কর্মচারী। অতি সচ্চরিত্র। হিতাহিত জ্ঞান না করে সরকার যে হুকুম দেয় তাই পালনে সর্বদা প্রস্তুত। তবুও তার প্রমোশন হচ্ছে না। কারণ তার ছেলে তসলিম সরকার বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ছেলেকে নানা ভাবে শাসিয়েও কোন কাজ হলো না। তাই তার মনে অনেক কষ্ট। তবে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে আমজনতার উপর গুলি চালিয়ে কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। এবার হয়তো তার প্রমোশন হবে। একুশের সন্ধ্যায় হত্যাকাণ্ডের পর লাশ সরিয়ে ফেলার পূর্ব মূহুতে তার আশা ব্যঞ্জক বক্তব্য এমন :

লাশগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নাও গাড়ির ভেতরে। এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। লাশগুলো আর একবার দেখবেন কি স্যার? আরেক সহকারী প্রশ্ন করলেন। প্রয়োজন নেই। শান্ত গলায় জবাব দিলেন আহমদ হোসেন।

রুমালে আবার মুখ মুছলেন তিনি। ছেলে তসলিমের মূর্খতার জন্য এতো দিন প্রমোশন বন্ধ হয়েছিলো। এবার সরকার হয়তো মুখ তুলে তাকাবেন তাঁর দিকে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৭৪)

উপন্যাসের আরেকটি পরিবার আনোয়ার হোসেনের। পেশায় সে কেরানি। তবে তার মধ্যে রয়েছে একটি কবি মন যা মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। যখন স্ত্রী সালেহার সঙ্গে তিনি ঝগড়া করেন বা দিন শেষে ক্লান্তিতে যখন তিনি স্তনমিত হয়ে পড়েন তখন একান্তে বসে তার কবিতা লিখতে ইচ্ছা করে, তবে তার শান্তি নেয়। পোড় খাওয়া জীবনে অর্থের বড় অভাব। সংসার চালানো কষ্ট সাধ্য কোথাও যান না, অফিস আর ঘর এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ জীবন। এর মধ্যেই কিছুটা শান্তি খোঁজার নিরলস প্রচেষ্টায় সক্রিয় তিনি। অফিসে যাওয়ার সময় পানের দোকান থেকে কয়েকটি পান কিনে মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে কবিতা লেখার দিনের কথা মনে করে আনন্দে ভাসেন। তবে তার মধ্যে ছিল আত্মমর্যাদাবোধ এবং দেশপ্রেমের মানসিকতা। তাই অফিস থেকে সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার কথা শুনে তিনি তার চাকরি ছেড়ে দেন ও স্ত্রীকে বলেন :

সালেহা, আমি ঠিক করেছি, আমি আর এ চাকরি করবো না। এসব সরকারি চাকরি মানুষকে ক্রীতদাস করে ফেলে। আমি ছেড়ে দেবো। যেখানে আমার সামান্য স্বাধীনতা নেই সেখানে কেন আমি কুলুর বলদের মতো ঘানি টেনে যাবো। আমি আবার কবিতা লেখবো সালেহা। যে কবিতা পড়ে তোমার একদিন আমাকে ভালো লেগেছিলো- তেমনি কবিতা লেখবো আমি।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৬৩)

একুশ তারিখে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। আর তাঁর ঘরে ফেরা হয় না। শহীদ হন রাজপথে।

উপন্যাসে বিত্তবানের প্রতিনিধি মকবুল আহমেদ। তার পরিবারে কোন ঝামেলা নাই। বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ব্যাংকে টাকা আছে, ছেলে-মেয়েদের বেশ কিছু ইনসুরেন্স আছে। ব্যবসাও আছে অনেকগুলি। তবে তার মনে শান্তি নেয়। স্ত্রী বিলকিস ও ছেলে মেয়ে কারো সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই। তিনি এতটাই ব্যস্ত যে কাউকে সময় দিতে পানেন না। তার আনন্দ শুধু রাতে ক্লাবে বসে বোতল বোতল মদ খাওয়ার মধ্যে আর বিরাক্ত লাগে শ্রমিকরা যখন বেতন বাড়ানোর জন্য চিৎকার করে হরতালের হুমকি দেয়। তার মধ্যে বিন্দু মাত্র দেশপ্রেম নাই। ছেলে পড়াতে বিলেত পাঠাতে চায়। আবার জাতীয় সমস্যা ভাষা নিয়ে যখন সমগ্র দেশ তোলপাড় করছে তখন তাদের দমাবার জন্য পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের হুমকি দেয়েছে। বর্ণিত আছে :

পুলিশের বড়কর্তাকে ফোনে পেয়ে রীতিমতো গালাগাল দিলেন তিনি।

গুণ্ডা বদমায়েশরা রাস্তাঘাটে মেয়েছেলেদের ধরে ধরে অপমান করছে। দেখতে পাচ্ছেন না? কি করছেন আপনারা?

কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিতে যদি কাজ না হয় হাত পা গুড়িয়ে বসে থাকলে চলবে? গুলি করে ওদের খুলি উড়িয়ে দিতে পারছেন না?

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৭২)

এভাবে দেশের সূর্যসন্তানদের উপর নির্মম অত্যাচার করা কথা বলে বিশ্বাস ঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। মূলত সে এদেশের বাসিন্দা হলেও শত্রুদের দোসর হিসেবে কাজ করেছে সমগ্রজীবনে।

উপন্যাসের আর একটি পরিবার ঢাকা শহরের রিক্সা চালক সেলিমের পরিবার। ছেলে কালু আর স্ত্রীকে নিয়েই তার পরিবার। বারো বছর ধরে মালিকের রিক্সা চালিয়ে দৈনিক তিন টাকা রোজগার করে দুই টাকা মালিককে দিয়ে বাকি এক টাকা দিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে কোন ভাবে দিন কাটে। তাই তার স্বপ্ন একটা রিক্সা কেনার। সে বিড়ি খায় না, সিনেমা দেখে না। এমনকি দেশে কি হচ্ছে তা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নাই। তার ভাবনা শুধু একটি রিক্সা কেনার ও ছেলে বড় হলে তাকে রিক্সা চালানো শেখানো। দেশের গোলযোগ তার জন্য সুখকর নয়। হরতাল তার জীবনকে বিষিয়ে দেয়। উপার্জন করতে না পারলে তার দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়। তখন তার মনের অবস্থা এমন :

> রিক্সা না চালালে আমি রোজগার করবো কোত্থেকে? আমি খাব কি? আমার বউ খাবে কি?
> ওসব হরতালের মধ্যে আমি নেই। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫৯-৪৬০)

তবে তার জীবন ও রক্ষা পেলনা এ আন্দোলনে। রাজনীতি সম্পর্কে একে বারে অজ্ঞ হয়েও প্রাণ দিতে হল ঘাতকের গুলিতে। তাদের মতো অতি সহজ সরল নিঃস্পাপ মানুষের আত্মত্যাগের ফলেই আমরা মাতৃভাষার মর্যাদা পেয়েছি।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয় চেতনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জহির রায়হান এই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। স্বশরীরে ও প্রত্যক্ষভাবেই তিনি ভাষা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। বায়ান্ন সালে জহির ছিলেন কলেজ ছাত্র। আকস্মিকভাবে নয় জীবনের অনিবার্য তাগিদেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাইতো তাঁর সৃষ্টিশীলতার মধ্যে একুশের চেতনা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে যা সম্পর্কে শাহরিয়ার কবির বলেন : 'বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন শুধু এদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নতুন চেতনা প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলো। এই চেতনা ছিলো অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্জাত। আমাদের শিল্প সাহিত্যে যারা এই চেতনার ফসল তাদের ভেতর জহির রায়হানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ভাষা আন্দোলনে তিনি শুধু যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তা নয়, তাঁর সাহিত্যে প্রেরণার মূল উৎস ছিলো এই আন্দোলনা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৩৯)

ভাষা আন্দোলন শুধু যে শহুরে মানুষের নয় বরং তা তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত তার সাম্যক চিত্র এখানে দৃশ্যমান। একুশের আত্মহুতির তাৎপর্যময় ঘটনাটি শুধুমাত্র ঢাকা শহরের লোকদের সৃষ্ট নয় ভাষা রক্ষা তথা জীবন রক্ষার তাগিদে নিজেদের অবচেতন মনেই এই স্রোতে যুক্ত হয়েছে গ্রামীণ সহজ সরল মানুষ। তাইতো গ্রাম্যকৃষক গফুরেরও প্রাণ গেল এই আন্দোলনে। ভাষার দাবিতে শহরের ছাত্ররা হরতাল ডেকেছে। তারা শাসককে জানিয়ে দিতে চায় কোনভাবেই

তাদের অধিকার বঞ্চিত করা যাবে না। নিজ রক্ত দিয়ে হলেও সবার প্রাপ্ত আদায় করতে চায়। আর সে আন্দোলনের সূত্রপাত লেখক উপন্যাসের প্রথমে উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> আমাদের মুখের ভাষাকে ওরা জোর করে কেড়ে নিতে চায়। আমাদের প্রাণের ভাষাকে ওরা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। কিন্তু আমরা মাথা নোয়াবো না। আমরা আমাদের ভাষাকে কেড়ে নিতে দেবো না। আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
>
> আর সে দাবিতে কাল হরতাল।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫৯)

অন্যদিকে সরকার হরতালকে প্রতিহত করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারী চাকুরিওলাদের অফিসে আসা বাধ্যতামূলক। বর্ণিত আছে : 'বড় কর্তার হুকুম এসেছে। কাল সবাইকে সময় মতো অফিসে হাজির হতে হবে। হরতাল করা চলবে না। যে হাজির হবে না তাকে সাসপেন্ড করা হবে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৬০)

এই হরতাল এক এক জনের জীবনে এক এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। কেউ কৌতূহল বসত হরতাল দেখতে শহরে থেকে যায়। আবার কারো জীবনে হরতাল দুঃখ ডেকে আনে। কারণ তার রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কেউবা একে আবার প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। রিক্সাওয়ালা তসলিমের কাছে প্রশ্ন করলে সে উত্তরে বলে :'হরতালের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিক্ষোভ জানাতে চাই। আমাদের প্রতিবাদ জানাতে চাই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৬০)। প্রথম দিকে সাধারণ মানুষের কাছে ভাষা আন্দোলনের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। তাই তারা নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন করেছে। আনোয়ারের কাছে সালেহা জানতে চায় : 'হ্যাঁ গো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে তোমার বেতন কি বেড়ে যাবে? ক টাকা বাড়বে বলো তো?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫৭)

অন্যদিকে উচ্চবিত্তদের কাছে এটি অহেতুক বলে মনে হয়, তারা দেশের খারাপ পরিস্থিতি নিয়ে সঙ্কিত হয়। তবে কিছু সংখ্যক লোকের কাছে একুশ এসেছে, আদর্শিক চেতনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। তারা নিজেদের অস্তিত্বের তাগিদে দেশের স্বার্থরক্ষার্থে এমনকি জাতিসত্তা টিকিয়ে রাখতে সোচ্চার হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে তসলিম ও কবি আনোয়ার। আনোয়ারের চেতনায় ভাষা আন্দোলন এমন : 'আমি হরতাল করবো। ওরা নিষেধ করেছে। বলেছে চাকরি যাবে, যাক সেটা পরোয়া করিনা। আমার ভাষার চেয়ে কি চাকরি বড়?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৬৪)

এ উপন্যাসের সর্বাধিক সক্রিয় ব্যক্তি তসলিম। সে একজন ছাত্র। ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিক। বাবার প্রমোশন, মা, ভাই-বোনদের ভবিষ্যতের চেয়ে তার কাছে দেশ বড়। তাদের স্বপ্ন-স্বার্থকে উপেক্ষা করে সে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে প্রতিবাদের মিছিলে। দেশমাতৃকা বিশেষ করে ভাষা রক্ষার আন্দোলনে। অগ্রজ হিসেবে সকল কর্মকাণ্ডে তার দীপ্র পদার্পণ। ভাষা আন্দোলন তার চেতনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। তসলিমের সেই চেতনার প্রকাশ এমন :

আমাদের মুখের ভাষাকে ওরা জোর করে কেড়ে নিতে চায়। আমাদের প্রাণের ভাষাকে ওরা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। কিন্তু আমরা মাথা নোয়াবো না। আমরা আমাদের ভাষাকে কেড়ে নিতে দেবো না। আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

আর সে দাবিতে কাল হরতাল।

(জহির রায়হান ২০১৩ , ৪৫৯)

অন্যদিকে যারা নিজ দেশে থেকেও পরচর্চায় ব্যস্ত, যারা দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের চেতনায় একুশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাদের কাছে ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি বিরক্তির কারণ হয়েছে দাঁড়িয়েছে। এমন অহেতুক বিষয় তাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। বর্ণিত আছে : 'বাংলা বাংলা করে চিৎকার করছে ওরা। বাংলা কি মুসলমানের ভাষা নাকি? ওটাতো হিন্দুদের ভাষা। হিন্দুরা এদেশটাকে জাহান্নামে নেবে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫৮)

যেহেতু উপন্যাসটি রাজনৈতিক। তাই রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ এখানে দৃশ্যমান। এরই একটি বিষয় হরতাল। সমাজের নানা পেশার লোকের জীবনে হরতালের প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রামের কৃষক গফুর সে জানে না হরতাল কি জিনিস। হরতাল দেখার জন্য শহরেই রাত কাটিয়ে গেল। কিন্তু তার আর ফেরা হল না গ্রামে। হরতাল দমনে প্রশাসনের কাল হাত তাকে ঝলসে দিয়েছে। তার জীবনে হরতালের প্রতিক্রিয়া এমন :

হরতাল কি গফুর বোঝে না। পিঠা খেতে খেতে সে নানা ভাবে হরতালের একটা অবয়ব চিন্তা করতে লাগলো। কিন্তু হরতালের কোন সার্বিক চেহারা নির্ণয় করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

সে ভাবলো, এটা হয়তো শহরেরই বিশেষ একটা রীতি কিংবা নীতি। মাঝে মাঝে শহরের মানুষরা এ রকম হরতাল পালন করে থাকে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫৮)

অন্যদিকে যারা শহরের শ্রমিক শ্রেণি তাদের জীবনে হরতাল আসে অভিশাপ হয়ে। তারা প্রতিদিন রোজগার করেই সংসার চালায় একদিন রোজগার না করলে তাদের অনাহারে দিন কাটাতে হয়। তাই হরতাল কোনভাবেই তাদের কাছে কাম্য নয়। এ উপন্যাসে তেমন শ্রেণির লোক সেলিম। হরতাল তার কাছে সব চেয়ে বিরক্ত ও কষ্টের। তার ভাষায় হরতাল এমন :

কিসের হরতাল?

আমি হরতাল মানি না।

.....

রিক্সা না চালালে আমি রোজগার করবো কোত্থেকে?

আমি খাব কি?

আমার বউ খাবে কি?

আমার ছেলে খাবে কি?

ওসব হরতালের মধ্যে আমি নেই।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫৯-৪৬০)

সমাজের আরেক শ্রেণি রয়েছে যাদের কাছেও হরতাল অস্বস্তির কারণ। কোন অবস্থাতেই তারা হরতাল পালনে সমর্থন দেয় না। তারা হল শাসক শ্রেণি। তারা প্রতিবাদী ও সাধারণ মানুষদের সব সময় দমিয়ে রাখতে চায়। যে কোন উপায়েই হোক তারা হরতাল প্রতিহত করতে চায়। মকবুল আহমদ তার স্ত্রীকে বলেছে :

হরতালের সব রাস্তা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। যে হরতাল করবে তার লাইসেন্স আমরা কেড়ে নেবো। কেউ যদি অফিসে না আসে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবো। আমরা জানিয়ে দিয়েছি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছি সবাইকে তারপরও কি কেউ হরতাল করবে বলে মনে হয় তোমার?...

কিন্তু ছাত্ররা হয়তো এক আধটু গোলমাল করতে পারে। তাও আমরা ভেবে রেখেছি।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৬৫)

অন্যদিকে যারা হরতালের ডাক দেয় তাদের কাছে এর ভিন্ন এক তাৎপর্য রয়েছে। সংগ্রামীরা তাদের প্রতিবাদের সোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে হরতাল পালন করে। মূলত যখন তাদের আর কিছু বলার বা করার থাকে না তখনই তারা হরতাল পালনে বাধ্য হয়। যেমনটি করে ছিল বায়ান্নর ভাষা সংগ্রামীরা। সরকার যখন তাদের কোন কথাই শুনতে ইচ্ছুক নয় ঠিক তখনই তারা হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এটি তাদের প্রতিবাদেরই অংশ। বর্ণিত রয়েছে : 'হরতালের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিক্ষোভ জানাতে চাই। আমাদের প্রতিবাদ জানাতে চাই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৬০)। এভাবে এদেশে বিচিত্র জনের জীবনে হরতালের নানামুখী তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে।

রাজনৈতিক উপন্যাস হওয়ায় এখানে সামাজিক ঘটনার উল্লেখ খুবই কম। দু'একটি জায়গায়ই সমাজ জীবনের উল্লেখ রয়েছে। পারিবারিক ঘটনা বলতে আহমেদ হোসেন ও আনোয়ার হোসেনের পারিবারিক কথোপোকথন এসেছে। তাদের স্ত্রীদের কাছে স্বামী সন্তান নিয়ে কোন মতে নিরাপদ জীবন কাটানোই কাম্য। মূলত জহির রায়হানের লেখার মৌল প্রবণতা মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়ণ। রাজনৈতিক চেতনায় প্রকাশের ফাঁকে ও অতি অল্প করে মধ্যবিত্তের একটি মানস বৈশিষ্ট্য দৃশায়িত করেছেন। মধ্যবিত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা ও স্বার্থপরতা, তারা সব সময় সর্বসাধারণের কথা না ভাবে শুধু মাত্র নিজেদের কথাই ভাবে। তাইতো তসলিম যখন ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তখন তার মা পরিবারের কথা চিন্তা করে বলেছেন : 'তোর মা বাবা ভাই বোনগুলোর কথা ভেবেও কি তুই ও সব ক্ষান্ত দিতে পারিস না? চাকরিটা চলে গেলে আমরা খাবো কি?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ১৫৮)। এভাবে অতি অল্প পরিসরে হলেও মধ্যবিত্ত মানসিক দিক ফুটিয়ে তুলেছেন।

জহির রায়হান মূলত আশাবাদী পুরুষ ছিলেন। তাই নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি আশাবাদী ছিলেন। পাঠকদেরও আশার বাণী শুনিয়েছেন। দেশের বিপর্যয়ের প্রান্তে দাঁড়িয়েও তিনি স্বচ্ছ ভবিষ্যতের কথা ভেবেছেন, সুন্দর আগামীকে আহবান করেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও আশাব্যঞ্জক উক্তি রয়েছে। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে প্রতিনিয়ত শাসক শ্রেণির প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে ভাষা সংগ্রামী সৈনিকরা, নানাভাবে লাঞ্ছিত বঞ্চিত হয়েছে। তবু তাঁদের সংগ্রাম শেষ হয়নি, স্তনমিত হয়নি আন্দোলন স্পৃহা। যেখানেই বাঁধা সেখানেই দ্বিগুণ ইচ্ছাশক্তি নিয়ে তাঁরা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছেন। তাঁরা সফল হয়েছেন তাঁদের যুদ্ধে। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা মাতৃভাষা পেয়েছি আর নতুন স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। লেখক ভাষা আন্দোলনের এই সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে তাঁর উপন্যাসের শেষ প্রতীকী রঙে প্রকাশ করেছে। তাঁর মতে বায়ান্নর একুশ তারিখ শুধুমাত্র একটি তারিখ নয় একটি যুগের টার্নিং পয়েন্ট। জাতীয় জীবন এমনকি সাহিত্য জীবনেও এর প্রভাব বিস্তৃত। তাইতো ভাষা শহীদদের স্মরণ করতে প্রতি বছর আমরা ভাষা দিবস পালন করি। আজকের এই স্মরণের কথা লেখক আরো ছয়চল্লিশ বছর পূর্বে উল্লেখ করেছেন এ উপন্যাসের সমাপ্তিতে :

> নগ্ন পায়ে এগিয়ে চলেছে শহীদ মিনারের দিকে।
> মানুষগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে সামনে। ইউক্যালিপ্যাসের
> পাতা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে নিচে। মাটিতে। ঝরে প্রতি বছর ঝরে।
> তবু ফুরায় না।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৭৬)

এভাবে ঔপন্যাসিক তার হৃদয়ের আশাবাদ ও আবেগের অফুরন্ত অনুষঙ্গ উপন্যাটিতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ উপন্যাস সম্পর্কে শাহরিয়ার কবির বলেন, 'কৃষক শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের আবেগ ও অংশগ্রহণের বিষয়টি তাঁর এই লেখায় রয়েছে।...একুশে ফেব্রুয়ারীর কাহিনী রাজনীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও জহির রায়হানের অপরাপর গল্প উপন্যাসের মতো মানবিক উপাদান ও হার্দিক সম্পর্ক এতে অনুপস্থিত নয়। ফলে রাজনৈতিক হওয়া সত্ত্বেও এটি ত্বত্তগন্ধী বা শ্লোগানাক্রান্ত নয়। বর্ণনায় বরং বাহ্যিক ব্যঞ্জন রয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫০)। তাছাড়া, 'কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করলে এ কাহিনী ঊনসত্তরের কিংবা তিরাশি চুরাশির অথবা আগামী দিনের যে কোন আন্দোলনের হতে পারে। শাসকের ভাষা শোষকের ভাষা এবং আচরণ এতটুকু বদলায়নি। এ কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারী মহৎ সৃষ্টির দাবী করতে পারে এর আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বে-ও।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫০)। অন্যদিকে আরো এক সমালোচক বলেন, 'ভাষা সংগ্রামে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও শৈল্পিক লক্ষ্য এ প্রতীকী অনুষঙ্গে হয়েছে স্পষ্টতর অনুভূতি গ্রাহ্যও। একুশে ফেব্রুয়ারী উপন্যাসে এ প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিক যেন অতিক্রম করেছেন নিজের শক্তি কেন্দ্রকেও।' (আরজুমন্দ আরা বানু ২০০৮ : ৩০৬)

প্রকরণের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় সর্বদা স্বতন্ত্র ছিলেন। যেহেতু তিনি চলচ্চিত্রকার সেহেতু তাঁর গল্প বা উপন্যাসে চলচ্চিত্রের ঢঙ উপস্থিত। বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ রচনাগুলির অধিকাংশ চিত্রনাট্যধর্মী। এই উপন্যাসটি তাঁর

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে লিখিত হওয়ায় এখানেও চলচ্চিত্রের গঠনরীতি বর্তমান। সংলাপগুলি ও ছোট ছোট দৃশ্য বর্ণনায় চিত্রনাট্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি এমন :

কতগুলো মুখ।

মিছিলের মুখ।

রোদে পোড়া।

ঘামে ভেজা।

শপথের কঠিন উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫১)

এমন চিত্রকল্প রচনা একজন ছবি পরিচালকের দ্বারাই সম্ভব। এছাড়া তিনি ছিলেন প্রবল আবেগধর্মী পুরুষ। যা তাঁর রচনায় প্রত্যক্ষিত। আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি কাব্যিক ছন্দই ব্যবহার করেছেন। যেন একনাগাড়ে অনেক পড়লেও পাঠক চিত্তে বিরক্তিভাব আসে না। তাঁর কাব্যময় ভাষা এমন :

কিন্তু এই নিষ্ঠুর হৃদয়ে কোমল ক্ষত ছিলো।

সামলাকে ওর খালাতো বোন।

একই বাড়িতে থাকতো।

উঠতো বসতো চলতো।

তবু মনে হতো সালমা যেন অনেক অনেক দূরের মানুষ। তসলিমের হৃদয়ের সেই কোমল ক্ষতটির কোন খোঁজ রাখতোনা সে। কিংবা রাখতে চাইতো না।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৫৩)

উপমা, প্রতীক ও চিত্রকল্প ব্যবহারেও তিনি কর্পণ্য করেননি। কবিতায় যেমন গদ্যের তুলনায় অধিক অলঙ্কার মণ্ডিত হয় লেখক উপন্যাস লিখতে গিয়েও কবিতার সেই অলঙ্করকে গদ্যের ভাষায় ব্যঞ্জনাময় করেছেন। তাঁর অলঙ্কার ব্যবহারের দক্ষতা এমন :

- মাতব্বররা ঘাড় নোয়ালেন। নামাজে, সেজদা দেয়ার মতো। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৬১)
- পুবে আকাশ সবে ধলপ্রহর দিয়েছে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৬৫)
- পলাশের ডালে সোনালি রোদ লাল রং মেখে নুয়ে পড়েছে, পথের দু'পাশে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৭২)
- কিছু বলতে গিয়ে মনে হলে জিহ্বাটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। (জহির ২০১৩: ৪৭৫)
- সূতোর মতো কত লহরা পানি বালির উপর দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে। (জহির, ২০১৩: ৪৭৬)
- সমুদ্রের মতো জনতা। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৭৫)
- মানুষগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে সামনে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৭৫)

- ইউক্যালিপাসের পাতা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে নিচে। মাটিতে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৭৫)

মূলত জহির রায়হানের 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সৃষ্টিকর্মটিকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না বলে অণু উপন্যাস বলা যেতে পারে। উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য এখানে উপস্থিত, তবে ক্ষুদ্র কলেবরে। এখানে বিস্তৃত ঘটনার অনেক দৃষ্টিকোণ ছিল, ছিল কাহিনী ব্যঞ্জনার ব্যাপক দোলাচল আর চরিত্রগুলির গভীর পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র। তবে লেখক সেসব দিকে নজর দেন নি। তাঁর একটি মাত্র লক্ষ ভাষা সংগ্রামের বিচিত্র চেতনার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা। তৎকালীন আন্দোলনরত ও সময়ের অধিবাসীদের মানস পটে একুশের ধ্যান ধারণা কেমন ছিল তার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব তুলে ধরা। এ কারণেই তিনি চারটি পরিবারকে একত্রে করে তাদের প্রতিক্রিয়া অবিকল রূপে অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসটিতে ঘটনার ব্যাপকতা নাই, আছে স্বচ্ছতা, নাই চরিত্রের জটিলতা, রয়েছে বাস্তবিক মাধুর্যতা। ঘটনার অতি ব্যঞ্জনা নাই, আছে সত্য ঘটনার প্রতিচ্ছবি। এক্ষেত্রে তাঁর রচনাটি একুশের আন্দোলনের স্বতন্ত্র ও বাস্তবিক দলিল। জীবনকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জটিল কঠিনভাবে বর্ণনা জহির রায়হানের সৃজনশীল আচরণের বহির্ভূত। তাই ঘটনার ব্যাপকতা না দেখিয়ে জীবনের সার্বিক বাস্তবতাকে অতি স্বচ্ছ ও স্বল্প পরিসরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করেই উপস্থাপন করেছেন এই অণু উপন্যাসটিতে। যেন তাঁর বাস্তবিক অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল সাক্ষ্যবাহক জীবনের সঞ্চিত অনুভূতির আবেগঘন উপস্থাপন।

ঘটনা বর্ণনা যেমন বৈচিত্রের সন্নিবেশ নাই, তেমনি আঙ্গিকগত দিক থেকে তার বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে গিয়ে সাদা-সিদে ভাবে উপস্থাপন করেছেন। রচনাটি যেন একটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের অনুলিপি। তাই অলঙ্কারে অধিক্য নাই, নাই প্রকাশভঙ্গির অতি ব্যঞ্জকতা। শুধুমাত্র ঘটনা বর্ণনায় যতটা অলঙ্কার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় ঠিক ততটাই তুলে ধরেছে উপন্যাসে।

বর্ণনার প্রান্ত দ্বারে এসে বলা যায় জহির রায়হানের 'একুশে ফেব্রুয়ারী' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস বটে। শুধু মাত্র বায়ান্ন সালের একুশ তারিখ ও তার আগের দিনের ঢাকা শহরের সার্বিক পরিস্থিতি অতি সংক্ষেপে বিশ্বস্তভাবে বাণী ব্যঞ্জন করেছেন এখানে। তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই প্রতিরূপ এটি। রাজনৈতিক ক্ষুদ্র উপন্যাস হওয়ায় জীবনে অন্যান্য অনুষঙ্গ প্রায় অনুপস্থিতই রয়ে গেছে। তবে এখানে একুশের ঘটনা বর্ণনায় তিনি ছিলেন নির্ল্লিত, নিরপেক্ষ। তাই বলা যায় উপন্যাসটি একদিকে ঔপন্যাসিকের দেশাত্ববোধের আবেগী উপস্থাপন অন্যদিকে পরবর্তী প্রজন্মে একুশ চেতনা জাগরণের মন্ত্রধ্বনি।

তৃতীয় অধ্যায়

ছোটগল্প : জীবনপ্রকৃতি ও প্রকরণরীতি

ছোটগল্প

জহির রায়হানের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' (১৯৫৫)। পরে এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুচ্ছ ও তাঁর অন্যান্য গল্প রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে। তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা রয়েছে মোট ২১টি। 'সূর্যগ্রহণ' গ্রন্থের গল্পসমষ্টি এবং পরবর্তীকালে রচিত গল্পসমূহে মুখ্য হয়ে উঠেছে আবহমান বাংলার শাশ্বত রূপ, পূর্ববাংলার ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রাম। 'ধর্মের নামে ভণ্ডামি, প্রতারণা ও ধর্ম ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক শোষণ, সুবিধাবাদ ও হৃদয়হীনতার স্বরূপ চিত্রণে জহির রায়হান বাস্তব শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।' (চঞ্চল কুমার বোস ২০০৮ : ১০৫)। তাঁর ছোটগল্পে একদিকে ফুটে উঠেছে গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ অন্যদিকে প্রকাশ করেছেন সমকালীন রাজনীতির বহুমুখী চেতনা। নিম্নে তাঁর ছোটগল্পের তালিকা দেওয়া হল :

ছোটগল্পের	**প্রেক্ষাপট**
১. সোনার হরিণ	আর্থ-সামাজিক
২. সময়ের প্রয়োজনে	মুক্তিযুদ্ধ
৩. একটি জিজ্ঞাসা	ধর্মীয়
৪. হারানো বলয়	আর্থ-সামাজিক
৫. বাঁধ	আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয়
৬. সূর্যগ্রহণ	ভাষা আন্দোলন
৭. নয়া পত্তন	আর্থ-সামাজিক
৮. মহামৃত্যু	ভাষা আন্দোলন
৯. ভাঙ্গাচোরা	আর্থ-সামাজিক
১০. অপরাধ	ধর্মীয়
১১. স্বীকৃতি	আধুনিকতা
১২. অতি পরিচিত	ভাষা আন্দোলন
১৩. ইচ্ছা অনিচ্ছা	আর্থ-সামাজিক
১৪. জন্মান্তর	মানবিকতা
১৫. পোস্টার	প্রতিবাদ
১৬. ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি	প্রতিবাদ
১৭. কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ	প্রতিবাদ
১৮. কয়েকটি সংলাপ	ভাষা আন্দোলন
১৯. দেমাক	আর্থ-সামাজিক

২০. ম্যাসাকার রাজনীতি

২১. একুশের গল্প ভাষা আন্দোলন

এখন এসব গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য ও প্রকরণকৌশল আলোচনা করা যাক।

জহির রায়হানের ছোটগল্পের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে শহুরে জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'হারানো বলয়'। কলেজ জীবনে লেখা গল্পটি। এ গল্পেই তাঁকে একজন প্রকৃত সমাজসচেতন লেখক হিসেবে দেখা যায়। লেখক যখন এ গল্পটি রচনা করেছেন তখন সমাজে বিরাজ করছে অস্থিরতা, অনাচার। শহুরে জীবনের এই সংকটকে আবেগী বাণীবিন্যাসে চিত্রিত করেছেন এ গল্পে। গল্পের নায়ক আলম আর নায়িকা আরজু। কলেজ জীবনে তাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তবে সমাজ ও অভাব তাদের মিলিত হতে দেয়নি। তারা স্বপ্ন দেখেছিল বিয়ে করবে, সুন্দর ফুটফুটে ছেলেকে নিয়ে ছোট্ট সংসার গড়বে। কিন্তু যে স্বপ্ন অধরা রয়ে যায়। আলম কেরানীর চাকুরি করে সংসার চালায়। আর আরজু বাবাহীন সংসারের বেহাল দশা দেখে দিশাহারা। আলম জিজ্ঞাসা করলে আরজুর জীবন সংকট এভাবে বর্ণনা করে :

> মাটির দিকে চুপ করে চেয়ে রইলো আরজু। কি যেন ভাবলো। তারপর এক সময় মুখ তুললো আলমের দিকে, কেন কাঁপছি জানো? দুটো দিন, এক মুঠো ভাতও খেতে পাইনি আমি, শুধু আমি নই– আমার ছোট ছোট ভাইবোন, আমার বুড়ো মা কেউ খায়নি। সবাই উপোস। নির্জন রাস্তায় ছোট্ট শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো আরজু।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯৭)

এই অভাবই তাকে একদিন বিপথে নিয়ে যায়। সামান্য কেরানী হওয়ায় আলমও তাকে সাহায্য করতে পারেনি। আরজুর এমন পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র আর্থিক দৈন্যতার কারণে তাদের ভালোবাসা প্রখর হয়ে উঠেনি। আরজু সমাজের চোখে অপরাধী হয়। আপত্তিকর প্রচার পত্র বিলি করার অপরাধে তার হাতে হাত কড়া পরায় পুলিশ। অন্যদিকে মাস শেষে বেতনের টাকা হাতে আলমের বাস্তবিক সংকটময় জীবনকেও অনুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

> নতুন মাস। বকেয়া মাসের পাওনা টাকাগুলো হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে এলো আলম। আজকের মধ্যেই শেষ হবে এগুলো– দেনা পরিশোধ করতে করতে বাড়িতে মায়ের কাপড় নেই লিখেছেন। ওঁর জন্য কাপড় কিনতে হবে একখানা। ছোট ভাইবোনগুলোর জন্য কয়েকটা প্যান্ট। বারো বছরের আফিয়াটার জন্য একটা কাপড় না পাঠালেই নয়। মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠল আলমের। টাকা হাতে নিয়েও বেশ ঘামিয়ে উঠছে সে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯৭)

এভাবে তিনি এদেশের নাগরিক সংকটকে দেখিয়েছে বাস্তব পটভূমিকায়।

পরবর্তী গল্প 'নয়াপত্তন' এ গ্রামীণ প্রক্ষাপটে পীর প্রথার অন্তঃসার শূণ্যতা বর্ণনা করলেও লেখক এক ফাঁকে শহুরে বিত্তবান সুবিধাভোগীদের সামান্য পরিচয় দিয়েছেন। শহরের শাসক শ্রেণি বিশেষ করে বিত্তবানেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি

ও প্রশংসা কুড়োতেই বেশি ব্যস্ত। তারা ক্ষমতায় থেকেও গ্রামীণ উন্নয়ন নিয়ে একটি বারও ভাবেনা। তাইতো গনু পুণ্ডিত গ্রামের স্কুলের সাহায্যের জন্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের আমলাদের দ্বারস্থ হলে শমসের খানের বক্তব্য এমন :

> রাজধানীতে দুটো নতুন হোটেল তুলে, আর সাহেবদেও ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইংলিশ স্কুল দিতে গিয়ে প্রায় কুড়ি লাখ টাকার মতো খরচ। ফান্ডে এখন আধলা পয়সা নেই সাহেব। অযথা বারবার এসে জ্বালাতন করবেন না আমাদের। পকেটে যদি না থাকে, স্কুল বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকুন।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫১০)

'ভাঙাচোরা' গল্পেও লেখক নগর জীবনের সংকটকে বিধৃত করেছেন। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের ছোঁয়া লেগেছে এ গল্পের গায়ে। তৎকালীণ সমাজ চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক এক রোমান্টিক দম্পতির দেশ বিভাগ পূর্ব ও বিভাগ উত্তর জীবন সংগ্রামকে লিপিবদ্ধ করেছেন। দেশ ভাগের আগে কলকাতায় তারা স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার ছিল, কিন্তু দেশান্তর হয়ে ঢাকায় এসে তাদের বিপন্ন জীবনের চালচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন অতি নিপুণভাবে। সংসার চালাতে হিমশিম খাওয়া দম্পতির টুনু করে ঝিয়ের কাজ আর তার স্বামী করে কুলিগিরি। তবে কেউ কারোর ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করতে চায় না। তাদের কর্মের কথা কেউ কাউকে জানায় না। লেখক নগর জীবনের মধ্যবিত্তের মানসিক অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে। টুনু সালামকে স্বামীর সম্পর্কে বলেছে : 'পিয়নের কাজ করলে কী হবে। লোকটার প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে খবরদার। আমি যে মেসের ভাত পাক করে দিই, ঘুনাক্ষরেও এ কথাটা বলো না ওকে। তাহলে রেগে আগুন হয়ে যাবে। টুনুর কণ্ঠে অনুবোধের সুর।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫২৫)। এভাবে লেখক মধ্যবিত্তের মানসিক সংকটকে রূপায়িত করেছেন গল্পটিতে।

'স্বীকৃতি' গল্পটিও সমাজ সচেতন লেখকের অনন্য সংযোজনা। এদেশে পূর্বের সংস্কৃতি দিনে দিনে পরিবর্তিত হয়। গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিবর্তে সংযোজিত হয় শহরে সংস্কৃতি, শাষণের পরিবর্তে প্রতিবাদের সংস্কৃতি। ঘরে আবদ্ধ থাকা মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা বেরিয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষের কাতারে। আর এই পরিবর্তনকেই স্বীকৃতি জানানোর বাসনা ব্যক্ত হয়েছে এ গল্পে। নতুন জীবন ভাবনা ও সংকটকে আহবান জানিয়েছেন বা মেনে নিতে সাহস দেখিয়েছে মনোয়ারা। তার মেয়ে হাসিনা যখন ছেলেদের মিটিং শুনতে আরমানিটোলায় যেতে চায় তখন প্রথমে অবাক হলেও তাকে যেতে দেয়। এভাবেই নতুন সময় ও শহুরে সমাজকে স্বীকৃতি জানায় সে। লেখকের ভাষায় : 'না, না, সে স্বীকার করবে একে– এই পরিবর্তনকে, এই বিপ্লবী ঝড়ো হাওয়াকে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৩৭)

জহির রায়হান রচিত আর একটি গল্প 'অতি পরিচিতি'। এখানে শহুরে সমাজের বিত্তবান ও ছা-পোষা মানুষের জীবনকে সমান্তরালভাবে সৃষ্টি করেছেন। অন্তঃসারশূণ্য বিত্তবানেরা জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে সারা জীবন। নিজেদের মূঢ়তাকে সমাজের চোখে বার বার উন্মোচন করে যেমন করেছে ট্রলির বাবা যে শীঘ্রই সেন্ট্রাল এজুকেশন বিভাগের কর্মকর্তা হয়ে বদলি হচ্ছে। তার বাড়িতে মস্ত বড় এক গ্রন্থাগার অথচ গীতাঞ্জলিকে মিল্টনের উপন্যাস বলে নিজের অজ্ঞতাকে হাস্যকর করে উপস্থাপন করেছে। অথচ বিত্তের দাম্ভিকতা তাকে শূন্যে ভাসিয়ে রেখেছে। আসলামকে সে

বলেছে : 'জানো আসলাম এই গাড়ি বাড়ি আর ধন দৌলত দেখছ, এসব কিন্তু স্রেফ ব্রেইন দিয়ে আমার করা।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৩৮)

এমন সংলাপের মধ্য দিয়ে লেখক শহরের বাস্তব জ্ঞানহীন ধনিক শ্রেণির মানসিক প্রেক্ষাপটকে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে আসলামকে সেই শ্রেণির পরিপূরক করে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সমাজে চলমান পরিস্থিতি ও বিত্তবানদের দাম্ভিকতাকে সমর্থন করে না কিন্তু প্রতিবাদও করে না। লেখক তার মধ্যে ঠিক-বেঠিক দুয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'জন্মান্তর' গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত ঢাকা শহরের কাহিনী। গল্পের নায়ক মন্তু। কৃষিভিত্তিক স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান সে, বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল তাকে নিয়ে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষ শুরু হলে সে শহরে পাড়ি জমায়। কাজ নেয় পকেটমারের। একদিন পকেট মারতে গিয়ে টাকার বদলে পায় একটি সোনার আংটি। স্বপ্ন দেখে পরীবানুকে বিয়ে করবে এই আংটি দিয়ে। পরে একদিন রাতে আংটি পকেটে নিয়েই তার কাজে বের হয়। পথে অনেক বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় সেক্রেটারিয়েদের এলডি ক্লার্কে রাতে পত্রিকা অফিসে কাজ করা একটি লোকের সঙ্গে দেখা হয়, মন্তুকে সে বাড়ি নিয়ে যায়। তার জীবন বৃত্তান্ত শুনে মন্তুর মানবিকতাবোধ জাগ্রহ হয়। ও গভীর রাতে তার মূল্যবান আংটিটি লোকটির শার্টের বুক পকেটে রেখে নীরবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এটাই তার জন্মন্তর। বর্ণিত রয়েছে :

> তারপর আস্তে আংটিটা ছেড়ে দিল, দেয়ালে ঝোলানো শার্টের বুকপকেটে! খস্ করে একটা শব্দ হল সেখানে। তাও কান পেতে শুনল। তারপর একটা স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল সে।
>
> বৃষ্টিটা তখন থেমে গেছে। আর রাহুমুক্ত চাঁদ খলখলিয়ে হাসছে আকাশে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৫৩)

এখাবে লেখক দেখিয়েছেন যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ মন্তুর স্বর্বস্ব নিয়ে নিলেও অমানুষ করতে পারেনি।

'পোস্টার' গল্পটি লেখকের প্রতিবাদমূলক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। তাতে ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে শহরে বসবাসরত এক অফিসের ছা-পোষা কর্মকর্তার জীবন সংগ্রাম ফুটিয়ে তুলেছেন। তিন ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে বড় সংসার চালানো তার জন্য কষ্টসাধ্য। মাঝে মাঝে তিনি সকালের নাস্তা না করেই অফিস যান। বর্ণিত আছে : 'শুধু আজ বলে নয়। বছরে বারো মাসে তিন মাস না খেয়েই অফিস করেন আমজাদ সাহেব। কোনো কোনো দিন পেটের অবস্থা বেশি কাহিল হয়ে পড়লে, মোড়ে বিহারীদের সস্তা হোটেলটায় ঢুকে গোটা দুয়েক ডালপুরী আর কয়েক গ্লাস পানি খেয়ে অফিসে যান তিনি।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৫৬)। শেষ পর্যন্ত জীবনের একমাত্র অবলম্বন চাকরিটাও চলে যায় তার। লেখক এমন ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে শহরের ক্রুর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

তাঁর আর একটি গল্প 'দেমাক'। শহরের শ্রমজীবি মানুষের জীবন কাহিনী এটি। বাসের ড্রাইভার রহিম শেখ পরিশ্রমী ও আত্ম নির্ভরশীল। সে কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাব জমায় না। কাজ শেষে নিজের ঘরেই সময় কাটায়। যেটা তার প্রতিবেশীদের কাছে অহংকার বা দেমাক মনে হয়। কিন্তু রহিম শেখ সে বিষয় নিয়ে ভ্রুক্ষেপও করে না। এটাকেই লেখক দেমাক বলে আখ্যা দিয়েছেন। লেখকের ভাষায় তার বৈশিষ্ট্য এমন : 'কাজ তার গর্ব। কাজ করেই খায় সে। পরের কাছে হাত পাতে না। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না। কিংবা তাদের ওই বাসের মালিকটার মতো পুঁজি খাটিয়ে বসে বসে মুনাফা লুটে না। কাজ করেই খায় সে। কাজ তার গর্ব।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৬৯)

অন্যদিকে লেখক এ গল্পে বিপরীতধর্মী আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। নাম তার রহমান। সে অলস প্রকৃতির। হাত গনণা করে অন্যকে প্রতারণা করে সংসার চালায়। এই দুই পেশার প্রকৃতি বর্ণনা করে লেখক সমাজের বিশেষ করে শহরের নানা শ্রেণি-পেশা ও মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের জীবন বর্ণনা করেছেন।

শহুরে মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়ণের অন্যতম উদাহরণ জহির রায়হানের 'সোনার হরিণ' গল্পটি। নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়ে শুরু করলেও লেখক এখানে দেখিয়েছেন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার তাদের বিলাসী মনের খোরাক যোগাতে কতটা অসহায়। সামান্য একটু ঘর সাজানোর ফার্নিচার কিনতেও তারা দশ বছর কাটিয়ে দেয় কিন্তু তাদের বাসনা পূর্ণ হয়না। ফার্নিচারে দোকানের কর্মচারী গল্পের কথক। দশ বছর পূর্বের এক ক্রেতাকে দশ বছর পরে দেখে অবাক হয় এবং তার সম্পর্কে বলে :

> এ ক বছরে রীতিমতো বুড়ো হয়ে গেছে লোকটা। মুখখানা ভেঙে গেছে, কানের গোড়ায় কিছু চুল সাদা। গায়ের জামা-কাপড়গুলো ময়লা। দোকানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনেকটা কান্নার মতো সুরে সে বলছে, আমাদের অনেক গুলো ফার্নিচার দরকার, বুঝলেন? মানে পুরো একটা ঘর সাজাতে যা লাগে। যেমন ধরুন একটা সুন্দর ড্রেসিং টেবিল, একখানা মজবুত খাট তাছাড়া বুঝলেন কিনা, একটা আরাম-কেদারার বড় শখ আমার। কী সুন্দর হাত পা ছড়িয়ে বসা যায়, তাই না?
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৮১)

গল্পের পরিণতির তাৎপর্য দেখে বোঝা যায়, একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার কতটুকু অসহায় সামান্য একটু ঘর সাজানোর ফার্নিচার কেনা বা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও। এমন বর্ণনার মাধ্যমে লেখক মধ্যবিত্ত মানুষের অক্ষমতা যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি শহরে জীবনের বিলাসীতাকে উল্লেখ করেছেন। মূলত সদ্য জন্ম নেয় তাঁর সময়কার নগর কেন্দ্রিকতার প্রতিটি দিককে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন এ সব গল্পের মধ্য দিয়ে।

ক্ষণজন্মা পুরুষ জহির রায়হান অতি অল্পকালই সাহিত্য ভুবনে পদচারণা করেছেন। তবে তাঁর সৃষ্টি ভাণ্ডার অপ্রতুল নয়। অল্প বিস্তর সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই নিজেস্ব আদর্শের দ্যুতি ছড়িয়েছেন। অন্যান্য সৃজনকর্মের মতো ছোটগল্পেও তার প্রমাণ রয়েছে। সারা জীবনে মাত্র একুশটি গল্প রচনা করেছেন। তবে এই সামান্য সংখ্যক গল্পেই তাঁর চেতনার

তেজস্ক্রিয়তার পরিচয় মেলে। আত্মনিমগ্ন থেকে নয় চোখ-কান খোলা রেখে পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ বিচার বিশ্লেষণ করেই এসব গল্পে তার প্রতিটি পদক্ষেপ পড়েছে। তিনি খোলা চোখে জীবনকে দেখেছেন এবং জীবনের অবিকল রূপটি বিধৃত করেছেন ছোটগল্পে। গল্পগুলি হয়তো বেশি প্রশস্ত নয়, হয়তো গভীর ব্যঞ্জনার স্ফুলিঙ্গ সেখানে নাই। মেকিত্ব আর কাল্পনিক স্বপ্ন বাসরে পরিপূর্ণ নয় গল্পগুলি বরং তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্ভেজাল নির্যাস পরিলক্ষিত হয় এখানে। পাঠককে যতটুকু বোঝাতে চেয়েছেন ঠিক ততটুকুই বর্ণনা দিয়েছেন গল্পভূমিতে। নাটকীয় জটিলতা দিয়ে পূর্ণ নয় এসব গল্প। আর শহুরে বাসীন্দা হওয়ার তাঁর গল্পগুলির একটি বিশেষ অঙ্গ জুড়ে রয়েছে নগরে হাল-চাল, জীবন-যাত্রা ও মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্বের সমারোহ। লেখক সমকালীন সমাজ ভাবনাকে আত্মস্থ করে অতি বিশ্বস্ততার সাথে বিবরণ দিয়েছেন তাঁর গল্পে। অধিকাংশ গল্পই তাই নগরকেন্দ্রিক। নগরের পথ ঘাট, নগরের মানুষ, তাদের মনের বিচিত্র ভাবনা, সব কিছুই ফুটে উঠেছে এই সব গল্পে। মোটকথা শহুরে জীবনের বিচিত্র সংকট তাঁর গল্পে একাকার হয়ে আছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ভাষা সংগ্রামের উত্তাল সমুদ্রে জহির রায়হানও ছিলেন অগ্রজ সৈনিক। স্ব-শরীরে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় তাঁর জীবনে সেটি গভীর প্রভাব ফেলেছে। জীবনের সাথে সাথে তাঁর সৃষ্টিকর্মেও ফুটে উঠেছে ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। একুশের চেতনা যে কতটা নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষিত হয়েছিল জীবনে তা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন শুধু এদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নতুন চেতনা প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। এই চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্জাত। আমাদের শিল্প সাহিত্যে যাঁরা এই চেতনার ফসল, তাঁদের ভেতর জহির রায়হানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ভাষা আন্দোলনে তিনি শুধু যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তা নয়, তাঁর সাহিত্য প্রেরণার মূল উৎস ছিল এই আন্দোলন। 'ভাষা আন্দোলনের উপর প্রথম সার্থক উপন্যাস- 'আরেক ফাল্গুন' সহ অজস্র ছোটগল্প ও নিবন্ধ লিখেছেন তিনি। এইসব লেখা এবং তাঁর রাজনৈতিক অঙ্গীকার থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনের আবেগ, অনুভূতি তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আপ্লুত করে রেখেছিলো।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৩৯) । মোটকথা আন্দোলনটি জহির রায়হানের আত্মার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। '১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের মধ্যে যে প্রতিবাদী চেতনা, ফ্যাসিবাদ বিরোধী চেতনা এবং শ্রেণী চেতনা ছিলো তা জহির রায়হানের গল্পেও প্রতিভাসিত হয়েছে। তিনি গল্পগুলোতে যে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ, সুবিধাবাদী, হৃদয়হীন পাষাণ্ডের এবং বেবেকহীন নিষ্ঠুরতার চিত্র এঁকেছেন তা ভাষা আন্দোলনের অন্তস্রোত থেকে এসেছে।' (মাহমুদুল বাসার ২০১১ : ১৯)। জহির রায়হান মোট পাঁচটি গল্পে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় পটচিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। গল্পগুলো হল- 'সূর্যগ্রহণ', 'মহামৃত্যু', 'অতিপরিচিত', 'একুশের গল্প' ও 'কয়েকটি সংলাপ'।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম গল্প 'সূর্যগ্রহণ'। সমকালীন কথাসাহিত্যে জহির রায়হানই একমাত্র শিল্প যাঁর লেখনীতে একাধিকবার ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ফুটে উঠেছে। গল্পটির কথক আনোয়ার তারই মেসমেট তসলিমের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছে এখানে। ভাষা আন্দোলনের সময় বাইশে ফেব্রুয়ারি হাই কোর্টের মোড়ে গুলি খেয়ে মারা গিয়েছে তসলিম। ভাষার প্রতি এদেশের মানুষরে গভীর টানকেই তসলিমের চরিত্রে ফুটে উঠেছে। ভাষা সম্পর্কে তার মন্তব্য এমন : 'আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখব কী দিয়ে? বলে বেরিয়ে গেছে সে। সেদিন আর ফেরে নি।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫০৯)

তসলিম গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলো এক অস্বচ্ছল নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি হয়ে। থাকতো এক মেসে। কবিতা লিখতো, কল্পনাপ্রবণ ছিল। বাড়িতে তার স্ত্রী, বিয়ে যোগ্য বোন, বৃদ্ধা মা ও ছোট আদরের মেয়ে ছিল। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হলেও তার মধ্যে দেশপ্রেম অক্ষুন্ন ছিল। ভাষা নিয়ে সংগ্রাম শুরু হলে সে তার ক্ষুদ্রপ্রচেষ্টা দিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। সেদিকটি লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। বর্ণিত আছে : 'একুশের সারারাত এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি সে। বসে বসে পোষ্টার লিখেছে, অসংখ্য পোষ্টার।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫০৮)। দেশপ্রেমের গভীর চেতনা সাংসারিক নানা জটিলতার মধ্য দিয়েও অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে।

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক আর একটি গল্প 'মহামৃত্যু'। ভাষা একটি জাতির আবেগের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশ্রিত শব্দ। লেখক সরল ভাষায় সেই চেতনাকে পাঠক মনে সঞ্চারিত করেছেন। ভাষা আন্দোলনে শহীদ হওয়া একজন যোদ্ধাকে নিয়ে লেখা গল্প এটি। যদিও তার বক্তব্য অনুপস্থিত গল্পটিতে। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেই ঘটনা ঘটেছে। গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল একটি তরতাজা জোয়ান ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে বলে। ঢাকার বস্তিতে থাকতো। ২১ ফেব্রুয়ারির দিনে লাশ হয়ে ফিরেছে। এই লাশ ঘিরে বস্তিবাসির আকর্ষণের শেষ নেই। যেন দেবদূত দর্শন করছে। গরীব, নিঃস্ব, খেটে খাওয়া মজুর, কামার, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সমবেত হয়েছে এই শহীদের লাশকে ঘিরে। বর্ণিত রয়েছে : 'বাহাত্তর গেরস্তের বাড়িতে কত লোক আসে, কত লোক যায়। কে কার খোঁজ রাখে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সবসময়। কিন্তু আকস্মাৎ আজ সবাই এক অদভূত একাত্মতা অনুভব করল ওই ছেলেটার সাথে। বেদনার্থ চোখ তুলে সবাই তাকাল ওর দিকে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫১৮)

শুধু তাই নয় শহীদের লাশটি স্পর্শ করতে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। যুবতীরা গলার হার ওর পায়ে পরিয়ে দিয়েছে। ওর পায় চুম্বন করে। পরম যত্নে গোসল করায়, চাঁদা তুলে সবচেয়ে দামী কাপড় কিনে মরদেহটি আচ্ছাদিত করে। লাশ বহনের জন্য একটি মিছিল বের হয়। আর শহীদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে পতাকা তৈরি করে। অনেকে আবার তার মতো মৃত্যুবরণের আশা পোষণ করে। শহীদ ছেলেটিকে নিয়ে বস্তিবাসির এমন আপ্লুত হওয়ার দৃশ্য লেখক এভাবে বর্ণনা করেছন :

ভোরে গরম পানিতে ওর লাশটাকে ধুইয়ে যখন ঘাটের ওপর শোয়ানো হলে, তখন সারা উঠোনটা গিজগিজ করছে লোকে।

পাড়ার ছেলেরা একটা লম্বা বাঁশের ডগায় পতাকার মতো ঝুলিয়ে নিয়েছে ওর রক্তে ভেজা জামাটা। ওটা ওরা বয়ে নেবে শবযাত্রার পুরোভাগে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫১৮)

বায়ান্নর আন্দোলনে আত্মদানকারীদের প্রতি সাধারণ মানুষের এমন আবগদীপ্ত ও ঐক্যবদ্ধ চেতনা বর্ণনার মাধ্যমে লেখক এই আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন।

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক আরেকটি গল্প 'অতি পরিচিত'। এটি একটি রূপকধর্মী গল্প। রূপকের মধ্য দিয়ে তৎকালীণ সময়ে গুটিকতক পাকিস্তানি মানসিকতার লোকের চেতনা তুলে ধরেছেন। এ গল্পের নায়ক আসলাম দেশপ্রেমিক। কিন্তু নায়িকার বাবা এদেশের বাসিন্দা হয়েও পাকিস্তানের তাবেদারি করেছে। তার চেতনার প্রকাশ ঘটেছে আসলামের সামনে। তার বক্তব্য এমন : 'এদেশের ছেলেমেয়েগুলো সব গোল্লায় গেছে। উচ্ছন্নে গেছে সব। নইলে ইসলামি ভাষা ছেড়ে দিয়ে ওই কুফুরি ভাষার জন্য এত মাতামাতি কেন?' (রায়হান জহির ২০১৩ : ৫৩৯)। নায়িকা ট্রলির বাবার এমন চেতনার কারণেই নায়ক নায়িকার মিলন হয়নি। লেখক রূপকের মধ্যদিয়ে এদেশে বসবাসকারী কিছু ভাষা আন্দোলনের বিরোধী বিশ্বাস ঘাতকদের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

জহির রায়হানের বাহুল পরিচিত সার্থক গল্প 'একুশের গল্প'। প্রতীকের মধ্য দিয়ে লেখক এখানেও ভাষা আন্দোলনের দৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পটিতে চার বছর পূর্বের ঘটনা অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। চার বছর আগে হাইকোর্টের মোড়ে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় তপু। তার লাশ আজিমপুর গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়। চার বছর পর সে কঙ্কাল হয়ে আবার রুমমেট বন্ধু রাহাতের ঘরে ফিরে আসে। এ লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনার সাথে সাথে তপুর দেশপ্রেমের দিকটি বিশ্বস্তভাবে লেখক উপস্থাপন করেছে। বৃহৎ স্বার্থ তথা দেশমাতা বা ভাষার জন্য লড়াইকে তপু তার বৃদ্ধা মা ও হবু স্ত্রী রেনুর চেয়েও মূল্য দিয়েছে। সব পিছুটান ভুলে একুশে ফেব্রুয়ারিতে সবার আগেই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। রাত জেগে পোস্টার তৈরি করেছে। তপুর আত্মত্যাগের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

আর তপুর হাতে ছিল একটি মস্ত প্ল্যাকার্ড, তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিল, রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছুতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগল চারপাশে । ব্যাপার কী বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি, প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৮৯)

এভাবে লেখক ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে শহীদদের আত্মত্যাগের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

'কয়েকটি সংলাপ' তাঁর আর একটি ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক ছোটগল্প। লেখক সব সময় দূরদর্শী ভাবনা নিয়ে সাহিত্য রচনা করতেন। তাইতো তাঁর রচনায় কেবল মাত্র ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ঘটনাই ফুটে উঠেনি এ আন্দোলনের পূর্ব ও পরবর্তী মানুষের প্রত্যাশাও দৃশ্যায়িত করেছেন। 'কয়েকটি সংলাপ' গল্পে লেখক আন্দোলন পরবর্তী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। বর্ণিত আছে :

> আগুন জালো।
> আবার আগুন জ্বালো।
> পুরো দেশটায় আগুন জ্বালিয়ে দাও।
> সাতকোটি লোক আছে।
> তার মধ্যে না হয় তিন কোটি মারা যাবে।
> বাকি চার কোটি সুখে থাকুক। শান্তিতে থাকুক।
> পুরো বছরটাকে শহীদ দিবস পালন করুন ওরা!
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৬৮)

যেহেতু জহির রায়হান রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই সমকালী রাজনৈতিক ঘটনা অল্প হলেও তাঁর লেখনী তে উঠে এসেছে। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনের মতো মুক্তিযুদ্ধেও সরাসরি অংশ নিয়েছেন। তবে তার অংশগ্রহণ কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। অস্ত্র হাতে নয় তাঁর হাতে ছিল কলম আর ক্যামেরা। মুক্তিযুদ্ধের অধিকাংশ সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন এবং এদেশের জন্য জনমত সংগ্রহ করেছেন রাত দিন । তবে তাঁর পথ চলা বেশি দূর এগুতে পারে নি। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরপরই তিনি শহীদ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন লেখক বাংলা কথাসাহিত্যে যে অবদান রাখতে পারতেন তা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। যুদ্ধচলার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি মাত্র গল্প লিখেছেন। গল্পটির নাম 'সময়ের প্রয়োজনে।' গল্পটি শুরু হয়েছে নাটকীয় ভঙ্গিতে :

> কিছুদিন আগে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম। ক্যাম্প-কমাণ্ডার ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মুহূর্তে আমার দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে, বললেন, আপনি বসুন। এই খাতাটা পড়ুন বসে বসে। আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই। তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ করব।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৮২)

ডায়েরিটি একজন মুক্তিযোদ্ধার। ডায়েরির মালিক মুক্তিযোদ্ধা আরেক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কথা, যে মারা গিয়েছে অসুখেই, তার পকেটে পাওয়া গিয়েছিল একটি চিঠি মাকে উদ্দেশ্য করে লেখা : 'একটু ও চিন্তা করো না, মা। আমি ভালো আছি।'(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৮২) যেহেতু জহির রায়হান মুক্তিযোদ্ধাদের কাছাকাছি থেকে তাঁদের সংগ্রাম

দেখেছেন তাই তাঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়েছেন। এ গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম তুলে ধরেছেন এভাবে :

> একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল। একসঙ্গে থেকেছি। শুয়েছি। খেয়েছি। ঘুমিয়েছি। এক টেবিলে বসে গল্প করেছি। প্রয়োজনবোধে ঝগড়া করেছি। ভালোবেসেছি। আজ তাদের দেখলে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে ওঠে। হাত নিশপিশ করে। পাগলের মতো গুলি ছুড়ি। মারার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠি। একজনকে মারতে পারলে উল্লাসে ফেটে পড়ি। ঘৃণার থুতু ছিটোই মৃতদেহের মুখে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৮২)

মুক্তিযুদ্ধের সময় অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছে পাকবাহিনীরা। ঔপন্যাসিক সেইসব অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা তুলে ধরেছেন এ গল্পটিতে : 'ছেলে নেই। স্বামী নেই। স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে। যুবতী মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। তিন মাস হলো। হালের গরু। গোলার ধান। গায়ের অলংকার কিছু নেই। সব লুট করেছে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৮৬)

যুদ্ধের সময় নানান যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের আপনজনের কথা মনে পড়ে বিশেষ করে মায়ের কথা। এ গল্পে আমরা মুক্তিযোদ্ধাটিকে দুইবার মায়ের স্মৃতিচারণ করতে দেখতে পাই। একবার নৌকার মধ্যে এক পতিতাকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়ে। আর একবার যখন যুদ্ধ করতে গিয়ে তার হাতে গুলি লাগে তখন। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মায়ের কথা মনে পড়ে। বর্ণিত আছে : 'মা কাছে থাকলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কাঁদত। বকুনি দিয়ে বলত। বাহাদুর। অত সামনে এগিয়ে গিয়েছিলি কেন? সবার পেছনে থাকতে পারলি না? আর অত বাহাদুরির দরকার নেই বাবা। ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরে চল।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯০)

মুক্তিযোদ্ধাদের এক এক জন যুদ্ধ করেছেন এক একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। গল্পকার তাদের নানা উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে :

> দেশের জন্যে। মাতৃভূমির জন্যে যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করছি দেশকে মুক্ত করার জন্যে।'
>
> কেউ বলেছিল, আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে লড়ছি। ওরা আমাদের মা-বোনদের কুকুর-বেড়ালের মতো মেরেছে, তাই। তার প্রতিশোধ নিতে চাই।
>
> কেউ বলেছিল, আমরা আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি।...
>
> কেউ বলেছিল, আমি অতশত বুঝি না মিয়ারা। আমি শেখ সাহেবের জন্যে লড়ছি।
>
> কেউ বলেছিল, কেন লড়ছি জান? দেশের মধ্যে যত গুণ্ডা-বদমাশ, ঠগ , দালাল, ইতর, মহাজন আর ধর্ম-ব্যবসায়ী আছে তাদের সবার পাছায় লাথি মারতে।
>
> হয়তো সুখের জন্যে। শান্তির জন্যে। নিজের কামনা-বাসনাগুলোকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্যে।

কিংবা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। অথবা সময়ের প্রয়োজনে। সময়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে লড়ছি আমরা।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯০)

জহির রায়হান ছিলেন আশাবাদী পুরুষ। তিনি তাঁর প্রতিটি লেখনীতে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন। এই গল্পেও লেখক তাঁর আশাবাদী চেতনা প্রকাশ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা একটি আশা নিয়েই যুদ্ধ করেছেন। গল্পকার তাঁর আশাটিকে মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। বর্ণিত আছে : 'শুধু জানি, এ যুদ্ধে আমরা জিতব আজ, নয় কাল। নয়তো পরশু।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯০)। এভাবে লেখক মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এই একটি গল্পেই তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও তাঁর আরো কিছু গল্প আছে যেখানে সমাজের বিচিত্র ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন। এসব গল্পের মধ্যে রয়েছে 'একটি জিজ্ঞাসা'। একটি কৌতূহলী মেয়ের বাবাকে নানা প্রশ্ন করে বিরক্ত করার দিকটি ফুটে উঠেছে। এসব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে লেখক শুধু মেয়েটির কৌতূহলী মনের অবস্থাই বর্ণনা করেননি পিতা ও কন্যার প্রশ্ন উত্তর পর্বে সমাজ, ধর্মের মৌলিক কিছু জিজ্ঞাসা উঠে এসেছে যেটিতে হয়তো লেখকেরও জানার আগ্রহ রয়েছে। তাদের সংলাপগুলি এমন :

হজে গেলে কিতা অয় বাবজান?

হজে গেলে গুনাহ খাতাহ সব মাপ অইয়া যায়, বুঝলি বেটি?

গুনাহ অইলে কী অয় বাবজান?

গুহান অইলে দোজখে যায় দোজখে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯২-৪৯৩)

ধর্ম নিয়ে এরূপ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে লেখকের নিজেস্ব ভাবনাও তুলে ধরা হয়েছে এ গল্পে।

গ্রামীণ জীবনচিত্র নিয়ে রচনা করেছেন 'বাঁধ' গল্পটি। এখানে ফুটে উঠেছে গ্রামীণ ধর্মীয় অনুভূতি, পীর-দরবেশদের ধর্মকে পুঁজি করে লোক ঠকানোর দৃশ্য। নদীর পাড়ের একটি গ্রামে বর্ষা ঋতুতে বন্যা শুরু হয়। তখন গ্রামের লোকেরা পীরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু ভণ্ডপীরের পক্ষে তাদের সাহায্য করা সম্ভব নয়। তবুও পীর সাহেব তাদের আশ্বাস দেয়। অন্যদিকে গ্রামের কিছু খেটে খাওয়া লোক তাদের শেষ সম্বল রক্ষার জন্য বৃষ্টিতে ভিজে কঠিন শ্রম দিয়ে পূর্বের জরাজীর্ণ বাঁধাটি মেরামত করে। আর যখন বাঁধ নির্মিত হয়ে ফসল রক্ষা পায় তখন পীর সমস্ত কৃতিত্ব নিজের কাঁধে নেয়। 'এক মুহূর্তে যেন ভাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁ-টা। ছেলে-বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে ধেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে। ঘুম চোখে তখনো ঢুলছেন পীর সাহেব। স্বল্প হেসে বললেন, খোদার কুদরতের শান কে বলতে পারে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫০৪)। এ গল্পে লেখক পীরপ্রথার কপট দিক ও গ্রামীণ সরল মানুষের চেতনা এবং শ্রমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

সমাজসচেতন গল্পকার জহির রায়হান সমকালীন সমগ্র প্রেক্ষাপটকেই তাঁর গল্পে তুলে আনতে চেয়েছেন। এই চেতনার প্রেক্ষিতে আমরা পীরপ্রথার কুপ্রভাব 'অপরাধ' গল্পেও দেখতে পায়। আবুল মনসুর আহমদের 'হুজুর কেবলা'র মতো এ গল্পেও পীরদের নিষ্ঠুরতা, অমানবিক নির্যাতন ও হৃদয়হীন মানুষের আচরণিক বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পীর সাহেবের অমানবিক আচারণ লেখক এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> পীর সাহেবের বাড়ির কঠোর শাসন। ঘরের ঝি-বৌদের বাইরের লোক যাতে দেখতে না পায়, তার জন্যে জানালায় মোটা পর্দা টাঙানো। তা একটু ফাঁক করে বাইরে একপলক তাকতে যাবে তাহাও স্বামীর নিষেধ।... গলা ছেড়ে একটা কথা বলতে কিংবা হাসতে ও সাহস পায়নি। পীর সাহেবের কঠোর আপত্তি এতে। মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই। শব্দ করে হাসতে নেই। পদে পদে বাধা। পেট ভরে চারটে ভাত খাবে তারও জো নেই। মেপে মেপে ভাত ওঠে সবার পাতে। পীর সাহেব বলেন, অতিরিক্ত খেলে কেয়ামতের দিন তার হিসাব দিতে হবে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫২৬)

এই চিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ নারী সমাজের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সালেহা। তার যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন বাবা তার অনুরক্ত আশি বছরের পীর সাহেবের সঙ্গে বিবাহ দেয়। কিন্তু বিবাহের চার বছর পর ও নর-নারীর স্বাভাবিক চাওয়া পূর্ণ করতে পারেনি পীর। বিয়ের সময় তার বাবা, দাদা, নানী বিবাহের যে আনন্দ উৎস আবিষ্কার করেছিল সালেহার জীবনে তা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তার শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনকে লেখক এভাবে চিত্রিত করেছেন : 'মানুষের জীবনে অনেক আমোদ-আহ্লাদ থাকে, কিন্তু তার কোনোটাই ভোগ করতে পারেনি সালেহা। কারাগার। এ চারটে বছর ঠিক যেন কারাগারের ভেতরই দিন কাটিয়েছে সে। এতটুকু স্বাধীনতা নেই, নেই নিজের ইচ্ছামতো চলাফেরা করার এতটুকু অধিকার।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫২৬)

এমন বর্ণনার মাধ্যমে লেখক রক্ষণশীল সমাজে নারীর অবস্থান তুলে ধরেছন। ধর্মের নামে এমন অন্যায়, অবিচার পুরুষশাসিত রক্ষণশীল সমাজের অতি সাধারণ চিত্র। ধর্মের মুখোশ পরে এই সব পীরেরা সাধারণ মানুষকে তাদের হাতের ক্রীড়ানক করে রেখেছে। আর তাদের বলির শিকার হয়েছে নারী সমাজ। সালেহা তারই প্রতিনিধি। চার বছর সংসার করে শূন্য হাতে সেও একদিন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কাউকে কিছু না জানিয়ে ঘর ছাড়া হয়। তবুও তার মুক্তি মেলে নি। পীর স্বামীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে 'আত্মসম্মান জ্ঞানী সমাজ জীব' পিতার হাতে এসে পড়ে। আর বাবার প্রহরে সে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন তার মনের পড়ে মায়ের প্রতি বাবার কাপুরুষের মতো ব্যবহার। বর্ণিত আছে :

> পাষাণ বাবা মাকেও এরকম ভাবে মারত। মার খেয়ে মায়ের হাড়গুলো সব জখম হয়ে গিয়েছিল। মা কাঁদত না, কোঁকাত। আর সুদূর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাবত।
>
> ...বাবা না জানলেও সে জানে বাবার মার খেয়েই মা মারা গেছে। ডাকু! ডাকু, এরা সবাই ডাকু! খুনী! উহ্ আর কিছু ভাবতে পারছে না সালেহা।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৩০)

বাবার এই নির্যাতনে মায়ের মতো সালেহাও বাঁচতে পারে নি। অকালেই প্রাণ দিতে হল তার। মৃত্যুর পরও সালেহার অপরাধের নিষ্কৃতি মেলেনি নিষ্ঠুর সমাজের কাছে। সবাই তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে পীরের অবাধ্য হওয়াকে দায়ী করেছে। আর লেখক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের এমন চেতনাকে ব্যঙ্গ করতেই গল্পের নামকরণ করেছেন 'অপরাধ'। তবে লেখক শুধু সমাজের এমন করুণ দৃশ্য বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি, নারী লাঞ্ছনার কারণও উল্লেখ করেছেন সালেহার আত্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। বর্ণনাটি এমন :

> খুনী! খুনী! বুড়োটা একটা খুনী ছাড়া আর কিছু নয়। সালেহাকে সে খুন করেছে।
>
> একটা পূর্ণযৌবনা তরুণীর আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা কোমল হৃদয়কে ছুরি দিয়ে কুচিকুচি করে কেটে ফেলেছে। ওই বুড়োটা সে। সব বলে দেবে। সব কিছু। কিন্তু বড় দুর্বল সে, তাই কিছু বলা হয় না। সালেহা বুঝতে পারে, এ দুর্বলতাই এতদূর নিয়ে এসেছে তাকে। নইলে প্রথমেই সে প্রতিবাদ করতে পারত।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫২৮)

জহির রায়হানের আর একটি গল্প 'ইচ্ছা অনিচ্ছা'। একটি বাস্তবধর্মী গল্প। এখানেও ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও গোড়ামী প্রকাশ পেয়েছে। ইহলৌকিক চেতনাকে জহির রায়হান আগাগোড়ায় সরল-সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। গ্রাম বাংলার মানুষদের সরল জীবন ও তাদের সারল্যের সুযেগা নিয়ে সুবিধাভোগী শাসকদের কুচক্র কতটা নিষ্ঠুর-নির্মম হতে পারে তাই বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। বিন্তি নাম এক দরিদ্র নারী মিয়া বাড়ি ঢেঁকিতে ধান ভেনে সংসার চালায়। পূর্বেই তার স্বামী পাহাড়ী অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে মারা যায়। স্বামী মারা যাওয়ার পর গ্রামের লোভী মোল্লারা তাকে পরামর্শ দেয় তার সর্বস্ব বিক্রি করে মোল্লাদের দাওয়াত খাওয়াতে এবং দান খয়রাত করতে। তাহলেই বিন্তির সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে। বিন্তি সরল মনেই তাতে রাজি হয়ে যায় এবং নিজের হাতের বালা সুধে বন্দক রেখে মৌলভীদের মনবাঞ্ছা পূরণ করে। কিন্তু তার স্বচ্ছলতা আর ফিরে আসে না। একদিন কালবৈশাখী ঝড়ের রাতে তার নড়বড়ে ঘরটি মাটির সঙ্গে মিশে যায়। সে আরো নিঃস্ব হয়ে যায়। তার অসহায়ত্বের সুযোগে-শোষকদের কুচক্র লেখক এভাবে বর্ণনা করেছেন : 'বদদোয়ার, ভয়ে অগত্যা রাজি হয়ে গেল বিন্তি। একটা সাদা কাগজে কী সব লিখে, তার ওপর বিন্তির টিপসই নিলেন বড় মিয়া। তারপর একটাকার বারটা ময়লা নোট গুঁজে দিলেন ওর হাতে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৪৬)

এরপরও বিন্তির শেষ রক্ষা হল না। এভাবে লেখক মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রবল প্রভেদ তুলে ধরতেই এ গল্পটির এমন নামকরণ করেছেন।

'কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ' গল্পটি একটি প্রতীকীধর্মী গল্প। গল্পটি পড়লে বনফুলের কথা মনে পড়ে যায়। তীর্যক তীক্ষ্ম ধারলো ছোট ছোট বাক্য দিয়ে মর্মান্তিক গভীর অনুভূতির প্রকাশের গল্প নির্মাণ করতেন । এ গল্পে তিনি লোভী,

স্বার্থপর ভদ্রলোকদের কুকুর হিসেবে চিত্রিত করেছেন। লেখক তীর্যকভাবে অভদ্র , স্বার্থন্বেষী বড়লোকদের বর্ণনা করেছেন :

> পথ-ঘাট মাঠ সব কুকুরে কুকরারণ্য।
>
> দাওয়ায় কুকুর।
>
> কার্নিশে কুকুর।
>
> হোটেলে কুকুর।
>
> রেস্তোরায় কুকুর।
>
> স্কুল। পাঠশালা । অফিস। আদালত। সর্বত্র কুকরে কুকুরময় সবাই গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।
>
> (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৬৩)

জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তর গল্প হল 'ম্যাসাকার'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় তাণ্ডব ও বীভৎস মূর্তির আলোকে রচিত হয়েছে গল্পটি। গল্পের কথক ডা: চৌধুরী। সাম্রাজবাদীদের ক্ষীণ স্বার্থ উদ্ধারের নোংড়া রূপের প্রতি লেখক ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এখানে। সাম্রাজবাদীরা নিজেদের শক্তি দৃঢ় করতে একের পর এক অঞ্চল করায়ত্ত করেছে, হত্যা করেছে অগণিত মানুষ, নির্যাতন করেছে নারীর উপর। এখানে দুই ইংরেজ ও মার্কিন তরুণ-তরুণীদের মর্মান্তিক পরিণতি দেখানো হয়েছে। ষোল বছরের কিশোর জর্জ, প্রেমিক যুবক এডওয়ার্ড অথবা লুইসা এই যুদ্ধের শিকার। কিশোর জর্জ পারেনি তার মায়ের কাছে ফিরে যেতে। অন্যদিক এডওয়ার্ড আর্ন্তজ্বালায় দগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তবে তাদের কেউই যুদ্ধ চায়নি। তবু শাষকগোষ্ঠী বাধ্য করেছে তাদের এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে। বর্ণিত আছে : 'আমাদের সরকার সৈন্যবৃত্তি গ্রহণ করাটাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, যুদ্ধ করবার ইচ্ছা থাকুক কিংবা না- থাকুক, সবার গলায় একটা করে ব্রেন গান ঝুলিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া চাই-ই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৭৬)

যুদ্ধের বিভৎস রূপ দেখতে চায় না সাধারণ মানুষ। কিন্তু যখনই তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করতে গিয়েছে তখনই মেশিন গানের গুলিতে ঝাঝড়া হয়েছে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের পাঁজর। গুড়িয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। বন্দী শিবিরে নির্যাতিত হয়েছে অসংখ্য নারী দেহ। লেখকের বর্ণনায় : 'উলঙ্গ। একেবারে উলঙ্গ বিবস্ত্রা নারীদেহ সব ছড়িয়ে আছে মেঝের ওপর, এখানে, ওখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মাটির ঢেলার মতো। শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে ওদের শীর্ণ হাতগুলো; দেয়ালের আংটার সাথে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৮৪)

এমন নির্মমতাও শাসকবর্গকে কুণ্ঠীত করেনি। তাদের মূল উদ্দেশ্য শাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ডাক্তার চৌধুরী ও মেজর কলিনসের কথোপকথনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতার লোপ ও পেশী শক্তি বৃদ্ধির মনোভাব বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

বাঁচবার জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাব! আর যত পারব শত্রুদের হত্যা করব। মানুষের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। মানুষ চাই না আমরা, আমরা চাই মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম খনিগুলো। সোনা ফলানো শস্যভূমি আর বড় বড় কারখানাগুলো, আর চীন ভারতের মতো কলোনিগুলোর যেখানে আমরা আমাদের সমস্ত রদ্দি মালগুলো চালাতে পারব। তার জন্য প্রয়োজন হলে আমরা রোগ জীবাণু ছড়িয়ে দেব ওদের ঘরে ঘরে। একটা বোমা মেরে নিশ্চিহ্ন করে দেব ওদের। আর মেশিনগান দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব ওদের শান্তির কপোতকে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৭৮-৫৭৯)

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের সমাজেও বিস্তার লাভ করে। নানাভাবে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়েছে এদেশের মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই প্রেক্ষাপট বাংলাদেশেও প্রভাব ফেলে। যুদ্ধের ভয়াবহতা আর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি শান্ত জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। চারদিকে শুধু অভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর মৃত্যুর হিমশীতল বিভীষিকা। লেখক বাংলাদেশেরও এমন ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়েছে তুলেছেন এভাবে :

পথে পথে মোড়ে মোড়ে আর রাস্তার আনাচে-কানাচে বসে বসে ধুকছে, রক্ত মাংসহীন শবের দল; এক নয়, দুই নয়, হাজার হাজার। পথের কুকুর আর আকাশের শকুনদের ভোজসভা বসেছে নর্দমার পাশে। আধমরা মানুষগুলোকে টানা হ্যাঁচড়া করে মাহা-উল্লাসে ভক্ষণ করছে ওরা। দ্বিতীয় মহাসমর। আর দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত সোনার বাংলা, চারদিকে শুধু হাহাকার, অন্ন নেই। বস্ত্র নেই! নেই! নেই! কিছু নেই! শুধু আছে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, আর অভাব অনটন।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৭৯-৫৮০)

এই অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক জীবন থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেকেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। জর্জ, এডোওয়ার্ড, লুইসার মতো অগণিত মানুষের আত্মদানেই একসময় ডাক্তারের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম নিয়েছে। যা পরবর্তীকালে প্রতিবাদের ভাষায় পরিণত হয়েছে। ফলে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে তিনি মেজর কলিনসকে চাপটাঘাত করেন। আর লেখক একে শান্তির সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অবিহিত করেছেন। তাছাড়া লুইসার সম্ভাবনাময় আগামীর স্বপ্নের মধ্য দিলে লেখক নিজেরই আশাবাদী মানসিকতা বর্ণনা করেছেন :

মাটির মানুষগুলো নিশ্চয়ই একদিন জাগবে। আর শয়তানদের মুখোশ খুলে ফেলবে তারা! তাদের জাগরণের দুর্বার স্রোতে কোথায় ভেসে যাবে যুদ্ধের দালালরা আর অত্যাচারী ধনকুবেররা। তখন একটা নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হবে, যেখানে দুঃখ-দুর্দশা অভাব অনটন বলে কিছু থাকবে না, মানুষে মানুষে এত ভেদাভেদ, এত হিংসা-বিদ্বেষ, সব কিছুর অবসান হবে। আর পৃথিবীতে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হবে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৮)

লেখক অন্যত্র যুদ্ধের কুপ্রভাবের কথাও তুলে ধরেছেন এভাবে : 'যুদ্ধ আমি চাইনা, কারণ যুদ্ধ এমন একটা ব্যাধি যে শুধু দুর্বল এবং রোগা লোকের জীবন হরণ করে না; সুস্থ, সবল এবং সতেজ মানুষকেও হত্যা করে।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৮৩)

'আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ জহির রায়হান 'ম্যাসাকার' গল্পে একটি নির্দিষ্ট সময়কে ধরতে চেয়েছেন। গল্পটির দুর্বল বৈশিষ্ট্য এর সংলাপধর্মীতা, দৃশ্যবদ্ধতা এবং মন্থর গতি। তথাপি কাহিনী বর্ণনা, আবেগ এবং চরিত্রের অভ্যন্তরীণ রোমান্টিকতা গল্পটিকে লক্ষনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে। নির্জন নিস্তব্ধ রাতে যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটি কিশোরীর কণ্ঠ, বাদী শিবিরে নির্যাতিত মৃত বিবসনা লুইসার মৃতদেহ কিংবা লুইসার ছোট বোনের সেবা ও সান্ত্বনা পাঠক হৃদয়ের একটি আবেগী রোমান্টিক ও রহস্যময় বাতাবরণ সৃষ্টি করে। গল্পটির শৈল্পিক অসঙ্গতির কারণ জহির রায়হানের অনভিজ্ঞতা। কেননা, 'ম্যাসাকার' গল্পটি যখন লেখেন তখন তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। অভিজ্ঞতার এই অপূর্ণতা সত্ত্বেও লেখকের মানসিক অভিযাত্রা এবং আন্তর্জাতিক চেতনা প্রশংসনীয়।' (সুরভী দাস ২০০২ : ৮৭)

গল্পের কাহিনী বর্ণনায় জহির রায়হান যেমন বিচিত্রমুখী হয়েছেন তেমনি আঙ্গিক পরিকাঠামো নির্মাণেও যত্নশীল ছিলেন। উপন্যাসের মতো গল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ছিল গতিময়, চিত্রল এবং কাব্যময়। ভাষা ব্যবহারে মাঝে মাঝে তিনি আবার সাংকেতিকতা ব্যবহার করেছেন। তার সহজ সরল বর্ণনাভঙ্গি এমন : 'বাইরে শুধু বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বাড়ছিল। আবার কমছিল রাস্তায় পায়ে চলা পথিকের সাড়াশব্দ ছিল না। শুধু দূর রেস্তোরা থেকে ভেসে আসছিল গানের টুকরো টুকরো কলি। অস্পষ্ট তার সুর। তবু, বেশ লাগছিল তাঁর।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫০৫)

জহির রায়হান তাঁর ছোটগল্পের বিষয় উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালীন ঘটনা। বাঙালি জাতির ভাষিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য অর্জনের সংগ্রাম, চিরায়ত বাংলার জীবনপ্রণালী, সমাজের নানা অনাচার, ভণ্ডামীতা, প্রতারণা এবং মানস মুক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পে। এক্ষেত্রে ফর্ম নির্মাণে তিনি চলচ্চিত্রের টেকনিক ব্যবহার করেছেন। যেন দৃশ্য শিল্পরীতিকে শব্দশিল্পে ব্যবহার করেছেন। এসব গল্পের মধ্যে রয়েছে- 'সময়ের প্রয়োজনে', 'মহামৃত্যু', 'জন্মান্তর', 'ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি', 'কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ', 'কয়েকটি সংলাপ' প্রভৃতি।

আলোচ্য গল্পসমূহের চরিত্র ও ঘটনাপুঞ্জ বর্ণনায় লেখক সর্বোক্ষণ ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। চলচ্চিত্রের কাট-টু-কাট পদ্ধতির মতোই তাঁর বর্ণনা কৌশল :

> সারাদিন সে ওই দেয়ালগুলোতে মাথা ঠুকছে আর বলছে আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে মুক্তি দাও। আমার ইচ্ছেগুলোকে পায়রার পাখনায় উড়ে যেতে দাও আকাশে। কিম্বা সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দাও। সেখানে তারা প্রাণ ভরে সাঁতার কাটুক।
>
> সারাদিন সে শুধু ছুটছে, ভাবছে-আবার ছুটছে। এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে।
>
> কত দেয়াল ভাঙবে সে?

তবু সে আশাহত হয়। ইচ্ছার আগুন বুকে জ্বেলে রেখে তবু সে ছুটছে আর ভাঙছে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৬২)

'জন্মান্তর', 'কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ', 'কয়েকটি সংলাপ' প্রভৃতি গল্পেও একই ভাবে চিত্রনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকরণ বিচারে এগুলি হয়তো প্রথাসিদ্ধ ছোটগল্প নয়, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্যমূলক, একরৈখিক, শ্লেষ বক্তব্য উপস্থাপনের উজ্জ্বল উদাহরণ।

'অতি পরিচিত' গল্পে লেখক প্রথাগত প্রকরণ অনুশীলন করলেও এখানে তাঁর স্যাটায়রিক শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে গল্পটি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুভাকাঙ্ক্ষী ট্রলির পিতা ব্যবসায়ী হলেও তাকে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তার জ্ঞানের পরিধি চিত্রণে লেখক তীক্ষ্ম শ্লেষের আশ্রয় নিয়েছেন এভাবে :

কী পড়ছ ওটা? আরো কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর বইটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন ও গীটাঞ্জলী? এ নাইস, নাইস বুক। প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন দেশের ভাবী শিক্ষাকর্তা, ট্রলির বাবা। বললেন গীটাঞ্জলী ওহ! চমৎকার বই! মিল্টনের একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৪১)

ঘটনা বিন্যাসে জহির রায়হান অসাধারণ সাবলীল ছিলেন। অধিকাংশ গল্পের কাহিনী বর্ণনায় নাটকীয়তা ব্যবহার করেছে। তাঁর গল্প অবতারণার এমন বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে নতুন ব্যঞ্জনা দান করেছে। গল্পের ভূমিকা উপস্থাপন এমন :

কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ে নড়বড়ে চালাঘরটা ধসে পড়ল মাটিতে। বিন্তি জানত না সে খবর। মিয়া বাড়িতে ধান ভানতে গিয়েছিল সে। ফিরে আসতেই রাস্তায় মনার মা বলল, তখনই কইছিলাম বৌ ঘর ডারে একটু মেরামত করো। তা তো কইরলা না, এখন-

এহন কী অইছে বুয়া? শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিন্তি। মনার মা বলল, কী আর অইবো বাপু। ঘরটা পইড়া গেছে তুফানে।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৪১)

উপন্যাসের মতো, জহির রায়হানের ছোটগল্প বর্ণনা গীতময় ও কাব্যময়। জীবন ও জগতের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার মতো বিচিত্র অনুভূতি চিত্রিত করেছেন চিত্রল ও কাব্যিক ভাষা মাধুর্যে। ফলে তাঁর ভাষারীতি হয়ে উঠেছে পরিপাটি যুগপৎ ও অন্যদের থেকে আলাদা। সেই সহজ সরল বর্ণনা রীতি এমন:

ভোরের ট্রেনে গাঁয়ে ফিরে এলেন শনু পণ্ডিত।

ন্যুব্জ দেহ, রুক্ষ চুল, মুখময় বার্ধ্যকের জ্যামিতিক রেখা। অনেক আশা-ভরসা নিয়েই শহরে গিয়েছিলেন তিনি ভেবেছিলেন, কিছু টাকা পয়সা সাহায্য পেলে আবার নতুন করে দাঁড় করাবেন স্কুলটাকে। আবার শুরু করবেন গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কাজ। কত আশা! আশার মুখে ছাই!

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫১০)

এমনি বর্ণনা তাঁর প্রতিটি গল্পে। ভাষার এই সারল্য ও পরিমিতিবোধের তাৎপর্যে গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব দান করেছে।

ছোট ছোট বাক্যে কাটা-কাটা ভাবে তিনি বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। যেন চিত্রনাট্যেরই প্রতিরূপ। ঘটনা শুরুর পূর্বের চিত্রকল্প তৈরি ক্ষমতা ছিল অনুপম। যা পরবর্তীকালে চরিত্র ও কাহিনী অগ্রসরে গভীর প্রভাব ফেলেছে :

সকাল থেকেই মেঘ মেঘ করছিল সারাটা আকাশটা।

দুপুর গড়াতেই বৃষ্টি নামল জোরে।

বাইরে শুধু বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বাড়ছিল। আবার কমছিল। রাস্তায় পায়ে চলা পথিকের সাড়াশব্দ ছিল না। শুধু দূর রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছিল গানের টুকরো টুকরো কলি। অস্পষ্ট তার সুর। তবু, বেশ লাগছিল তাঁর।

আধপোড়া বিড়িটায় আগুন ধরিয়ে, ক্লান্তদৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন আনোয়ার সাহেব।

(জহির রায়হান ২০১৩ : ৫০৫)

কোথাও কোথাও একই চিত্রকল্পের বিচিত্র ব্যবহার দেখিয়েছেন। 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পে এমন প্রকরণ লক্ষণীয়। সমাজ ও জীবনের অবস্থানকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের জন্যই ভাষার এমন কারুকাজ দেখিয়েছেন। চিত্রকল্পের মতো উপমা প্রয়োগেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পরিবেশ ও ঘটনা অনুযায়ী যথাযথ উপমা ব্যবহার করেছেন ছোটগল্পে। তাঁর উপমা ব্যবহার এমন :

- মেঝেতে পুডিং -এর মতো জমাট রক্ত। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৮৩)
- রক্তিম চোখ দুটোতে আগুনের ফুলকি ঝরেছিল মুনিরের। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯৪)
- স্বল্প পরিমিত হাসি আপেলের রক্তিমাভার মতো কেটে ছাড়িয়ে পড়ছে মুখের সর্বত্র। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫০৪)
- লম্বা স্কুলটার দিকে তাকাতে আনন্দে চিকচিক করে উঠল কর্মক্লান্ত চোখগুলো। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৬১)
- যাদের জিহ্বা সাপের ফণার মতো। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৬১)
- কুকুরের মতো চিৎকার জুড়ে দিল। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৬৩)
- ক্ষুধিত সিংহের সামনে পড়লে নিরস্ত্র মানুষ যেমন ভয়ার্ত চিৎকার করে ওঠে ওরাও ঠিক তেমনি আর্তনাদ করে উঠল। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৮৪)

এভাবে বিচিত্র উপমার যথার্থ ব্যবহারে তাঁর গল্পের ভাষাশৈলীর তাৎপর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন। জহির রায়হান তাঁর অনেক গল্পে বৃষ্টিকে অনুষঙ্গের করেছেন। তার বৃষ্টি বর্ণনায় যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনার সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁর গল্পে বৃষ্টি বর্ণনা এমন : 'বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সারাটা বিকেল বৃষ্টি হল। সারা রাত চলল তার একটানা ঝপঝপ ঝনঝন শব্দ। সকালেও তার বিরাম নেই।' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫০১)

বিভিন্ন প্রসঙ্গের ভূমিকা হিসেবেও অনেক ক্ষেত্রে মেঘ ও বৃষ্টির ব্যবহার করেছেন। যেমন- কোন সর্বনাশ, ধ্বংস, দুর্ঘটনা, মন খারাপের কিংবা চেতনা জাগরণের আভাস হিসেবে তিনি মেঘ বৃষ্টিকে অনুষঙ্গ করেছেন :

- সেলিনার আয়ত পানিভরা চোখে ঝড়ো-মেঘের বিপ্লবী প্রতিজ্ঞার ছায়া কি ঘন হয়ে উঠেছে না! (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৩৭)
- বৃষ্টিটা তখন থেমে গেছে। আর রাহুমুক্ত চাঁদ খলখলিয়ে হাসছে আকাশে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৫৩)

জহির রায়হান তাঁর গল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে গ্রামীণ জীবনযাত্রা বর্ণনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি ভাষার মধ্যে লোকজ উপাদান ও গ্রাম্য কথনের অদ্ভুত সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। 'নয়াপত্তন' ও 'একটা জিজ্ঞাসা' গল্পে এমন দেখা যায়। করম আলী ও তার মেয়ের প্রশ্ন কথোপকথন এমন :
'যাগো টাহা আছে তারা গুনা করলেও বেহেস্তে যাইবো, না বাবজান?' (জহির রায়হান ২০১৩ : ৪৯৩)

এছাড়া বিভিন্ন গল্পে তিনি গ্রামীণ ও লোকজ প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন যা গল্পের শিল্পরীতিকে অলংকৃত ও মাধুর্যপূর্ণ করে তুলেছে :

- খোদায় যা করে ভালোর লাইগাই করে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৪৭)
- সোয়ামী নাই যার দুনিয়াই আন্দার তার। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৪২)
- জানের উপর দিয়া আইছিল, মালের উপর দিয়া গেছে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৪৩)
- বিপদ আসে তো সব দিকদিয়েই আসে। (জহির রায়হান ২০১৩ : ৫৪২)

এভাবে নানা শৈল্পিকরীতি ব্যবহার করে জহির রায়হান তাঁর ছোটগল্পের অবস্থান বাংলা সাহিত্যে পরিপক্ক করেছেন। ছোটগল্প সমালোচক আহমদ কবির গল্প প্রসঙ্গ আলোচনায় বলেছেন : 'ছোটগল্প শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য জীবনের খণ্ডচিত্রের উন্মোচন। আমাদের চারিপাশের জীবন থেকে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ তুলে ধরেন ছোটগল্পকার। ছোটগল্প কখনো কখনো এমন একটি হৃদয়সত্যের উন্মোচন ঘটায় যা সমকালীন হয়েও চিরকালীন।' (আহমদ কবির, ১৯৮৮ : ৩৭)। এদিক থেকে জহির রায়হনের গল্পসমূহ সার্থক। লেখক সমাজ ও জীবনের নানা খণ্ডচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

গল্পাঙ্গনে। শাশ্বত হৃদয়ের সত্যানুভূতিকে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করেছেন। সেকারণে তাঁর গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী, নরনারীর রোমান্টিক প্রেম-বিরহ, সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবন সঙ্কট, বকধার্মিকদের কুটিল প্রতারণা, মানুষের প্রচেষ্টা, আশায় বুকবাঁধা, মনুষত্বের জাগরণ, ব্যক্তিত্ববোধের উত্থান এবং শ্বাশত বাংলার রূপায়াবয়ব। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী, শাণিত ও সুচারু। গল্পের প্রকরণরীতির ক্ষেত্রে সাধারণরীতির পাশাপাশি চলচ্চিত্রের রূপ-রীতি ও পরিভাষাকে অঙ্গীভূত করেছেন। এটাই তাঁকে অন্যান্য লেখদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে জাতিসত্তার শৈল্পিক প্রতিমা স্থাপনেরে অনন্য শিল্পী জহির রায়হান। তাঁর সৃজনশীল শিল্পচর্চা শুরু হয়েছিল জাতীয় জীবনের সেই ক্রান্তি লগ্নে, যখন বাঙালি জাতি জীবনাদর্শ ও সত্তা আবিষ্কারে ছিলো দ্বিধাগ্রস্ত। এই সংকটাকীর্ণ সময়ে তিনি অন্তরময় ও গভীরদৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন বাঙালির দুঃসহ জীবনাবর্ত, যা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন শিল্প-সাহিত্যের বিচিত্র রূপ । কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ এমনকি চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে জাতিসত্তার প্রত্যাশা ও স্বপ্ন রূপায়িত করেছেন।

জহির রায়হানের জীবনদৃষ্টি গঠনের প্রধান উপাদান সময়, সমাজ ও রাজনীতি, যা তাঁর কথাসাহিত্যে বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ অন্যদিকে নব্য উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় মানসের বিচিত্রমুখী গতিবিধির রূপায়ণ তাঁর সাহিত্যকর্মকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র করেছে। ব্যক্তিজীবনে যেহেতু তিনি রাজনৈতিককর্মী ও বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ছিলেন তাই তাঁর সাহিত্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বায়ান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় পদচারণা ছিল। এ কারণেই উনিশশো বায়ান্ন নিয়ে প্রথম গল্প 'সূর্যগ্রহণ' ও প্রথম উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি 'মহামৃত্যু', অতি পরিচিত 'একুশের গল্প', কয়েকটি সংলাপ, নামে চারটি গল্প ও 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামে আরো একটি উপন্যাস রচনা করেছেন যেখানে এ আন্দোলনের পূর্ব ও উত্তরকালের ঘটনা, জাতীয় প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, বায়ান্ন উদযাপন সর্বোপরি লেখকের মতাদর্শ অঙ্কিত হয়েছে। উল্লেখ্য তাঁর সাহিত্যকর্মে রাজনীতির যে অনিবার্যতা দেখা যায়, সমকালীন অনেকের মধ্যেই তা অনুপস্থিত। দেশীয় ঘটনাবর্তের পাশাপাশি তিনি বৈশ্বিক নানা আন্দোলন ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রূপ দিয়েছেন 'আর কত দিন' উপন্যাসে। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনে মার্কসীয় দর্শনে আস্থাশীল হওয়ায় সংঘজীবনের সমগ্রতা রূপায়ণে তাঁর দক্ষতা ছিলো অপরিসীম। এখানে রোমান্টিক ও আবেগধর্মী জীবনদৃষ্টির পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী শোষিত, বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষের পক্ষে সমাজ পরিবর্তনের বলিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সমকালীন রাজনৈতিক চাপে অনেক সাহিত্যিক গা বাঁচিয়ে চললেও তিনি ছিলেন নির্ভীক, সাহসী ও দায়িত্ববান কথাশিল্পী। বৈরী, প্রতিকুল পরিবেশ ও সমাজবাস্তবতার অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা থেকে তিনি অকুণ্ঠিত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ, প্রত্যাশিত গণতন্ত্রের বিপর্যয়, সামাজিক নৈরাজ্য, জাতিশোষণ, শ্রেণিশোষণ, ধর্মশোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণির পেশীশক্তি, সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁর পর্যবেক্ষণে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। উপন্যাসে বৈশ্বিক মানবতাবোধ ও গণচেতনার পক্ষে এমন অবস্থান জহির রায়হানকে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কথাসাহিত্যের মৌল উপজীব্য নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ভেতর-বাইরের সংগ্রাম। 'মধ্যবিত্তের সাধ আছে সাধ্য নাই'– এ নীতি অনুসরণ করে তাদের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, প্রত্যাশা, অচরিতার্থতাজনিত হতাশা, দ্বন্দ্ব, তাদের আত্ম মর্যাদাবোধ প্রভৃতির শিল্পরূপ অঙ্কন করেছেন 'শেষ বিকেলের মেয়ে', 'তৃষ্ণা' ও 'বরফ গলা নদী' উপন্যাসে। এখানে অতি সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষাশীল দৃষ্টি দিয়ে তিনি মধ্যবিত্তের মনোজগৎ ও বহির্জগতের টানাপড়েনের দ্বান্দ্বিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। জহির রায়হান ছিলেন প্রেমিক পুরুষ। ব্যক্তিজীবনের সৌন্দর্যপ্রীতির মতো সাহিত্যনির্মাণেও অনেক বেশি আবেগী ছিলেন। প্রেমচেতনার নানা দিক নিপুণ শিল্পির তুলিতে চিত্রিত করেছেন 'শেষ বিকেলের মেয়ে' ও 'বরফ গলা নদী' উপন্যাসে। এ ক্ষেত্রে নাগরিক প্রেমের বিচিত্র রূপ প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। আর 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের আবহমান রূপটি প্রকাশ করেছেন; সেই সাথে মানুষের অসীম আকাঙ্ক্ষার বাস্তব চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে ষাটের দশকে প্রকাশিত ছোটগল্প 'সূর্যগ্রহণ'-এ সন্নিবেশিত হয়েছে তৎকালীন সময়ের বিচিত্র ঘটনাবলি। আবহমান বাংলার চিরায়ত জীবন বৈশিষ্ট্য, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম, ধর্মের নামে পীরদের ভণ্ডামি, প্রতারণা, সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা, হৃদয়হীনতা, পচনশীলতা, মধ্যবিত্তের গণ্ডিবদ্ধ জীবন, তাদের অক্ষমতা, প্রতিবাদ, মানবতাবোধের উত্থান প্রভৃতি বাস্তব শিল্পদৃষ্টি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পে।

শিল্পরীতির ক্ষেত্রে তিনি সরল ও সাবলীলতাকেই অনুসরণ করেছেন। উপন্যাস ও ছোটগল্প উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও কাব্যময় বাক্য পরিবেশন করে পাঠক চিত্তে আনন্দের সংরাগ সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু তিনি চলচ্চিত্রকার ছিলেন তাই তাঁর সাহিত্যও ছিল চিত্রকল্প সম্বলিত। আর প্যাটার্নের দিক থেকে নিরীক্ষাশীল বিচিত্রি কাঠামোর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন দক্ষ কারিগরের মতো।

'সাহিত্য জীবনের দর্পণ'– এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন জহির রায়হান। তাই তাঁর সাহিত্যে শিল্পের প্রয়োজনে জীবনের বিচ্যুতি ঘটেনি। জীবন ও শিল্পের সমন্বয়ই ছিল তাঁর আরাধ্য। জীবনের ঘটনানুসারেই বর্ণনার বিবিধ মাত্রা ব্যবহার করেছেন; জীবন পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যায় আজ অবধি তিনি অনতিক্রমণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বোপরি বহুমাত্রিক বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি প্রয়োগ করে সচেতন মানুষ এবং কর্মী হিসেবে একজন সাহিত্যদ্রষ্টার যে দায়বদ্ধতা, জহির রায়হান জীবন ও কর্মের মাধ্যমে তার আদর্শিক রূপ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

জহির রায়হান : জীবনপঞ্জি

১৯৩৫ : জন্ম ১৯ আগস্ট, মঞ্জুপুর গ্রাম, ফেনী মহকুমা, সোনাগাজী থানা নোয়াখালি জেলা ।

১৯৪০ : প্রাথমিক লেখাপড়া, মিত্র ইনস্টিটিউট, কলকাতা ও আলিয়া মাদ্রাসা, কলকাতা।

১৯৪৯ : চতুষ্কোণ সাহিত্য পত্রিকা (কলকাতা) তে 'ওদের জানিয়ে দাও' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত।

১৯৫০ : আমিরাবাদ হাইস্কুল (ফেনী) থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ।

১৯৫১ : যাত্রিক পত্রিকায় প্রথম গল্প 'হারানো বলয়' প্রকাশিত।

১৯৫১-৫৭ : কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সরাসরি জড়িত।

১৯৫২ : ছাত্র অবস্থাতেই মহান ভাষা আন্দোলনের অংশগ্রহণ ও কারাবরণ।

: মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ থেকে জহির রাহয়ানে পরিণত ।

: প্রমখেশ বড়ুয়া মেমেরিয়াল ফটোগ্রাফি স্কুলে (কলকাতা) ভর্তি।

১৯৫৩ : জগন্নাথ কলেজ (ঢাকা) থেকে আই.এস.সি পাশ ।

: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি।

১৯৫৪ : বি.এ. অনার্স (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি।

১৯৫৫ : প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' প্রকাশিত।

১৯৫৬ : পাকিস্তানের প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জারদারির সহকারী মনোনীত হয়ে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ।

১৯৬০ : প্রথম উপন্যাস 'শেষ বিকেলের মেয়ে' প্রকাশ।

১৯৬১ : প্রথম চলচ্চিত্র 'কখনো আসেনি' এর মুক্তি লাভ।

: চিত্র নায়িকা হেনা লাহিড়ী সুমিতা দেবীর সাথে পরিণয়।

: পাকিস্তানের প্রথম রঙিন ছবি 'সঙ্গম' তৈরি।

১৯৬৪ : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ।

: 'সঙ্গম' ছবির পাকিস্তানের নিগার পুরস্কার লাভ।

১৯৬৫ : পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসবে বেশ কিছু পুরস্কার লাভ।

১৯৬৮ : চিত্র নায়িকা কোহিনুর আকতার সুচন্দার সাথে পরিণয়।

১৯৭০ : পাকিস্তানের প্রথম রাজনৈতিক চেতনামণ্ডিত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া'র মুক্তিলাভ।

১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ।

: মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রথম প্রামাণ্যচিত্র 'স্টপ জেনোসাইড' নির্মাণ।

: মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র প্রামাণ্যচিত্র 'এ স্টেট ইজ বার্ন' নির্মাণ।

: বুদ্ধিজীবীদের বাংলাদেশ মুভি পরিষদ (Bangladesh Liberation Council of Intelligentsia) এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ : সাহিত্যে অবদানের জন্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ (১৯৭২ সালে ঘোষিত)।

১৯৭২ : বুদ্ধিজীবি হত্যা তদন্ত কমিটি গঠন।

: নিখোঁজ (৩০ জানুয়ারি থেকে)।

১৯৭৭ : চলচ্চিত্রের জন্য একুশে পদক লাভ।

১৯৯২ : সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

জহির রায়হান : রচনাপঞ্জি

ক. উপন্যাস

১. শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০)

প্রথম উপন্যাস। প্রকাশক : সন্ধানী প্রকাশনী।

২. তৃষ্ণা (১৯৬২)

৩. হাজার বছর ধরে (১৯৬৪)

৪. আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯)

৫. বরফ গলা নদী (১৯৬৯) ।

প্রথম প্রকাশ : উত্তরণ সাময়িকী

৬. আর কত দিন (১৯৭০)

৭. কয়েকটি মৃত্যু (১৯৭০)

৮. একুশে ফেব্রুয়ারী (১৯৭০)

৯. উপন্যাস সমগ্র (১৯৯৮)

খ. গল্প

১. সূর্যগ্রহণ (১৯৫৫)

২. গল্পসমগ্র (১৯৯৮)

গ. প্রবন্ধ

১. পাকিস্তান থেকে বাঙলাদেশ (১৯৭১)

ঘ. কবিতা

১. ওদের জানিয়ে দাও (১৯৪৯)

ঙ. চলচ্চিত্র

১. কখনো আসেনি (১৯৬১)

২. সোনার কাজল (১৯৬২)

৩. কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩)

৪. সঙ্গম (১৯৬৪)

৫. বাহানা (১৯৬৫)

৬. বেহুলা (১৯৬৬)

৭. আনোয়ারা (১৯৬৭)

৮. জুলেখা (১৯৬৭) প্রযোজনা

৯. দুই ভাই (১৯৬৮) প্রযোজনা

১০. সংসার (১৯৬৮) প্রযোজনা

১১. কুঁচবরণ কন্যা (১৯৬৮) প্রযোজনা

১২. মনের মত বউ (১৯৬৯) প্রযোজনা

১৩. বেদের মেয়ে (১৯৬৯)

১৪. শেষ পর্যন্ত (১৯৬৯) প্রযোজনা

১৫. জ্বলতে সুরয কে নীচে (১৯৭০)

১৬. জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০)

১৭. লেট দেয়ার বি লাইট (অসমাপ্ত) (১৯৭০)

১৮. স্পট জেনোসাইড (১৯৭১)

১৯. এ স্টেট ইজ বর্ন (১৯৭১)

চ. পত্রিকা সম্পাদনা

১. যাত্রিক

২. সিনেমা (সিনে-মাসিক)

৩. এক্সপ্রেস (ইংরেজি সাপ্তাহিক)

৪. প্রবাহ (বাংলা মাসিক)

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক রচনাপঞ্জি

মূলগ্রন্থ :

জহির রায়হান : রচনাসমগ্র, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, আগস্ট ২০১৩

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ :

অনুপম হায়াৎ : জহির রায়হানের চলচ্চিত্র পটভূমি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

: বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, ঢাকা, এফডিসি, ১৯৮৭

অনল রায়হান : হঠাৎ বাবার পঁচিশ পাতায়, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আরজুমন্দ আরা বানু : শহীদুল্লাহ কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : বিষয় ও প্রকরণ, ঢাকা, অনিন্দ্য প্রকাশ, মার্চ ২০০৮

আবদুল বাসির : বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি, ঢাকা,বাংলা একাডেমী, ২০১২

আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৮

আমিনুর রহমান সুলতান : বাংলাদেশের উপন্যাস নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৩

কবির চৌধুরী : নির্বাচিত প্রবন্ধ, ঢাকা, অনন্যা, ২০০১

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ : পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, প্রথম প্রকাশ ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, জানুয়ারি ১৯৭০ ও ২য় মুদ্রণ, জুন ২০১৪

খোন্দকার সিরাজুল হক : মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া : বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ,ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

চঞ্চল কুমার বোস : বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল, ২০০৯

ছন্দশ্রী পাল : বাংলাদেশের উপন্যাস পরিবার ও সমাজ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৯

জুলফিকার মতিন : লক্ষ্য যেথা স্থির, ঢাকা, স্বদেশ প্রকাশনী, ১৯৯৫

ড. মোহাম্মদ হান্নান : বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ পর্ব), ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

: বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস(১ম ও ২য় খণ্ড), ঢাকা,
আগামী প্রকাশনী ১৯৮৭

ড.সুকুমার বিশ্বাস : অসহযোগ আন্দোলন '৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা, ১৯৯৬

পান্না কায়সার : মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী,
সেপ্টেম্বর ১৯৯১

বদরুদ্দিন উমর : পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, ঢাকা,
মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০

বদরুল হাসান : উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস, কলকাতা,
জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১৯৯০

ভূঁইয়া ইকবাল : বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র (১৯৪৭-১৯৭১), ঢাকা,
বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৯১

বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ঢাকা, বুক ক্লাব, ২০০০

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ১৯৯১

মনসুর মুসা : পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, ঢাকা, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ১৯৭৪

মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী : বাংলাদেশের উপন্যাসসাহিত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী (১৯৪৭-৭০), ঢাকা,
বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

মাহমুদুল বাসার : জীবনশিল্পী জহির রায়হান, ঢাকা, স্টুডেন্টওয়েজ, একুশে বইমেলা ২০১১

মো: মুস্তাফিজুর রহমান : বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী,
জুন ২০০৯

রফিকউল্লাহ খান : হাসান হাফিজুর রহমান জীবন ও সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা,
বাংলা প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০১৬,

: বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

: কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব, অনন্য, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২

রণেশ দাশগুপ্ত : উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯), পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ঢাকা,
কলিকলম প্রকাশনী, ১৯৭৩

সারোয়ার জাহান : জীবনী গ্রন্থ, জহির রায়হান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

সুকুমার বিশ্বাস : বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা :১৯৪৭-১৯৭১, ঢাকা,
বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(৪র্থ খণ্ড), চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা,
ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৬

সুরভী দাস : জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : সমাজ ও রাজনীতি, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ২০০২

সৈয়দ আকরম হোসেন : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

: প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য,ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, অক্টোবর ১৯৯৭

শামসুজ্জামান খান ও
সেলিনা হোসেন : চরিতাভিধান (সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

হাসান আজিজুল হক : কথাসাহিত্যের কথকতা, ১ম প্রকাশ ও ৩য় মুদ্রণ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৮২ ও ফেব্রুয়ারি ২০১৩

হাসান হাফিজুর রহমান : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র (দ্বিতীয় খণ্ড ও পঞ্চম খণ্ড) তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ :

Abdul Karim : Dacca : The Mughal Capital, Dhaka. Asiatic Society of Pakistan, 1964

Jadunath Sarkar : History of Bangal (edited), Voll.11.1948, Dhaka, Dhaka University

সহায়ক প্রবন্ধ, পত্রিকা ও সাক্ষাৎকার :

অনিক মাহমুদ : একুশের উপন্যাস, চারিত্র্য ও শিল্প কৌশল, সুন্দরম (স) মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, বসন্ত ১৪০১-২

অমলেশ ত্রিপাঠী : স্বাধীন ভারত সমস্যা, সাফল্য, ব্যর্থতা, সম্ভাবনা, (সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ), কলকাতা, দেশ, ৫৮ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ১০ আগস্ট ১৯৯১

আবদুল গাফফার চৌধুরী : ধীরে বহে বুড়ীগঙ্গা, ঢাকা, দৈনিক বাংলার বাণী, ১৯ মে ১৯৯৫

আফজালুল বাসার : জহির রায়হান : তাঁর সাহিত্য ও অপ্রকাশিত ডায়েরী, উত্তরাধিকারী, মাঘ-চৈত্র ১৯৮৬

আলমগীর কবির : জহির একটি চেতনা, জহির রায়হান (স্মরণিকা), ঢাকা, দিস ওয়াজ রেডিও বাংলাদেশ, ১৯৮৪

আনিসুজ্জামান : কাল নিরবধি, ঢাকা, দৈনিক প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০

আনোয়ার আহমদ (সম্পাদক) : এ্যালবাম, ঢাকা, ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ কবির : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর: বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ- ছোটগল্প, একুশের প্রবন্ধ, ঢাকা,বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

ইসরাইল খান : স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশের কতিপয় সাহিত্য পত্রিকার মূল্যায়ন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৪০২-১৪০৩ বঙ্গাব্দ

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস : জহির রায়হান : একটি বিপ্লবী আলেখ্য, ঢাকা, সাপ্তাহিক চিত্রালী, ২৬ মার্চ ১৯৭৩

গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ : জহির রায়হান কিছু স্মৃতি, ঢাকা, দৈনিক সংবাদ, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯৬

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া : বাংলার নগর ও নগরায়ণ, (১৮৭২-১৯২১) একটি সমীক্ষা, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬

চৌধুরী আতাউর রহমান : সাংবাদিক জহির রায়হান, ঢাকা, সচিত্র সন্ধানী, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৮২

জহির রায়হান : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ(সম্পাদিত :হাসান হাফিজুর রহমান), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৫ম খণ্ড) ঢাকা, ১৯৮২

জাকারিয়া হাবিব : মনে এলো, দৈনিক বাংলা ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩

জুলাফিকার আলী মানিক : নিখোঁজ নন, গুলিতে নিহিত হয়েছিলেন জহির রায়হান, ঢাকা, দৈনিক ভোরের কাগজ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

ড. মাজহারুল ইসলাম : জহির রায়হান শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে (স.), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

তুষার পণ্ডিত : অভিজিৎ সেনের একটি উপন্যাসের নিবিড় পাঠ, দিবারাত্রির কাব্য, কলকাতা, জুন ১৯৯৯

মাহমুদুল বাসার : জহির রায়হানের গল্প- উপন্যাসে একুশের চেতনা, উত্তরাধিকার, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৭

সারোয়ার জাহান : স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যে রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ, প্রসঙ্গ- উপন্যাস, একুশের প্রবন্ধ, ঢাকা,বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

সুমিতা চক্রবর্তী : মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কবিতার প্রগতিশীল ধারা, বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা (সম্পাদনা : ধনঞ্জয় দাশ), কলকাতা, ১৯৯২

সৈয়দ আকরম হোসেন : স্বাধীনতা- উত্তর বাংলা সাহিত্যে রূপান্তর বিষয় ও প্রকরণ, প্রসঙ্গ- উপন্যাস একুশের প্রবন্ধ, ঢাকা,বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

শওকত আলী : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ , প্রসঙ্গ-ছোটগল্প, একুশের প্রবন্ধ, ঢাকা,বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

শাহরিয়ার কবির : ভূমিকা (জহির রায়হান : একুশে ফেব্রুয়ারি), ঢাকা, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৬

মতিউর রহমান : একুশের ঝড়ের পাখি, ঢাকা, সচিত্র সন্ধানী, ৩১ জানুয়ারি ১৯৮২

বাবুল চৌধুরী : সাক্ষাৎকার, দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

কাইয়ুম চৌধুরী : সাক্ষাৎকার, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়া খাতুন : সাক্ষাৎকার, ১ সেপ্টেম্বর ২০০০

শাহরিয়া কবির : সাক্ষাৎকার , ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০

শাহাবুদ্দিন : সাক্ষাৎকার, ১৯৯৬

দৈনিক পাকিস্তান : ১৩ আগষ্ট ১৯৬৯

দৈনিক সংবাদ : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১